লৌকিক শব্দকোষ

শ্রীকামিনীকুমার রায়

সুধীসমাজ বহুদিন থেকেই লৌকিক শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার কিছুটা সহায়ক হবে। যদিও বৃহৎ সম্ভাবনার ইহা স্বল্প প্রকাশ মাত্র, তবুও এই প্রচেষ্টা বাংলা-ভাষাভাষীমাত্রেরই কাছে পরম গৌরবের ও আনন্দের বিষয় বলে যে পরিগণিত হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ গ্রন্থে বাংলার কোন বিশেষ এক অংশের নয়, সমগ্র বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলা) সর্বাঞ্চলের উপভাষা ও বিভাষার শব্দগুলো সুপরিকল্পিতভাবে গ্রথিত হয়েছে, যা উভয় বঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী অধিবাসীদের কাছে পথিকৃতের আসন দাবী করে। কারণ ইতিপূর্বে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অনুরূপ গ্রন্থের যে খণ্ডাংশ প্রকাশিত হয়েছে তার সীমানা পূর্ব-পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেনি। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার সাধারণ মানুষ, তথা গৃহস্থ শ্রমিক ও চাষীর মুখের ভাষার বহু প্রচলিত এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্টাপূর্ণ শব্দগুলোর উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। ঐসব শব্দের ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও আলোচনার ভিতর দিয়ে বাংলার বিবিধ বিচিত্র বিষয়বস্তুরই শুধু পরিচয় দেওয়া হয় নি, সেগুলোকে আশ্রয় করে যে সমৃদ্ধ লোকবৃত্ত গড়ে উঠেছে, তাদের কথাও বলা হয়েছে। গ্রন্থে উল্লেখিত এই ধরনের নানাবিধ-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"সারা বাঙ্গালায় জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে, চিন্তাপ্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপন্যাসের মতোই সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য তো আছেই, সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।"
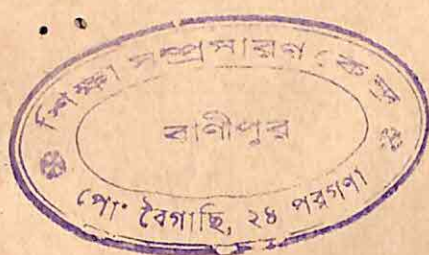
লৌকিক শব্দকোষ
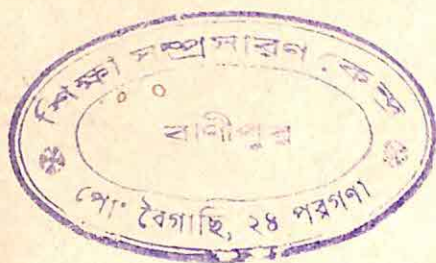
লৌকিক শব্দকোষ

শ্রীকামিনীকুমার রায়, এম. এ.

ভারতের জাতীয় অধ্যাপক
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. লিট.
মহাশয়ের লিখিত পরিচয় সংবলিত
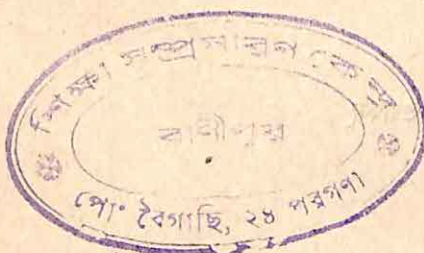
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশ্নস্
কলিকাতা-১

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্ ফোকলোর সিরিজ নং ১৩

প্রকাশক :
ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্-এর পক্ষে
শ্রী সি. আর. সেনগুপ্ত
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট,
কলিকাতা ১

প্রচ্ছদ : শ্রীখালেদ চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৭৫
অক্টোবর, ১৯৬৮

বাঁধাই : হেনা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
কলিকাতা।

মুদ্রাকর :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড,
১, গঙ্গাধর বাবু লেন,
কলিকাতা ১২

মূল্য : ১২·৫০

॥ উৎসর্গ ॥

সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়কে

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চাষ-আবাদ

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদ

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজন্তু

ষষ্ঠ অধ্যায়

আচার-অনুষ্ঠান

সপ্তম অধ্যায়

নামাবলী

ঋণ স্বীকার

সর্বাগ্রে Indian Folklore Society-র সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয়ের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা প্রস্তুত গ্রন্থের প্রকাশ ত্বরান্বিত করিয়াছে।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শত ব্যস্ততার মধ্যেও 'পরিচয়' লিখিয়া দিয়া আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসকে যে মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, সেজন্য নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

লৌকিক শব্দকোষের পরিকল্পনা ও রচনার ক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার মূল্যবান উপদেশ ও সাহায্য গবেষণার ব্যাপারে আমার অগ্রগতি সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়কে গোড়াতেই এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহার উপদেশ আমাকে কর্তব্য সম্পাদনের পথে প্রভূত শক্তি যোগাইয়াছে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সর্বদা উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহাদেব রায় মহাশয় একরূপ গোড়া হইতেই আমাকে নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য দান করিয়া বন্ধুপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ মহাশয়ের কাছেও আমি বিশেষ ঋণী। আমার বিষয়সংশ্লিষ্ট অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দিয়া তিনি বর্তমান গ্রন্থের অপূর্ণতা হ্রাস করিয়াছেন। বন্ধুবর লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সেন মহাশয় আমার সর্বকার্যে উৎসাহ ও পরামর্শদাতা। আমার স্নেহভাজন 'অম্লান' সম্পাদক শ্রীমান অমলকুমার রায় গোড়া হইতেই আমাকে সকল কার্যে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন।

মুদ্রণ ব্যাপারে প্রিণ্টারস্ কর্নার প্রাইভেট লিমিটেডের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মজুমদার মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতার জন্যও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শ্রীকামিনীকুমার রায়

পরিচয়

সকল ভাষারই দুইটি করিয়া মুখ্য রূপ থাকে—সাহিত্যের ভাষা এবং কথ্য ভাষা বা মুখের ভাষা। আবার সাহিত্যের ভাষার মধ্যেও লঘু গুরু ইত্যাদি নানা style বা শৈলী থাকে এবং এই শৈলীগুলির মধ্যে যে পার্থক্য পাই, তাহা মুখ্যতঃ শব্দগত হইলেও, বহুস্থলে ব্যাকরণগতও বটে। এই বিভিন্ন প্রকারের বা শৈলীর সাহিত্যের ভাষা মোটামুটি সর্বত্র শিক্ষিত জনের বোধগম্য এবং অশিক্ষিত জনেও ইহার প্রয়োগে অভ্যস্ত। সাহিত্যের ভাষা এই মুখের বা কথ্যভাষার আধারেই প্রতিষ্ঠিত। কোনও ভাষা এবং সেই ভাষাকে আশ্রয় করিয়া যে জীবনযাত্রা-পদ্ধতি এবং ধ্যান-ধারণা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—এক কথায় সেই জাতির অন্তর্নিহিত "সংস্কৃতি" পূর্বাপর বুঝিতে হইলে সাধুভাষার অতিরিক্ত প্রধান প্রধান কথ্যভাষার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় থাকা অপরিহার্য্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একেবারে নিছক মৌখিক ভাষার নিজের একটি সৌন্দর্য্য ও ব্যঞ্জনা-শক্তি আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আবার "মৌখিক ভাষার সাহিত্য"ও কখনও কখনও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে ভাষা মৌখিক ভাষার উপর, বিশেষ করিয়া তাহার শব্দাবলীর উপর স্থাপিত বা আধারিত হয়, সেই ভাষার ভাব-প্রকাশ-শক্তি ততই সূক্ষ্ম ও সুন্দর রূপে দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শক্তিশালী লেখক আবশ্যক মতো মৌখিক ভাষার শব্দ উচ্চকোটির সাহিত্যের মধ্যেও স্থান দিয়া সেই সাহিত্যের দ্যোতনা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। কোনও ভাষাকে ভালো করিয়া জানিতে হইলে, সেই ভাষার বিভিন্ন মৌখিক রূপের সহিত পরিচিত হওয়া বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেক সময়ে সাহিত্যের "উন্নত ভাষা"র এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলির বিশিষ্ট অর্থ, সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে হইলে মৌখিক ভাষার শরণাপন্ন হইতে হয়। এই হেতু কোনও ভাষার সমগ্র বোধ ও বিচারের জন্য মৌখিক ভাষার শব্দাবলীর সহিত পরিচয় থাকা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা বা অন্য কোনও ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান রচনা করিতে হইলে, সেই ভাষার dialectal words অর্থাৎ উপভাষার বা কথ্যভাষার বহু বহু শব্দের বিচারও করিতে হয়। বিভিন্ন প্রকারের কথ্যভাষায় আবার একই শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকারেরও হইতে দেখা যায়, এবং সেই-হেতু সাহিত্যের প্রয়োগেও এই

কথ্যভাষার অর্থ-বিভেদ কখনও কখনও সংক্রামিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণের জন্য কথ্যভাষার শব্দকেও (তাহার বিশিষ্ট অর্থের সহিত) উপেক্ষা করা যায় না।

বঙ্গবাসী শিক্ষিত জন যখন প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে তাহার মাতৃভাষার সম্বন্ধে সচেতন হইল, তখন হইতেই কথ্য বা প্রাদেশিক বাঙ্গালার নানা রূপের প্রতি এবং অর্থের প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। বিদেশী পোর্তুগীস এবং ইংরেজের হাতেই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষার চর্চার স্ত্রপাত হয়। এই বিদেশী পণ্ডিতেরা যাহা হাতের কাছে পাইয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ব্যাকরণ ও অভিধান লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগীস পাদ্রি মানুএল দা আস্সুম্প্সাউ পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার ভাওয়ালের কথ্য ভাষা, যাহা তিনি শিখিয়াছিলেন, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর সাধুভাষা বা সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার তেমন কোনও আগ্রহ ছিল না। তেমনই ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থাগতিকে পড়িয়া ইংরেজ নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড বাঙ্গালা সাধুভাষা লইয়া তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিলেন ও ছাপাইলেন, এবং তাঁহার কয়েক বৎসর পরে ওগ্যুস্ত্যাঁ ওস্সাঁ চন্দননগরে বসিয়া স্থানীয় বাঙ্গালারই একখানি ছোটো অভিধান প্রণয়ন করেন। সমগ্রভাবে বাঙ্গালার সাহিত্যিক ও মৌখিক ভাষার চর্চার সময় তখনও আসে নাই।

পরে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, বিলাত হইতে আগত রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ইংরেজরা ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত ইংরেজ পাদ্রিরা সাধুভাষার দিকেই দৃষ্টি দিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করিলেন (বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদও বাহির হয়)। ইহা ছিল "গৌড়ীয়" অর্থাৎ গৌড়ীয় সাধু-ভাষার ব্যাকরণ। ক্রমে ইংরেজি ইস্কুলে বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠন স্থান লাভ করিল, এবং বাঙ্গালী ছাত্র ও ছাত্রীগণ তথা লেখকগণের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা অভিধানও সংকলিত হইতে লাগিল। এই সকল অভিধানে বিশেষভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত ও লোকমুখে অপ্রচলিত কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দই স্থান পাইল, এবং মৌখিক ভাষার শব্দ, বাঙ্গালীর পক্ষে সহজবোধ্য সাধারণ খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ তেমন বিশেষ স্থান পাইল না। কারণ সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের শেষার্ধ হইতেই বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হইল। একদিকে নূতন যুগোপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির

কার্য্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ রায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষী আত্মনিয়োজিত হইলেন। তেমনই গত শতকের চতুর্থ পাদ হইতে বাঙ্গালী তাহার ভাষার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অবহিত হইল, এবং তাহার মাতৃভাষার চর্চাতেও মনোনিবেশ করিল। গত শতকের আটের কোঠায় বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে যত্নবান্ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাতৃভাষারও সর্বাঙ্গীণ আলোচনায় মন্ দিল। সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়কুমার সরকার, জগদ্বন্ধু ভদ্র, রমণীমোহন মল্লিক—ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এবং পরে দীনেশচন্দ্র সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৯২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ স্থাপিত হইল, এবং এই প্রতিষ্ঠান সেই যুগের তাবৎ সমস্ত বাঙ্গালী লেখক ও উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীকে তাহার মাতৃভাষার ও সাহিত্যের আধুনিক রীতি-সম্মত গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইঁহারা এই কার্য্যে অগ্রণী হইলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের ইতিহাস এক হিসাবে হইতেছে বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিজেকে বুঝিবার চেষ্টার ইতিহাস। প্রাচীন সাহিত্যের নূতন নূতন কৃতী গবেষক দেখা দিলেন; যেমন চট্টগ্রামের আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ঢাকার সতীশচন্দ্র রায়, বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস রচনার মূল্যবান্ সামগ্রী সংগৃহীত হইল।

এদিকে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনায় যাঁহারা বাঙ্গালীকে এই যুগে পথ দেখাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান, এবং আরও ছিলেন হরপ্রসাদ, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র। বাঙ্গালা ভাষার সম্যক আলোচনায় যে গ্রামীণ শব্দের সংগ্রহ ও আলোচনা অপরিহার্য্য, এইরূপ বোধ ও বিচার বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনের ক্ষেত্রে সর্বজনস্বীকৃত হইল। এই বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তদ্ভিন্ন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়রসন প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যের কতিপয় ভাষাতাত্ত্বিক আমাদের পথনির্দেশক হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়রসন তাঁহার যে অপূর্ব ও অমূল্য পুস্তক Bihar Peasant Life প্রকাশ করেন, তাহাতে কিভাবে গ্রাম্য শব্দ জীবনের নানা পর্য্যায় অনুসারে এবং বিভিন্ন অঞ্চল

ধরিয়া সংগ্রহ করিতে হয় তাহার একটা দিগ্‌দর্শন আমরা পাইলাম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে রীতিমত বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষার বা বিভিন্ন কথ্যভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসু লেখক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রস্তুত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয় বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রকার বাঙ্গালার প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা হইতে কতটুকু কাজ এ সম্বন্ধে বাঙ্গালীর হাতে হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি ধারণা হইতে পারিবে। পরিষৎ-পত্রিকা ভিন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও এইরূপ শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির ও সম্পূর্ণ পঞ্জী অপেক্ষিত।

কিন্তু এই সমস্ত গ্রাম্য ও প্রাদেশিক শব্দ লইয়া বৃহৎ সংগ্রহ পুস্তকাকারে এখনও বাহির হয় নাই—অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে। বহুদিন পূর্বে ইংরেজ বঙ্গভাষাবিদ্ সিভিলিয়ন J. D. Anderson কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের বাঙ্গালার একটি নাতিদীর্ঘ শব্দ-সংগ্রহ, ইংরেজি প্রতিশব্দের সহিত প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা পশ্চিমবঙ্গে হইতে পারে নাই, তাহা পূর্ববঙ্গের (পাকিস্তান রাষ্ট্রের) মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙ্গালী সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান এবং মাতৃভাষা সম্বন্ধে ইহাদের ভালোবাসা ও গর্ব পশ্চিমবঙ্গেও বিশেষ করিয়া অনুকরণযোগ্য। ইহারা পূর্ববঙ্গের তেরটি জেলার বিভিন্ন কথ্যভাষার একটি বিরাট শব্দ-সঞ্চয়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, এবং এই মূল্যবান্ সংগ্রহের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথ্যভাষার অভিধানের একটি বিশেষ গুণ এই যে, যে অঞ্চলের ভাষার শব্দ তাঁহারা ধরিয়া দিয়াছেন, সেই অঞ্চলের লোকের মুখে সেই শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার উদাহরণ দিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে শুদ্ধ একটি কথ্যভাষার শব্দের জীবন্ত স্বরূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মিলিত চেষ্টায় আঞ্চলিক ও কথ্যভাষা এবং সাধুভাষা উভয়কে মিলাইয়া সমগ্র গৌড়বঙ্গের ভাষার একটি সম্পূর্ণ রূপ একই মহাগ্রন্থে আমরা ধরিয়া দিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধে সহায়তার মতো এই শব্দ-সংগ্রহ-কার্য্যে যাহার যতটুকু সাধ্য করিলে সমবেতভাবে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইতে পারে। এই শব্দ-সংগ্রহের সংকলয়িতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার রায় মহাশয় নিজের যতটুকু শক্তি তদনুসারে এই কার্য্যে নামিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর জীবনের বিভিন্ন পর্য্যায় বা দিক অবলম্বন করিয়া শব্দগুলি সাজাইয়াছেন। একই শব্দের বিভিন্ন প্রাদেশিক

রূপ ইনি ধরিয়া দিয়াছেন, ইহাতে এই পুস্তকের উপযোগিতা আরও বাড়িয়াছে। একটি সহজবোধ্য পদ্ধতি ইনি এই বিষয়ে অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রীয়রসনের **Bihar Peasant Life**-এর ছায়া এই পুস্তকের উপর পড়িয়াছে, এবং সেইজন্য ইহার মূল্য সকলেই স্বীকার করিবেন। সারা বাঙ্গালায় জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে, চিন্তাপ্রণালীতে, রহন-সহনে যে সাম্য আছে, তাহা একই শব্দের বিভিন্ন বিচিত্র রূপের মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানি সহৃদয় পাঠকের নিকট উপাদেয় এবং উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য। ইহার বৈজ্ঞানিক মূল্য তো আছেই, সাংস্কৃতিক দিকও ইহার আর একটি গুণ।

আশা করি, এই বইখানি—বিশেষতঃ যখন পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—সমস্ত বাঙ্গালীর কাছেই সমাদর লাভ করিবে। ইতি ২৬ আষাঢ়, বঙ্গাব্দ ১৩৭৫। ১০ জুলাই, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৮॥

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
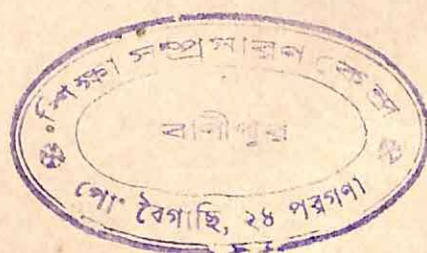
ভূমিকা

সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। ১৯২৯ সালে এম. এ. পাশ করিয়া ভাবিলাম, একটা কিছু গবেষণার কাজ করিতে হইবে। এই প্রেরণা দিয়াছিলেন যাঁহাদের চরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারাই। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ আচার্যগণ।

আজন্ম পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমি, গ্রামের দিকেই দৃষ্টি পড়িল। সেখানকার সাধারণ মানুষের বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের তথ্য এবং ততোধিক বিচিত্র তাহাদের কথিত ভাষার শব্দ সংগ্রহের কাজে ব্রতী হইলাম।

ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাটিকাটা মজুর হিসাবে কাজ আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ আমি ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিলাম, ক্রমে আমার অনুসন্ধান-ক্ষেত্র সমগ্র বাংলায় বিস্তৃত করিয়াছি।

আমার অনুসন্ধানের প্রথম ফল 'ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ'—প্রবন্ধাকারে ১৩৩৯ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনন্যব্রত হইয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিলাম। কিন্তু বাণীর অধিকাংশ সেবককেই চিরকাল যে বেদনা পোহাইতে হয়, আমার ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইল না। নানা প্রতিকূল অবস্থার চাপে পড়িয়া শীঘ্রই এক কর্মপ্রতিষ্ঠানে চাকুরিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। অবসর অল্প, তবু আশা উদ্যম একেবারে ছাড়িলাম না, 'জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে অন্তর প্রদীপখানি' চলিতে লাগিলাম। সাধনার ফল মধ্যে মধ্যে দৈনিকে ও সাময়িক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কিছু করিতে পারি নাই।

মানুষের 'সুন্দর' মানুষকে কাঁদায়, নব নব কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর আমার 'সুন্দর'ও আবার আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যৌবনের প্রারম্ভে শব্দসংগ্রহের কাজে হাত দিয়াছিলাম, বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া আবার তাহাতে আত্মনিয়োগ করিলাম। 'লৌকিক শব্দকোষ' এই আত্মনিযুক্তিরই প্রথম ফল। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত বলিবার পূর্বে আমার পূর্বসূরীদের ও সহধর্মীদের চিন্তাচেষ্টা ও কার্যকলাপ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

* * *

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ লোকের মৌখিক ভাষার শব্দগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সুধীসমাজ অনেকদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। অনেকেই নিজেদের খেয়ালখুশি মত, ব্যক্তিগত কৌতূহল নিবারণার্থ এক এক অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি খ্যাত অখ্যাত নানা পত্রপত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানও এই ব্যাপারে কখনো কখনো উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা একরূপ গোড়া হইতেই শব্দ-সংগ্রহের কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং একটি শব্দ-সমিতিও গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। সভ্যগণের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি।[১] কিন্তু এই সমিতির কাজও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তবু শব্দ সংকলনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে। বিভিন্ন বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে এবং গ্রাম্য ভাষার বিভিন্ন দিক লইয়া এপর্যন্ত অনেক মনীষী অনেক আলোচনাও করিয়াছেন। এস্থলে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্বে'র 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। উহাও সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়ই (১৩০৮) প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন অঞ্চলের শব্দ-সংগ্রহের এবং যাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা :—

৮ম বর্ষ (১৩০৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শব্দ-সংগ্রহ

৯ম বর্ষ (বরিশাল) শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

১২শ বর্ষ (ময়মনসিংহ) শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার

(রংপুর) শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

১৪শ বর্ষ (মালদহ) পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী

(পাবনা) শ্রীরাজকুমার কাব্যভূষণ

১৫শ বর্ষ (যশোহর) শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য

(কুচবিহার) এস. বসু

১৬শ বর্ষ (ঢাকা) শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়

(নদীয়া ও চব্বিশপরগনা) শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

১৮শ বর্ষ (মালদহ) শ্রীহরিদাস পালিত

(কুচবিহার) শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত

১৯শ বর্ষ (বগুড়া) শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

(নদীয়া) শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা) শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ

(টাঙ্গাইল) শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন

২১শ বর্ষ (মানভূম) শ্রীহরিনাথ ঘোষ

২২শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর) শ্রীরাখালরাজ রায়

৩১শ বর্ষ (খুলনা) শ্রীনরেন চক্রবর্তী

৩৩শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ, কাঁদি) মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ

৩৪শ বর্ষ (মুর্শিদাবাদ) মোল্লা রবীউদ্দিন আহমদ

(বীরভূম) শ্রীগৌরীহর মিত্র

(ফরিদপুর, কোটালিপাড়া) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

৩৭শ বর্ষ (শ্রীহট্ট) শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

৩৯শ বর্ষ (ময়মনসিংহ) শ্রীকামিনীকুমার রায়

৫০শ বর্ষ (দক্ষিণবঙ্গ) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫১শ বর্ষ (নদীয়া) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(চব্বিশপরগনা) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৬৪শ বর্ষ (খুলনা) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ছাড়া অপর বহু সাময়িক পত্রিকায়ও শব্দ-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৌষ ১৩৬০, মাঘ ১৩৬১ সংখ্যায় শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়ালের হিজলীর উপভাষার শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের বসুন্ধরা ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যায় মৎসংগৃহীত বাংলার কৃষিবিষয়ক শব্দ, মাসিক বসুমতী, মাঘ ১৩৫৭ সংখ্যায় কথ্যভাষা এবং সুবর্ণ-বণিক সমাচার, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ সংখ্যায় বাংলার আঞ্চলিক শব্দ-সংগ্রহ স্থান পাইয়াছে। ৩২শ বর্ষ দেশ পত্রিকার ৩৪ সংখ্যা : সাহিত্য বিভাগের 'বিদুর' বাংলার আঞ্চলিক শব্দের একটি অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় শ্রীবারিদবরণ ঘোষ সংগৃহীত বীরভূমের শব্দ, শ্রীকনককুমার গুহের কোচবিহারের শব্দ, শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলীর শব্দ এবং আরও কয়েকজন সংগ্রাহকের দুই-একটি অঞ্চলের কিছু কিছু শব্দ প্রকাশিত হয়।

১৩৩৪ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ শ্রীগৌরচন্দ্র গোপ-সংগৃহীত 'ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষা' পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল তাঁহার 'The Rajbansis of North Bengal' গ্রন্থে জলপাইগুড়ি, কোচ-বিহার ও তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের কথিত ভাষার অনেক শব্দ বিষয়ানুসারে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বাঙলা একাডেমী, ঢাকা হইতে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রধান সম্পাদক প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এই অভিধানের প্রথম অংশ আমাদের হাতে আসিয়াছে। ইহাতে আঞ্চলিক শব্দের উচ্চারণভিত্তিক বানান দেওয়া হইয়াছে।

১৩৭২ সালের পূজা-সংখ্যা 'কল্যাণী'তে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষ' প্রবন্ধে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় গ্রাম্য শব্দ সংকলন সম্পর্কে আমাদিগকে আরও অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন :

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে Lewin সাহেব 'Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein with comparative vocabularies of the hill dialects' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ স্থান পাইয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে J. D. Anderson সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'A short list of words of the Hill Tippera Language'.

১৯২৩ সালে Memoirs of the Asiatic Society of Bengal-এর সপ্তম খণ্ডে F. E. Pargiter সাহেবেরও একটি শব্দ-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত প্রচেষ্টারও বহু বহু বৎসর পূর্বে ১২৩০ সালে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে কলিকাতা অঞ্চলের কথিত ভাষার শব্দের একটি তালিকা স্থান পাইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা-ভাষা পরিচয়ে' মৌখিক ভাষার বহু শব্দ লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শুধু আলোচনাই নহে, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহিত্যরথী সকলেই তাঁহাদের রচনায় সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষার শব্দকে সম্মান দিয়াছেন।

১৮৯৫ সালের জুন মাসের 'দাসী' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'প্রাদেশিক কথিত বাঙ্গলা' প্রবন্ধে (১৩৭২ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'কল্যাণী'তে পুনর্মুদ্রিত) সাধারণের কথিত ভাষার কতকগুলি শব্দ-বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা করেন এবং কত যুগ আগেই তিনি একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

কবিগুরুর ইচ্ছা ছিল, বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষার একখানি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ-রচনা। বহু বৎসর পূর্বেই (১৩১২) তিনি এই সংগ্রহ ব্যাপারে ছাত্রদের অবহিত করিয়াছিলেন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও The New Oxford Dictionary-র ন্যায় একখানি বাংলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের জন্য ছাত্রসমাজকে রাজমিস্ত্রীর যোগানদারের ন্যায় মালমশলা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আষাঢ় সংখ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীও একখানি গ্রাম্যভাষার কোষগ্রন্থ প্রণয়নের আবশ্যকতা উল্লেখ করেন।

এই সকল বিবরণ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গ্রাম্য শব্দগুলির বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি বহুদিন পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ঐসকল শব্দ সংগৃহীত হইয়া আঞ্চলিক ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রকাশিত হউক, ইহা সকলেরই অন্তরের ইচ্ছা।

* * *

বাংলার বাহিরের দিকে দৃক্‌পাত করিলেও অন্য ভাষার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহের এবং অভিধান প্রণয়নের কার্যে অনেক মনীষীর ঐকান্তিক প্রয়াস ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সে সকলের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতে পারে :

উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলে গ্রাম্য শব্দ-সংগ্রহের কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই এই কার্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দী কৃষি-অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে Patrick Carnegy-র নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'Kutcherry Technicalities' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ মিশন প্রেস কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বিতীয়বার ছাপা হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

Mr. Carnegy-র পর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে William Crooke তাঁহার 'A Digest of Rural and Agricultural Terms' প্রকাশ করেন। ইহা অযোধ্যা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের গ্রাম্য এবং কৃষি-শব্দের সংকলন। এই দুইটি সংকলন গ্রন্থ আপিস আদালতের কর্মচারীদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Dr. Grierson-এর বিখ্যাত 'Bihar Peasant Life' প্রকাশিত হয়। ইহার ১৯২৬-এর সংস্করণে প্রায় বার হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। শব্দগুলি বিষয় অনুসারে সাজানো। গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচীও দেওয়া হইয়াছে। যে কোনও ভারতীয় উপভাষার অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে Dr. Grierson-এর গ্রন্থকে পথ প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

Dr. Grierson-এর বহু বৎসর পর শ্রীহরিহরপ্রসাদ গুপ্ত আজমগড় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের কুটীরশিল্প বিষয়ক প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার গ্রাম্য শব্দের একটি সংগ্রহ প্রকাশ করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মান লাভ করেন।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ অম্বাপ্রসাদ 'সুমন' আলিগড় অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ব্রজভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

হিন্দী আঞ্চলিক ভাষার সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত শ্রেষ্ঠ কোষগ্রন্থ হইতেছে ডঃ বিশ্বনাথ প্রসাদের 'কৃষি-কোষ।' ইহার প্রথম ভাগ ১৯৫৯ সালে বৃহৎ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। একজন সমালোচক বলিয়াছেন 'It is the light house in the ocean of the dialect dictionaries.'[১]

[১] Ram Prakash Kulshreshtha, Folklore, December, 1967

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বুন্দেলী, কুমায়ুনী প্রভৃতি উপভাষার শব্দ-সংগ্রহের কাজেও অনেকে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইংরেজী ভাষার Dialect Dictionary অধ্যাপক রাইটের (Joseph Wright) আর এক বিস্ময়কর কীর্তি।

ফরাসীর দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের প্রোভাঁস নামক উপভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া মিস্ত্রাল (Federic Mistral) জগদ্বিখ্যাত হন এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বসভার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান Nobel পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উপভাষায় সাহিত্যসেবা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, এইরূপ আরও দুইএক জনের নাম করা যাইতে পারে। ব্যাভেরিয়ার কার্ল স্টাইনার (Carl Joseph Steiner) জার্মাণের এক উপভাষায় এবং কবি রবার্ট ব্যর্নস্ (Robert Burns) স্কচ উপভাষায় সাহিত্য-কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

* * *

দেশ বিদেশের এত সব চিন্তাচেষ্টা এবং দৃষ্টান্তের মুখে ভাবিলাম, আর বসিয়া থাকা নয়, কর্তব্য এখনই গ্রহণ করিতে হইবে। 'মাটির প্রদীপের' যতটুকু সাধ্য ততটুকুই সে করিবে, হউক তাহা সামান্য। হৃদয়তন্ত্রে কেবলই অনুরণিত হইতে লাগিল :

'কে লইবে মোর কার্য ?—কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

'লৌকিক শব্দকোষ' সেই কঠোর কর্তব্য সম্পাদনেরই প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। ইহা বাংলার (বিভাগোত্তর পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান) বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের (masses) মৌখিক ভাষার শব্দসমূহের কোষগ্রন্থ।

যে সকল শব্দ শিক্ষিত সমাজের দরবারে এবং আদর্শ ভাষার সাহিত্যে অপ্রচলিত, অথচ লোকের মুখে মুখে বহু প্রচলিত, সেগুলিকে অনেকেই গ্রাম্য শব্দ বলিয়া থাকেন। বর্তমান গ্রন্থ ঐ সকল শব্দেরই সংগ্রহ হইলেও ইহার নামকরণে 'গ্রাম্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ গ্রামকে আমরা যতই ভালবাসি না কেন, আমরা গ্রাম্য হইতে চাই না, কেহ আমাদিগকে গ্রাম্য বা গেঁয়ো বলিলে খুশি হই না। তাই বাংলা ভাষার আদি ও প্রধান মূলধনকে 'গ্রাম্য' অবজ্ঞা হইতে বাঁচাইয়া 'লৌকিক' করা হইয়াছে।

'শব্দকোষ' নামটি সম্পর্কেও কয়েকটি কথা বলিবার আছে। লক্ষাধিক শব্দে যেখানে একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দকোষ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে মাত্র কয়েক হাজার শব্দের একটি পুস্তিকার 'শব্দকোষ' নামকরণ বেশী মনে হইতে পারে। বিশ্বকোষ, বাঙ্গালা শব্দকোষ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, ভারতকোষ, তারপরই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে 'লৌকিক শব্দকোষ' নাম দিতে সত্যই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতে পারি, যেমন প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, ইহা লক্ষ্যে পৌঁছিবার একটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র। সংগৃহীত অধিকাংশ শব্দই ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করিবার আশায় রহিয়া গিয়াছে।

সংগ্রহ-বৃত্তান্ত

মুখের ভাষা জীবন্ত। সে-ভাষার শব্দের এবং তাহার বিচিত্র রূপের শেষ নাই। চলমান জীবনের পথে নিত্যই উহার ভাণ্ডারে নূতন নূতন শব্দ সংযোজিত হইতেছে। বিভিন্ন উৎস হইতে এই সংগ্রহ-কার্য বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :

(১) পথে চলিতে, হাটেবাজারে, খেতে-খামারে, হেঁশেলে-দরবারে, কোথাও বেড়াইতে, যখনই যেখানে কোনও নূতন শব্দ শুনিয়াছি, কোনও নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, টুকিয়া লইয়াছি, কিংবা বাড়ীতে আসিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু অযাচিতভাবে আর কতটুকু পাওয়া যায়? কার্য সম্পাদনেও বিলম্ব ঘটে। তাই প্রায়ই গ্রামে গ্রামে গিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া এক একটি বস্তু বা বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। দুই চোখে যাহা পড়িয়াছে, প্রথমতঃ স্থানে বসিয়া একসঙ্গেই সকলের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি; পরে আবার সেগুলি ভাগে ভাগে যথাস্থানে সাজাইয়াছি। শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুগুলি সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করায় এক অঞ্চলের সহিত অপর অঞ্চলের তুলনামূলক আলোচনা করা সহজ হইয়াছে। এই সংগ্রহ-কার্যে শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরই শরণাপন্ন হই নাই, দশ বার বছরের বালকের নিকট হইতেও অনেক সময় অনেক তথ্য উদ্ধার করিয়া লইয়াছি। এক অঞ্চলের সংগ্রহ যথাযথ করিতে পারিলে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অপর অঞ্চলের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া যায়। একই নামধাম বা তথ্য বার বার না লিখিয়া উহাদের পার্শ্বে শুধু আঞ্চলিক পার্থক্যগুলি লিখিলেই চলে। লৌকিক শব্দকোষের জন্য সংগ্রহ-কার্য অনেক ক্ষেত্রে এই আদর্শেই পরিচালিত হইয়াছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে গ্রামে গিয়া সাধারণ লোকের মুখ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহাদের মনে নানা সন্দেহের উদয় হয়; এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় সঙ্গে যদি খাতাপত্র থাকে। ট্যাক্সের ভয়, লেভির ভয়, মজুতদারীর ভয় ইত্যাদি তাহাদের সারল্যকে বিনষ্ট করে। এজন্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া একেবারে মাটির মানুষ বনিয়া যাইতে হয়। চেয়ারের জন্য অপেক্ষা না করিয়া দাওয়ায় উঠিয়া ছোট ছেলেটির সঙ্গে একেবারে বস্তায় বসিয়া পড়িতে হয়, টুরিতে করিয়া মুড়ি খাইতে হয়, জল পিপাসায় পানি চাহিতে হয়, মনসাখোলায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে হয়। এতসব করিয়া তবে মাটির মানুষের হৃদয়ের কপাট খোলা যায়।

(২) যেখানে স্থানে (spot) যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সেখানে সেই স্থানের লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু লোক হইলেই চলে না, একেবারে কাদামাটির মানুষ চাই; আপন আপন গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে যাহাদের নাড়ী চলাচলের নিবিড় যোগ আছে, যাহারা অপরিচিতের সঙ্গেও নিজেদের সহজ সরল ভাষায় কথা বলিতে, ভাব প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহাদের হাতেই রহিয়াছে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি। লক্ষ্য করিয়াছি, একই পরিবারে বাপের ব্যবহৃত একটি শব্দ ছেলে বুঝে না। যখন আমি দেয়ালে পেরেক ঠুকিতে শিলটি চাই, তখন আমার নাতনী জিজ্ঞাসু নেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। তখন আবার বুঝাইয়া বলিতে হয়, 'বুঝিস্ নে? নোড়া চাইছি, শিল মানে নোড়া।' মুহূর্তে একটা হাসির রোল উঠে। আমার নাতনী আজন্ম কলিকাতায় লালিত পালিত; তাহার পক্ষে কলিকাতার 'নোড়া'কে যে ময়মনসিংহে 'শিল' বলে, তাহা জানিবার কথা নয়। শব্দ-সংগ্রহের ক্ষেত্রে এইরূপ নানা দিক বিবেচনা করিয়া এক এক অঞ্চলের খাঁটি মানুষটির কাছে গিয়া বসিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সুযোগ আর বেশীদিন থাকিবে না। দেশের রূপ, জিনিষপত্রের রূপ, ধ্যানধারণার রূপ, আচার-ব্যবহারের রূপ সব বদলাইয়া যাইতেছে। বিশেষতঃ দেশ বিভাগের ফলে বাংলার এক অংশ হইতে আর এক অংশে গিয়া সরেজমিনে 'তথ্য' সংগ্রহ করা আর সম্ভব নাও হইতে পারে।

মাটির মানুষ যাহারা এদিকে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেও আর ২০/২৫ বৎসর পর পাওয়া যাইবে না। সুযোগ থাকিতে পূর্ব পাকিস্তানের যে যে অঞ্চলে যাওয়া সম্ভবপর হয় নাই, সেই সব অঞ্চলের অনেক শব্দ, শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু বা

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ইঁহাদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; সন্দেহ স্থলে একই অঞ্চলের একাধিক ব্যক্তির শরণাপন্ন হইয়াছি। অন্যান্য অঞ্চলের সংগ্রহের ক্ষেত্রেও যেখানে স্থানে যাওয়া বা সাক্ষাৎভাবে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেখানেও ঐরূপেই উপযুক্ত লোকের নিকট হইতে তথ্য আহরণ করিতে হইয়াছে। কখনো কখনো চিঠিপত্রের আদানপ্রদানের ভিতর দিয়াও সংগ্রহ-কার্য চলিয়াছে।

(৩) শত চেষ্টা এবং পরিশ্রম সত্ত্বেও কাহারো একার পক্ষে বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের সমস্ত আঞ্চলিক উপকরণ আহরণ করা সম্ভবপর নহে। সুপরিকল্পিত ভাবে না হইলেও এপর্যন্ত পূর্বসূরীদের চেষ্টায় বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দ আহৃত হইয়াছে এবং সেগুলি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এবং দুই একটি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বসূরীদের ঐসকল সংগ্রহ হইতে লৌকিক শব্দকোষে বিষয় অনুসারে অনেক শব্দ গৃহীত ও আলোচিত হইয়াছে।

(৪) শব্দ-সংগ্রহের আর একটি উৎস হইল বিভিন্ন মনীষীর গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি। যখনই যে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ইত্যাদি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে কোনও বিশিষ্ট আঞ্চলিক শব্দ পাইলে তাহা লিখিয়া লইয়াছি, কিন্তু নির্বিচারে গ্রহণ করি নাই; সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লোকেদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়া তবেই গ্রহণ করিয়াছি। যে সকল গ্রন্থের কথা বেশী মনে পড়িতেছে এখানে বর্ণানুক্রমে উল্লেখ করিতেছি:

আদ্যের গম্ভীরা (শ্রীহরিদাস পালিত), আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ পদ্ধতি (শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষচৌধুরী), কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত), কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী (ডঃ শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), বঙ্গে চালতত্ত্ব (শ্রীসন্তোষকুমার শেঠ), বাংলার লৌকিক দেবতা (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু), বাংলার স্ত্রী-আচার (শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী), বাগর্থ (ডঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য), ব্রত-দর্পণ (শ্রীসুদেবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), ভারতীয় বনৌষধি (শ্রীকালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ), রামেশ্বর রচনাবলী (ডঃ শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত), শব্দতত্ত্ব (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), The Rajbansis of North Bengal (Sri Charu Chandra Sanyal, Asiatic Society)

লৌকিক শব্দকোষ প্রণয়নে আরও কোনো কোনো বিষয়ে যেসকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বা কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য অনুভব করিয়াছি:

চলন্তিকা (শ্রীরাজশেখর বসু), পূর্ব-পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান (বাঙলা একাডেমী, ঢাকা), বঙ্গীয় শব্দকোষ (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস), বাঙ্গালা শব্দকোষ (শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি), ভারতকোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ), ভাষার ইতিবৃত্ত (ডঃ শ্রীসুকুমার সেন), শব্দকল্পদ্রুম ।

Bhargava's Anglo-Hindi Dictionary—(Prof. R.C. Pathak)

Bihar Peasant Life—Grierson (Sir George Abraham)

The Origin and Development of the Bengali Language —(Dr. Suniti Kumar Chatterji.)

Rain in Indian Life and Lore (Ed. with an introduction by Sankar Sen Gupta, 1963)

Tree Symbol Worship in India (Ed. with an introd. by Sankar Sen Gupta, 1965)

শব্দ-নির্বাচন

লৌকিক শব্দকোষে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার প্রায় দশ হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। লোকসমাজে সুপ্রচলিত এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই সকল শব্দের অধিকাংশই প্রচলিত সাধারণ (standard) কোষগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাইবে না। আবার বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণ অভিধানে গৃহীত যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের অর্থে, উচ্চারণে, সমনামে বা প্রয়োগে অঞ্চলে অঞ্চলে তেমন কোনো পার্থক্য নাই, সে সকল শব্দ এই গ্রন্থের আওতা হইতে যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী ভাষা (ফারসী এবং তাহার মারফত তুর্কী ও আরবী, পোর্তুগীস ও ইংরেজী প্রভৃতি) হইতে গৃহীত যে সকল শব্দের তেমন কোনো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নাই, সেগুলির প্রতিও তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। যে সকল শব্দ এখনও বাংলার সর্বসাধারণের হইয়া উঠে নাই, উচ্চতর সাহিত্যে এবং সমাজে এখনও পর্যন্ত অপাংক্তেয় হইয়া আছে, অথচ এক এক অঞ্চলে বংশপরম্পরায় লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকিয়া হেঁশেলে দরবারে, মাঠে ঘাটে, থানে গানে, সর্বত্র

সকল বিষয়ে আপনার জীবনীশক্তির পরিচয় দিতেছে, লৌকিক শব্দকোষে সাধারণ গৃহস্থ, চাষাভূষা, দোকানী, পসারী, দিনমজুর, কামার, কুমার প্রভৃতির মুখের ভাষার ঐ সকল অখ্যাত অবজ্ঞাত শব্দকেই বেশী মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দগুলির অধিকাংশই ব্যাকরণের ভাষায় 'তদ্ভব' ও 'দেশী', এই দুই শ্রেণীতে পড়ে। ব্যাকরণে 'তদ্ভব'র অর্থ করা হইয়াছে, 'তৎ' অর্থাৎ সংস্কৃত বা মূল স্থানীয় আর্যভাষা হইতে 'ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার। ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়া আমরা এই শব্দগুলি লাভ করিয়াছি। আর্যদের আগমনের পূর্বে এই দেশে যাহারা বাস করিত, তাহাদের ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, সেগুলিকে বলা হয় 'দেশী' শব্দ। ইহাদের মধ্যে অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গল ইত্যাদি ভাষাবর্গের অনেক শব্দ আছে। এই শব্দগুলিও অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়াই আমাদের ভাণ্ডারে আসিয়াছে।

কিন্তু কি তদ্ভব, কি দেশী, কাহারো পরিবর্তন সর্বত্র সকল অবস্থায় একই নিয়মে একই রূপে সাধিত হয় নাই। মূল এক হইলেও স্থানকালের দূরত্ব, পরিবেশের বিভিন্নতা প্রভৃতি নানা প্রভাবের ফলে এক একটি শব্দ বহুরূপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন সংস্কৃত 'অঙ্গন' শব্দটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে: আঙ্গিনা / আঙিনা-ক, আগনা / আগনে-বর্ধ. হু. বী. মে, এগন্যা-বাঁ, আঙন্যা-মু, আগিনা / এঘিনা-জ. কো। শুধু রূপের দিক দিয়াই নয়, শব্দ ব্যবহার এবং অর্থের দিক দিয়াও অনেকক্ষেত্রে এই পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন, 'ঘর' শব্দের উৎপত্তি 'গৃহ' হইলেও, কোথাও ইহার অর্থ,—দল, গানের দল, কোথাও বা প্রতিদিন। আবার প্রত্যেক অঞ্চলেই এমন শত শত শব্দ আছে, যেগুলি অন্য অঞ্চলে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং যেগুলি অন্য শব্দের বিকৃতরূপ বলিয়াও মনে হয় না; উহারা স্বমহিমায় এক একটি উপভাষায় প্রতিষ্ঠিত আছে। লৌকিক শব্দকোষে ইহাদের অনেকের সম্বন্ধেই বিচার-বিবেচনা এবং নানা দিক আলোচনা করা হইয়াছে। যেহেতু ইহা লৌকিক শব্দকোষ, সাধারণ অভিধান নয়, তজ্জন্য ইহাতে শব্দগুলির অর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সাধারণ লোকের কাছে উহারা কি অর্থ বহন করে, কেন করে, ইত্যাদির উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। এক একটি শব্দ যে বস্তু, ব্যক্তি, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ করে, তাহাদেরই শুধু পরিচয় দেওয়া হয় নাই, প্রায়ই নামদাতা-দেরও পরিচয়, তাহাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদির প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মোটকথা, লৌকিক শব্দকোষে বাংলার লোকসমাজের কথাও

অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। বাংলার এক অঞ্চলের মানুষের কাছে অপর অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ী, গৃহ-সামগ্রী, চাষ-আবাদ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির শুধু বাহিরের রূপই নয়, অন্তরের রূপটিও ফুটিয়া উঠুক, শব্দাদির বিন্যাস ও বিবৃতির ভিতর দিয়া সর্বদা সেই চেষ্টাই করা হইয়াছে।

শব্দবিন্যাস-প্রণালী

শব্দগুলিকে শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বড় হরফে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উহাদের উচ্চারণভেদ এবং পর্যায়শব্দগুলি সম্পর্কে ব্যতিক্রম আছে। সেগুলিকে যথাস্থানে বড় হরফে বিন্যস্ত না করিয়া সংশ্লিষ্ট এক একটি শব্দের ঘরেই ছোট হরফে রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অনেক বহুপ্রচলিত শব্দের সঙ্গে তৎসংক্রান্ত যাবতীয় শব্দের বিবৃতি ও আলোচনা একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন, এক ঢেঁকির (১০১) ঘরেই ঢেঁকি সংক্রান্ত ১১০টির উপর শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কচু (১৫৬), কলা (১৫৭), ধান (১৬৬), পাট (১০৭), পান (১৭১), আম (১৫৪), ঘট (৯৩), কৃষক (১১৮), লাঙ্গল (১৩২), হুঁকা (১১৫) প্রভৃতি শব্দও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সংশ্লিষ্ট বহু শব্দ ইহাদের এক একটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে,—সেগুলি বর্ণানুক্রমে পৃথক পৃথক সাজানো সম্ভবপর হয় নাই। বিশেষ বিশেষ শব্দের যথোচিত বিবৃতি ও আলোচনার স্থান করিবার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে সমস্ত শব্দের সূচী দিবার পরিকল্পনা থাকায় আপাততঃ এই ধারাই অনুসরণ করা হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সাতটি অধ্যায়ে সাতটি বিষয় স্থান পাইয়াছে।

অধিকাংশ শব্দের সঙ্গেই উহাদের সংগ্রহ-স্থান বা প্রচলন-স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে শব্দের পৃষ্ঠে একটি (-) হাইফেন দিয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা জেলা সঙ্কেত (উহার এক বা একাধিক আদ্য অক্ষর) বসানো হইয়াছে। কোনও শব্দ একাধিক স্থানে প্রচলিত থাকিলে প্রথম সঙ্কেতের পর অপর সঙ্কেতের পূর্বে (.) বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ছোট মরাই অর্থে 'কুরুই' শব্দটির প্রচলন আছে। ইহা শব্দকোষে এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে :

কুরুই-দচ—ছোট মরাই বিশেষ। (৬৮ পৃ)

এইরূপ আর একটি শব্দ 'খোলাত'; ইহা বাহির আঙ্গিনা অর্থে জলপাইগুড়ি,

কোচবিহার এবং রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। শব্দটি এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

খোলাত-জ. কো. রং—বাহির আঙ্গিনা। (৭০ পৃ)

কোনো কোনো শব্দের সঙ্গে ([ ]) তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে উহার সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার দুই একটি সমনামও দেওয়া হইয়াছে। ভাষা-সঙ্কেত সংশ্লিষ্ট শব্দের পূর্বে বসিয়াছে। যেমন,

মুচি-ক [সং মূষা, হি ঘরিয়া, ইং crucible] (১১৩ পৃ)

(/) ইলেক চিহ্ন দ্বারা একই শব্দের সাধু ও চলিত রূপকে কিংবা একাধিক উচ্চারণ বা বানানকে অথবা একই অঞ্চলে প্রচলিত দুই বা ততোধিক সমার্থক শব্দকে পৃথক করা হইয়াছে। যেমন,

অশৌচঘর / অশুজঘর, কাঁড়িয়া / কেঁড়ে, ডেগুরা / ডেউগরা, আগিনা / এঘিনা, ওটা / ওডা, আদাড় / প্যাঁদাড় / কঁ্যাদাল।

অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থ স্পষ্ট করিবার জন্য ( ) প্রথম বন্ধনীর মধ্যে প্রয়োগ-উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণটি কোনও গ্রন্থের উদ্ধৃতি হইলে (' ') উদ্ধার-চিহ্ন এবং গ্রন্থ-সঙ্কেত বা গ্রন্থকারের নাম-সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন 'কামিলা'র কারুশিল্পী অর্থটি স্পষ্ট করিবার জন্য একটি প্রয়োগ-উদাহরণ এইরূপে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ('কেমন করিয়া কৈল কামিলার বেটা। শঙ্খের উপরে এত নির্মাণের ঘটা॥'—রারচ)

এক এক অঞ্চলের সমধিক প্রচলিত প্রায় প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই উহার পর্যায় বা সমার্থকশব্দগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা জেলাসঙ্কেত সহ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ এক একটি শব্দের বিবৃতির পর 'তৎপর্যায় ঃ—' বা 'পর্যায়শব্দ ঃ—' এইরূপ লিখিয়া উহার সমার্থক বা পর্যায়শব্দ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। সন্দেহস্থলে বা বহুপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে অঞ্চল সঙ্কেত দেওয়া হয় নাই। তুল্যভাবসূচক অর্থ ও পর্যায়শব্দগুলি প্রায়ই (,) কমাচিহ্ন দ্বারা এবং বিভিন্নার্থক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ অঞ্চল-সঙ্কেত সহ (।) দাঁড়ি দ্বারা পৃথক করা হইয়াছে। যেমন,

পেয়ারা [পো pera, হি অমরুদ, ইং guava]—বালকবালিকাদের অতি প্রিয় ফল। তৎপর্যায় ঃ—আঞ্জির-দচ, আঁজির-রাঢ়, সবরী-পূব, সবরী আম-ম. ঢা, আম সবরী-য. পা, গৈয়ব-ম, গৈয়া-ঢা. ব. ফ, গ'য়ে-য. খু, গয়ম-নো, টাম সুপারি-জ. কো। (১৭২ পৃঃ)

ছেনি-নো—হাসুয়া ধরনের বড় দা। ছেনি-ম—ফিড়ানি বিশেষ। ছেনি-ক—লোহা ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ। (৯৬ পৃঃ)

বর্ণানুক্রম

লৌকিক শব্দকোষে যেরূপ বর্ণানুক্রমে শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছেঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড
ড় ঢ ঢ় ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ
ম য য় র ল শ ষ স হ

বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-তে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই; উভয় ব-যুক্ত শব্দই একসঙ্গে ফ-এর পর দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষ-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে না ধরিয়া 'ক+ষ' এই যুক্তবর্ণরূপে ধরা হইয়াছে এবং ক্ষ যুক্ত শব্দ খ-এর পূর্বে বসিয়াছে।

চন্দ্রবিন্দুহীন অক্ষরের পর চন্দ্রবিন্দুযুক্ত সেই অক্ষর বসানো হইয়াছে। যেমন, আটি, আঁটি ঃ কুড়ে, কুঁড়ে।

ৎ স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে না ধরিয়া হস্-যুক্ত ত রূপে ধরা হইয়াছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। বাংলায় অধিকাংশ অ-কারান্ত শব্দই হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়; এজন্য হলন্ত শব্দেও হস্ চিহ্ন কদাচিৎ ব্যবহার করা হইয়াছে।

বানান

লৌকিক শব্দকোষে সাধারণভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' ও রাজশেখর বসু মহাশয়ের 'চলন্তিকা' অনুসরণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। তদ্ভব, দেশী এবং বিদেশী শব্দগুলির বানান উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে যাইয়াও ক্ষান্ত হইয়াছি। কারণ তাহাতে শব্দগুলি অযথা ভারাক্রান্তই হইত, কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাইত না। শব্দের উচ্চারণে যে শুধু রাঢ়, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এইরূপ বড় বড় অঞ্চলগুলির মধ্যেই পার্থক্য আছে তাহা নহে। এই পার্থক্য একই অঞ্চলেও জেলায় জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, এমন কি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্যক্ পরিস্ফুট। আমুগার (আমাদের), এইমোত্তোন (এইমাত্র), কৈশল (কৌশল), ঝ্যাতকোন (যতক্ষণ), বেতা (ব্যথা)—এই ধরনের উচ্চারণ

বিকৃতির ক্ষেত্রে মূল শব্দগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে বেশী। তবু অনেকস্থলে একই শব্দের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলেয় শব্দ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। যেমন 'আঙ্গিনা' শব্দটির (৬৫ পৃঃ) আগনা/আগনে, এগন্যা, আঙন্যা, আগিনা/এঘিনা—বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণভেদগুলিও দেখানো হইয়াছে। ইহাতে ভাষাতত্ত্বের গবেষকগণের আলোচনার সুবিধা হইতে পারে।

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দিলে বাংলার অপর বহু অঞ্চলেই 'ঙ্গ' এর উচ্চারণ সুস্পষ্ট ; সেজন্য অধিকাংশ শব্দের বানানে প্রাচীন রীতি অনুসারে 'ঙ্গ' রাখা হইয়াছে। প্রায় সমস্ত অসংস্কৃত শব্দের বানানে 'ণ' ও 'ঊ'র পরিবর্তে 'ন' ও 'উ' ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রচলিত বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণ অনুযায়ী সকল শব্দের যথাযথ বানান লেখা দুরূহ ব্যাপার, বলিতে কি অসাধ্য। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ

কলিকাতার আদর্শ ভাষার উচ্চারণে শব্দের আদিতে (ে) একারের প্রাবল্য দেখা যায়। যেমন—কেষ্ট, পেঁয়াজ, পেয়ালা, বেয়াই, বেয়ান, বেরাল, রেকাব, শেয়াল। কেনা, চেরা, লেখা। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র এবং রাঢ়ের বহু অঞ্চলে এই সকল শব্দের আদিতে (ি) ইকার উচ্চারিত হয়। যেমন, কিষ্ট, পিঁয়াজ, পিয়ালা, বিয়াই, বিয়ান, বিড়াল, রিকাব, শিয়াল। কিনা, চিরা, লিখা।

কলিকাতার আদর্শ ভাষায় ধোয়া, বোনা, মোছা, শোনা। বাংলার অপর বহু অঞ্চলে ধুয়া, বুনা, মুছা, শুনা।

আদর্শ ভাষায় কুচো, খুড়ো, পূজো, বুড়ো। অপর বহু আঞ্চলিক ভাষায় কুচা, খুড়া, পূজা, বুড়া।

কলিকাতার ভাষায় গিলে, পিসে, বিছে, মিছে। অপর বহু আঞ্চলিক ভাষায় গিলা, পিসা, বিছা, মিছা।

আদর্শ ভাষার আদ্য ওকার কোথাও (মে. বাঁ) কোনো কোন শব্দে লোপ পায়। যেমন, গোলা—গলা, ঝোড়া—ঝড়া, নোড়া—নড়া, পোড়া—পড়া, মোটা—মটা। কোথাও (পূব. শ্রী. ত্রি) ওকার উকারে রূপান্তরিত হয়। যেমন, গুলা, ঝুড়া, নুড়া, পুড়া, মুটা।

সাধুভাষার কলিকা, কুনিকা, খড়িকা, ধনিয়া, সরিষা আদর্শ ভাষায় কলকে,

কুনকে, খড়কে, ধনে, সরষে; পূর্ববঙ্গে কইল্‌কা, কুইন্‌কা, খইড়্‌কা, ধইন্যা / ধইনা, সইর্‌ষা।

সাধুভাষায় কাঁড়িয়া, কুঁচিয়া, দেখিয়া, ধরিয়া, মারিয়া; আদর্শ ভাষায় কেঁড়ে, কুঁচে, দেখে, ধরে, মেরে; পূর্ববঙ্গের ভাষায় কাইড়্যা/কাইড়া, কুইচ্যা/কুইচা, দেইখ্যা / দেইখা, ধইর‍্যা / ধইরা, মাইর‍্যা / মাইরা।

পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে অপিনিহিতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। 'ই' পূর্বোক্ত শব্দগুলিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চারণে 'ই' ধ্বনির একটা রেশ থাকে মাত্র। মেদিনীপুরে হাল্যা, হেল্যা, মায়্যা, 'তেরাপেখ্যা' প্রভৃতির উচ্চারণেও অপিনিহিতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কটুয়া, কাঠুয়া, পাটুয়া, বটুয়া প্রভৃতি শব্দ পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে কট্যুয়া / কউটা, কাঠ্যুয়া/কাউঠা, পাট্যুয়া, বট্যুয়া শুনা যায়।

এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের আরও কতকগুলি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে:

পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরার বহু অঞ্চলে সাধারণ লোকের (বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও স্ত্রীলোকের) মুখে অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ শুনা যায় না। যেমন, হাস (হাঁস), বাশ (বাঁশ), ফাসি (ফাঁসি), চান্দ (চাঁদ), ফান্দ (ফাঁদ)। আবার রাঢ়ের কোনো কোনো অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দুর দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। যেমন, খোঁকা, চাঁ, বিঁড়া, সাঁপ, হাঁসি। কোথাও কোথাও অনুনাসিক আকার অ্যাঁ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, ক্যাঁথা, ব্যাঁকা, ক্যাঁকড়া।

চট্টগ্রামে আঁই (আমি), আঁর (আমার) প্রভৃতিও শুনা যায়।

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে (বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায়) পদান্ত্য বা পদমধ্যস্থিত 'ট' ও 'ঠ' 'ড' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, বাডা (বাটা), বেডা (বেটা), মিডা (মিঠা), খাডাল (খাটাল), কডা (কটা), ফাডা (ফাটা)। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে 'ড়'-এর স্থানেও প্রায়ই 'র' শুনা যায়। যেমন, কাপর (কাপড়), পরা (পড়া), গারি (গাড়ি)। কেহ কেহ আবার শুদ্ধ করিয়া লিখিতে যাইয়া 'কাপড় পরা' স্থলে 'কাপর পড়া' লেখেন।

বাংলার বহু অঞ্চলে অনেক শব্দে 'ন' স্থানে 'ল' এবং 'ল' স্থানে 'ন' উচ্চারিত হয়। ন স্থানে ল: লদী (নদী), লব্বই (নব্বই), লৌকো (নৌকো), লইতন (নূতন), লাল (নাল)। ল স্থানে ন: নক্ষী (লক্ষী), নাজ (লাজ), নোভ (লোভ); নেবু (লেবু), নিচু (লিচু), নাঙল (লাঙ্গল), নেপা (লেপা)।

এ-কারের সাধারণ উচ্চারণ ছাড়াও বাংলার বহু স্থানে উহার বক্র উচ্চারণ শুনা যায়ঃ ত্যাল (তেল), ব্যাল (বেল), দ্যাশ (দেশ), ক্যামন (কেমন), দ্যায় (দেয়), প্যাঁজ (পেঁয়াজ), হ্যামবাধু (হেমবাবু)।

রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলে সাধারণ লোকের মুখে কুড়্যাল (কুড়াল), কোলগ্যা (কলকে), চুম্যা (চুমা), বাগিচ্যা (বাগিচা), ভাতিজ্যা (ভাতিজা), সরিষ্যা (সরিষা) শুনা যায়। উচ্চারণ অনুযায়ী ইহাদের ঠিক ঠিক বানান লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। এখানে কিছুটা মাত্র আভাস দেওয়া হইল।

বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো শব্দের আদ্য 'র' লোপ পায় এবং তৎযুক্ত স্বরের উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন, রামচন্দ্র—আমচন্দ্র, রাত্তির —আত্তির, রান্নাঘর—আন্নাঘর, রূপরায়—উপরায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শব্দের আদিস্থিত স্বরবর্ণে 'র্'-এর আগম হয়। যেমন, আম—রাম, উপেন্দ্র—রূপেন্দ্র, উই—রুই।

কলিকাতার আদর্শ ভাষায় তিন স-এরই উচ্চারণ শ-এর অনুরূপ। কিন্তু বাংলার অপর কোনো কোনো উপভাষা ও বিভাষায় অনেক শব্দের স (শ, ষ, স) হ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন, হালা (শালা), হগুন (শকুন), হতীন (সতীন) হাউরী (শাশুড়ী), হামাল (সামাল), হে (সে)। কিন্তু হভা (সভা), হত (শত), হুভঙ্কর (শুভঙ্কর), হহী (শশী) বড় শুনা যায় না; এইসব শব্দে শ-ধ্বনি অবিকৃত থাকে। স-এর দন্ত্য উচ্চারণও আছেঃ শৃগাল, স্নান, ব্যস্ত।

অনেক শব্দে হ-এর উচ্চারণ 'হ' ও 'অ'-এর মাঝামাঝি। যেমন, 'হইল', 'হয়', 'হাঙ্গামা' ইত্যাদি শব্দের হ-এর উচ্চারণ হ বা অ কোনও বর্ণ দ্বারাই ঠিক ঠিক প্রকাশ করা যায় না। পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ বুঝাইতে অনেকে 'অ' বা 'অ ব্যবহার করেন।

বর্গের চতুর্থ বর্ণও বাংলার কোনো কোনো উপভাষায় মহাপ্রাণতা ত্যাগ করিয়া কতকটা তৃতীয় বর্ণের ধ্বনিতে পরিণত হয়। প্রাদেশিক উচ্চারণ বুঝাইতে অনেকে ধান, ধামা, ভাত, ঘর শব্দগুলি যথাক্রমে দ'ান, দ'ামা, ব'াত্, গ'র লেখেন বটে, কিন্তু তাহাতে যথার্থ উচ্চারণ প্রকাশ পায় না। বস্তুতঃ এইসব শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিবার পক্ষে প্রচলিত বাংলা বর্ণমালা যথেষ্ট নহে।

বাংলার বহু অঞ্চলে কর্ম ও সম্প্রদানের একবচনে 'কে' স্থানে 'রে' বিভক্তি হয়। যেমন, আমারে, তোমারে, তাহারে, ভিখারীরে।

সম্বন্ধে বহু বচনে 'গা', 'গর'। যেমন, আমারগা বাড়ী, আমাগর গাই। অধিকরণে 'ত' (উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে সমধিক) বিভক্তি হয় ; তৎযুক্ত 'অ' উচ্চারিত হয় না। যেমন, মাটিত্ / মাড্ডিত্ (মাটিতে), বাড়ীত্ / বারাত্ (বাড়ীতে), বিছানাত্ (বিছানাতে), নদীত্ (নদীতে)।

বাংলায় 'য'-এর মূল উচ্চারণ না থাকিলেও অনেক য-ফলা-সংযুক্ত অন্ত্য বর্ণের পূর্বে 'ই' ধ্বনির আভাস পাওয়া যায়। কাইর্জ্জ (কার্য্য), সইত্ত (সত্য), আচাইর্জ্জ (আচার্য্য), অপরিহাইর্জ্জ (অপরিহার্য্য)। অন্তস্থ 'ব'-এর মূল উচ্চারণও কোনো কোনো শব্দে ধরা পড়ে। যেমন 'স্বামী' শব্দটি স্ত্রীলোকদের মুখে প্রায়ই 'সোয়ামী' শুনা যায় ; এইরূপ 'সোয়াদ' (স্বাদ)।

ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য লইয়া আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। প্রত্যেক অঞ্চলের উপভাষাতেই উচ্চারণে এবং বাক্‌ধারায় (idiom) এত সব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহার সবগুলি কোনও দিন লিখিত আদর্শ ভাষায় গৃহীত হইবে না বা হইতে পারে না। ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "উচ্চারণ অনুসারে বানান পদ্ধতি স্থির করিতে গেলে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে।" (বাগর্থ)।

শব্দের প্রচলন-স্থান ও বিষয়-বিভাগ

লৌকিক শব্দকোষে বিবৃত ও আলোচিত যাবতীয় শব্দই বাংলা শব্দভাণ্ডারের সম্পদ হইলেও প্রায় শব্দের সঙ্গেই উহার প্রচলন-স্থানের একটা সীমা দেওয়া হইয়াছে। ইহা অনেকের কাছেই বিভ্রান্তিকর মনে হইতে পারে। এইজন্য কয়েকটি কথা গোড়াতেই স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি। যে শব্দটি নদীয়ার বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যে ঐ জেলার সর্বত্রই সকলের মুখে শুনা যায় এবং তৎসংলগ্ন চব্বিশপরগনা, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা বা অন্য কোথাও উহার প্রচলন নাই, বা একই অর্থে আর কোনও শব্দ ঐসব অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না, এইরূপ মনে করা হইলে ভুল করা হইবে। বাংলার কোনও অঞ্চল দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত নহে, সর্বদাই এক অঞ্চলের লোকের সহিত অপর অঞ্চলের লোকের নানাসূত্রে যোগাযোগ ঘটিতেছে। ফলে এক অঞ্চলের ভাষার প্রভাব, উহার শব্দ, বাক্‌ধারা ইত্যাদি অপর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তদুপরি উচ্চারণে এবং শব্দের ব্যবহারে একই জেলার মধ্যেও বিভিন্নতার অন্ত নাই ; মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে, নদীর এপারে ওপারে শব্দভেদ

আর উচ্চারণভেদ লক্ষ্য করা যায়। মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে ব্যবহৃত অনেক শব্দ কাঁদি অঞ্চলে অপরিচিত; তমলুকের কাঁথা হিজলীতে গাঁথা; কিশোরগঞ্জের চাউল, টাঙ্গাইলে চাইল। একই গ্রামের শিক্ষিত লোকে বলে শোব, অশিক্ষিতেরা বলে শুবো। এই বিভিন্নতার মুখে অঞ্চল বা জেলাসঙ্কেত দ্বারা মাত্র এই আভাসই দেওয়া হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট শব্দটি কোন অঞ্চলের বা কোন অঞ্চলের লোকের মুখের ভাষা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। তুল্যার্থক আরও শব্দ সেই অঞ্চলে প্রচলিত থাকিতে পারে এবং নির্দিষ্ট শব্দটির ব্যবহার সেই অঞ্চলের সকলে নাও জানিতে পারে। আবার এই শব্দটির সন্ধান দূরবর্তী কোনও বিচ্ছিন্ন গ্রামেও পাওয়া যাইতে পারে। একটি লোকাচার যেখানে ঢাকার উচ্চকোটি সমাজের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, হয়ত আর একজনের অনুসন্ধানে তাহা বীরভূমের অন্ত্যজদের মধ্যেও ধরা পড়িতে পারে। এইরূপে এক একটি শব্দের, শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয়-বস্তুর ব্যাপ্তি বুঝা যাইবে এবং তাহাতে হয়ত জাতির অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হইবে।

সাহিত্য-পুস্তকাদিতে ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দের অর্থগ্রহণের জন্যই সাধারণতঃ শব্দকোষের প্রয়োজন হয়। সাহিত্য জীবনের কতকটা প্রতিবিম্ব হইলেও লৌকিক শব্দকোষে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের রঙ্গভূমি হইতে সরাসরি শব্দাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের একার্থক শব্দগুলি, আবার একই শব্দের বিভিন্ন অর্থগুলি পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। ফলে এক অঞ্চলের যাবতীয় শব্দের তথা শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর সঙ্গে অপর অঞ্চলের বাঙ্গালীর সহজেই পরিচয় ঘটিবে; শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বাংলাদেশ, সমগ্র বাঙ্গালীজাতিও তাহার নিকটতর হইবে বলিয়াই মনে হয়। মনে হয়, ঢাকা, কলিকাতা, বীরভুম, শ্রীহট্ট, নদীয়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, জলপাইগুড়ি সকলে নিজেদের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ভুলিয়া গিয়া একই মজলিসে বসিয়া নিজেদের ঘরের কথা বলিবার, প্রাণের কথা শুনিবার সুযোগ পাইবে। পক্ষান্তরে এক একটি বিষয় অনুসারে শব্দগুলি বিন্যস্ত থাকায় সমগ্র দেশের সেই সেই বিষয় সম্পর্কে জানিবার ঔৎসুক্য জাগ্রত হইবে এবং জানাও সহজ হইবে।

শব্দ-বৈচিত্র্য

আঞ্চলিক শব্দগুলির সংগ্রহে আসিলেই আমাদের ভাষার বিপুল ঐশ্বর্যের ও অপরূপ বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক একটি শব্দের কত প্রতিশব্দ জেলায়

জেলায়, মহকুমায় মহকুমায়, গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া আছে। একই ঝাঁটার পরিবর্তে কত শব্দ বাংলার উপভাষা ও বিভাষাগুলিতে ব্যবহৃত হয় (৯৮ পৃ)। উননেরই বা কত নাম (৮৬ পৃ)। চব্বিশ পরগনায় যে ফলটিকে বলা হয় 'নোড়', ঢাকায় তাঁহাকে বলে 'রোয়াইল', ময়মনসিংহে 'হরবরই', বরিশালে 'নৈল'।

শব্দ-ভেদ যে শুধু অঞ্চলে অঞ্চলে বা উপভাষায় উপভাষায় তাহা নহে। একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও এক শব্দের পরিবর্তে তদর্থবোধক বহু শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায়। একই গঞ্জে একই তরকারি-ফলকে কেহ বলে মিষ্টিকুমড়া, কেহ বৈতাল, কেহ ডিংলা, কেহ বা বিলাতি কুমড়া। আমাদেরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে গৃহিণী বলেন ঝাঁটা, বড় বউ বলে পিছা, ছোট বউ বলে বাড়ুন, ঝি বলে কোস্তা।

বাংলা ভাষার এই যে শব্দ-বৈচিত্র্য, ইহার মূলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব আছে বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত জননীর ভাণ্ডার হইতে যে পাথেয় লইয়া ভারতীয় আর্যগণ পূর্বাভিমুখে তথা বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন, একমাত্র তাহাই তাঁহারা সম্বল করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। হাঁটিতে চলিতে দৌড়িতে প্রতিদিন জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কত সম্পদ তাঁহারা আহরণ করিয়াছেন, কত নূতনের সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। বাংলার মাটিতে আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন শক হুন পাঠান মোগল ইংরেজ কত জাতি যুগে যুগে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে, জাতিকে জাতি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃতির ছাপ, ভাষার ছাপ, বাঙ্গালীর সংসারে, সমাজে, ভাষায় ও সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীর অন্যান্য বহু জাতির ন্যায়ই একটি মিশ্রজাতি, বাংলা ভাষাও তাহাই, সেই মিশ্রজাতির একটি মিশ্র ভাষা।

আদিতে একই অঞ্চলের একই গোষ্ঠীর লোক যে একই জিনিষকে কখনো এই নামে, কখনো ওই নামে, কখনো বা আর এক নামে অভিহিত করিত, তাহা মনে হয় না। এক একটি বস্তুর এক একটি নাম বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী দ্বারা তাহাদের নিজেদের জ্ঞানবিশ্বাস ও ধ্যানধারণা অনুযায়ী হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করা যায়। কিন্তু উন্নতিশীল মানবগোষ্ঠীর কেহই ত চিরকাল একই অঞ্চলে স্বাতন্ত্র্যের পাঁচিল তুলিয়া বসিয়া থাকে নাই, তাহাদের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে, একগোষ্ঠীর সহিত অপর গোষ্ঠীর নানা সম্পর্ক—ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে ভাব আদানপ্রদানের একটা সাধারণ ভাষাও গড়িয়া উঠিয়াছে,

সেই ভাষায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দ অবশ্যই অল্পবিস্তর স্থান পাইয়াছে। এইরূপে এক একটি বস্তুর এক গোষ্ঠীর এক নামের সঙ্গে বহু গোষ্ঠীর বহু নাম যুক্ত হইয়াছে। এই কারণেই এক একটি ভাষায় এক শব্দের পরিবর্তে সেই অর্থবোধক অপর বহু শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে একই পরিবারে 'ঝাঁটা'র চারটি নাম ব্যবহার সম্পর্কে যে উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার মূলেও আছে ঐ একই কারণ। ঝাঁটা বলিতে অভ্যস্ত গোষ্ঠীর ঘরে আসিয়াছে পিছা ব্যবহারকারীগোষ্ঠীর এক বধূ; আর এক বধূ আসিয়াছে সেই অঞ্চল হইতে যে অঞ্চলে ঝাঁটা বাড়ুন নামে পরিচিত; ইহাদেরই সংসারে কাজ করে যে ঝি, সে তাহার দেশের বাড়ীতে ঝাঁটাকে কোস্তা বলিয়াই জানে। এই সংমিশ্রণের ফলে একই বস্তু ঝাঁটা, পিছা, বাড়ুন ও কোস্তার নামাবলী পরিয়া একই ভাষাভাষীর ঘরে নির্বিবাদে কাজ করিয়া যাইতেছে।

শুধু বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলেই নহে, সর্বত্র সকল দেশেই, যেখানেই বিভিন্ন পর্যায়ের মানবগোষ্ঠীর মেলামেশা হইয়াছে বা সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানেই এইরূপ শব্দ-বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। তামিল ভাষায় বায়ুর ৩৪টি, জলের ৫০টি, মেঘের ৩৫টি, পৃথিবীর ৬২টি এবং পর্বতের ৬০টি একার্থক (synonyms) শব্দ পাওয়া যায়।[1]

শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুগুলির স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও এখানে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। বহু অঞ্চলে একটি শিল্পবস্তুর একই নাম ব্যবহৃত হইলেও শিল্প-রীতিতে প্রত্যেক অঞ্চলেই কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে। একই 'কলসী' নামে অভিহিত হইলেও গাঙ্গেয় অঞ্চলের কলসীর গড়ন, আর পূর্ববঙ্গের কলসীর গড়ন এক নহে। তমলুক এবং কাঁথির কলসীর মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণ চব্বিশপরগনার 'ঝাঁকা'র সহিত নদীয়ার ঝাঁকার মিল নাই। ধামা, খাদি, আগৈল, ঢাকি একই পর্যায়ভুক্ত হইলেও উহাদের গড়নে বিভিন্নতা আছে। বীরভূমের লাঙ্গল-জোয়ালের গড়ন, আর ময়মনসিংহের গড়ন একরূপ নহে; ঘরবাড়ী সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। লৌকিক শব্দকোষে শব্দের বিবৃতি দান কালে শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুগুলির এইরূপ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। ফটো এবং নক্সা দিতে পারিলে কাজ অনেকটা সহজ হইত; তবু আক্ষরিক বর্ণনার ভিতর দিয়া যতদূর সম্ভব এক অঞ্চলের মানুষের কাছে অপর অঞ্চলের এক একটি বস্তুর যথার্থ রূপ তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

---

1. The History of the Bengali Language, B. C. Mazumdar.

শুধু একার্থক শব্দেরই প্রাচুর্য নহে, বাংলা ভাষায় ভিন্নার্থক শব্দেরও অবধি নাই। অনেক শব্দেরই বাহ্যিক রূপ এবং উচ্চারণ এক, কিন্তু অর্থ একাধিক। এই অর্থ-পার্থক্যের প্রধান কারণ স্থানের দূরত্ব বা পরিবেশের অনৈক্য হইতে পারে। আবার একই অঞ্চলে একই পরিবেশের মধ্যেও বিভিন্ন অর্থদ্যোতক সমধ্বন্যাত্মক বহু শব্দের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্তমান গ্রন্থ হইতে এখানে ভিন্নার্থক শব্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:

'তাওয়া' বলিতে ময়মনসিংহে বুঝায়, পিতলের এক ধরনের হাঁড়ি; বরিশালে বুঝায়, আগুনের বিশেষ ধরনের মাটির পাত্র; হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও পাবনায় বুঝায়, রুটি সেঁকিবার লোহার অগভীর পাত্র। চব্বিশপরগনায় 'চিতি' এক জাতের সাপ, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে প্রজাপতি। 'গাছা' পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পিলসুজ, দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জেলেদের মাছের মাঝারি ধরনের চুপড়ি। 'উরুলি' মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে গোরু-মাড়ানো খড়, আসামে উলুধ্বনি। 'আটন' বাঁকুড়া ও বীরভূমে পূজার বেদী, পূর্ববঙ্গে গোল বাখারি। 'চাকি' কলিকাতা অঞ্চলে লুচি বেলিবার গোল পিঁড়ি, পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে গম, কলাই ইত্যাদি পেষিবার জাঁতা, ময়মনসিংহে পদ্মের চাকি এবং উত্তরবঙ্গে গোল কর্ণাভরণ। অবশ্য, চাকি-উদ্দিষ্ট এই চারটি বস্তুর মধ্যেই গোলত্বের একটা সাদৃশ্য আছে। 'চটি' বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়: ঢাকা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে 'চটি' ছোট বাখারি, রাঢ় অঞ্চলে তালপাতার আসন এবং বাংলার প্রায় সর্বত্র পাতলা বই, সরাই এবং জুতা বিশেষ। 'বাড়ি' শব্দটিও বসতবাড়ী, ফসলের খণ্ড খণ্ড জমি, লাঠি, আঘাত ইত্যাদি নানা অর্থদ্যোতক। 'চেলা' বাংলাভাষাভাষীদের সম্মুখে কখনো বিছা, কখনো মাছ, কখনো শিষ্য, কখনো বা জ্বালানী ফাড়া কাঠ ইত্যাদি নানা মূর্তিতে দেখা দেয়। একই চাষীর বাড়ীতে 'পাটি' পাতনির কাজও করে, আবার মই তৈয়ারিতেও লাগে।

ভাষাচার্যগণ বলেন, বিভিন্ন অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে এবং অন্য কারণে একই রূপ ধারণ করে। ('ভাষার ইতিবৃত্ত')।

অন্য কারণের মধ্যে পূর্বোক্ত বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর একত্র বসবাস এবং সংমিশ্রণ কারণটিও থাকিতে পারে।

এক অঞ্চলের মানুষ যে নামটি দ্বারা একটি বস্তুকে চিহ্নিত করে, অপর অঞ্চলের মানুষ সেই নামটি দ্বারাই অপর বস্তুকেও চিহ্নিত করিতে পারে। এইরূপ দুই অঞ্চলের মানুষ যখন একত্র হয় তখন একটি নামেই দুইটি বস্তু পরিচিত হইয়া পড়ে।

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ‘বিছা’ শব্দ-নির্দিষ্ট প্রাণীটি হইতেছে কলিকাতা অঞ্চলের ‘শুঁয়াপোকা’। কলিকাতা অঞ্চলেও ‘বিছা’ শব্দটি প্রচলিত আছে ; কিন্তু তদ্বারা আর একটি স্বতন্ত্র প্রাণীকে বুঝায়,—উহা হইতেছে কাঁকড়া বিছা (বিচ্ছু), তেঁতুলে বিছা বা সরস্বতী বিছা, যাহা পূর্ববঙ্গে সাধারণতঃ চেলা বা সাপচেলা নামে অভিহিত হয়। দেশবিভাগের পর উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গবাসীর সহিত গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। ফলে একই অঞ্চলে স্বতন্ত্র দুইটি প্রাণীর একই নাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় না, কারণ বাক্যের অন্বয় বা বক্তার মুখের কথা হইতেই আমরা অনেক সময় প্রযুক্ত শব্দটির অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি। যাঁহারা বিছাকে শুঁয়াপোকা বলিয়া জানেন, তাহারা বলেন, ‘বিছা গায়ে লাগে’ ; আর বিছা যাঁহাদের কাছে তেঁতুলে বিছা, তাঁহারা বলেন, ‘বিছায় কামড়ায়।’

মৌখিক ভাষার অধিকাংশ শব্দই শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তুর কিছুটা পরিচয় বহন করে। কোনও শব্দের ভিতর দিয়া বস্তুটির আকৃতির, কোনও শব্দ দ্বারা বা উহার প্রকৃতির আভাস পাওয়া যায়। আবার কোনও শব্দ বস্তুটির কোনও গুণ বা অপর কোনও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি, বিচারশক্তি বা সংস্কারাদি অনুসারে এক একটি বস্তু বা বিষয় এক একটি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে। একটি বস্তুর অনেক দিক থাকিতে পারে ; সামান্য একটি শব্দ দ্বারা উহার সকল দিক প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এজন্য বস্তুটির দুই একটি বৈশিষ্ট্য মাত্রই এক একটি শব্দের উপাদান রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু সকল বৈশিষ্ট্য সকলের কাছে ধরা পড়ে না। ফলে একই বস্তু, একই প্রাণী বা একই বিষয় নানা শব্দ-নাম গ্রহণ করিয়াছে। তৎসম, তদ্ভব এবং বিদেশী শব্দের মূল আমরা ধরিতে পারি ; কিন্তু অনেক দেশী শব্দেরই ব্যুৎপত্তি আমরা জানি না বলিয়া ঐরূপ শব্দ-চিহ্ন দ্বারা বস্তুটির কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না।

এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

একটি মাছের নাম বালিয়া, কলিকাতার উচ্চারণে বেলে। দেখা যায়, এই মাছটি অল্প জলে বালির উপর শুইয়া থাকিতেই যেন ভালবাসে। ইহার এই স্বভাব লক্ষ্য করিয়াই হয়ত নাম রাখা হইয়াছে, বালিয়া / বেলে। কিন্তু ময়মনসিংহে এই মাছটির আর এক নাম কটকটিয়া, স্থানীয় উচ্চারণে কট্‌কইট্যা। ডাঙ্গায় উঠাইলে অনেক সময় ইহার কট্‌কট্ শব্দ শুনা যায়। হয়ত তদঞ্চলের

লোক এই শব্দ হইতেই মাছটির নাম রাখিয়াছিল, কট্‌কটিয়া (যে কট্‌কট্‌ করে)।

ফেঁশা একটি মাছের নাম, ভীষণ সূক্ষ্ম কাঁটা। সূক্ষ্ম তন্তু অর্থে বহু অঞ্চলে ফেঁশুয়া কথাটির প্রচলন আছে (পাটের ফেঁশুয়া-ম)। ফেঁশা মাছের কাঁটাগুলিও ফেঁশুয়ার মত সূক্ষ্ম, তাই উহার ফেঁশা নামকরণ হওয়া বিচিত্র নয়।

চিকা গন্ধমূষিক। প্রায়ই চিক চিক শব্দ করিয়া চলে এবং কেবলই এটা ওটায় মুখ দেয়। হয়ত পূর্বাঞ্চলের লোক প্রাণীটির চিক চিক শব্দ হইতেই উহার নাম রাখিয়াছিল 'চিকা'। কিন্তু গাঙ্গেয় অঞ্চলের লোক উহার স্বভাবের দিকেই দৃষ্টি দিয়াছে বেশী এবং তদনুযায়ী নাম রাখিয়াছে ছুঁচা, হিন্দীতে ছছুন্দর।

বাংলার বহু অঞ্চলে মাছ ধরিবার একটি জালের নাম 'খেপলা জাল।' এই জালের কতকাংশ কনুই-এর উপর তুলিয়া শরীর একটু ঝাঁকিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া ক্ষেপণ করিতে হয়। খুব জোরে ক্ষেপণ অর্থাৎ নিক্ষেপ করিতে হয় বলিয়াই হয়ত ইহার খেপলা জাল নাম হইয়াছে। শরীর ঝাঁকিয়া ফেলিতে হয় বলিয়া কোথাও ইহার নাম 'ঝাঁকি জাল ;' কনুই-এর উপর তুলিয়া লইতে হয় বলিয়া কোথাও আবার ইহাকে 'কনুই জাল' বলা হয়। ঘুরাইয়া উড়াইয়া ফেলিতে হয় বলিয়া ইহার 'ঘুরনি জাল' এবং 'উড়া জাল' নামও শুনা যায়। জলপাইগুড়িতে ইহাকে 'ভাউড়ি জাল'ও বলে ; কিন্তু 'ভাউড়ি'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আমাদের জানা নাই। (১৮৫ পৃঃ)

মাটিতে মাথা গুঁজিয়া থাকে বলিয়া এক জাতের মাছের নাম গুজি মাছ।

কাঁসার তৈয়ারি একপ্রকার ছোট থালাকে 'কাঁসি' বলা হয়। অঞ্চলভেদে ইহারই অপর নাম 'বেলি।' কাঁসা উপাদান হইতে 'কাঁসি' নামকরণ হইতে পারে ; কিন্তু 'বেলি' নামটি হইতে বস্তুটির বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না।

চাষী, ছুটো, ঠিকোর / ঠিকে, দাওয়ালে, নগদা, নাগাড়ে, বাছাউল, হাটুরে প্রভৃতি শব্দ হইতে আমরা শব্দোদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাজের বা পেশার কিছুটা পরিচয় পাই।

আকালী, গাজলু, বাদল, বানু, পূর্ণিমা প্রভৃতি নাম হইতে নামধারীর জন্মকাল, জন্মকালের ঘটনা ইত্যাদির একটা আভাস পাওয়া যায়।

বিলাতি কুমড়া, বিলাতি বেগুন, মর্তমান কলা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি নামগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এইসকল নাম যে যে অঞ্চলে প্রচলিত, সেই সেই অঞ্চলে নামোদ্দিষ্ট বস্তুগুলি একদা ছিল না, বাহির হইতে কোনও সূত্রে আসিয়া সেখানকার জমিতে উৎপন্ন হইতেছে।

আবার সব শব্দই যে শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুটির পরিচয় বহন করে, তাহা নহে। আমরা আমাদের সন্তানের যে নাম রাখি, অধিকাংশক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাহা নামধারীর আকৃতি-প্রকৃতির বা গুণপনার তেমন কোনও পরিচয় বহন করে না; তাহা নামদাতারই শিক্ষা-সংস্কৃতির, তাঁহার ধ্যান-ধারণার, তাহার সামাজিক জীবনের আভাস দেয়।[১]

বর্তমান গ্রন্থে বিবৃত ব্যক্তিবাচক নামগুলি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উপভাষা-গুলিতে এমন সব শব্দ আছে, ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে যেগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী। লৌকিক শব্দকোষে এইরূপ বহু শব্দ পাওয়া যাইবে। 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় বলিয়াছেন:

'আমাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক দৈনন্দিন জীবনের মূল অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী আদি কৌমসমাজের মধ্যে। সেই হেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাচীনতম আভাস এই দুই ভাষার এমন সব শব্দের মধ্যে পাওয়া যাইবে, যেসব শব্দ ও শব্দ-নির্দিষ্ট বস্তু আজও আমাদের মধ্যে কোনো না কোনোরূপে বর্তমান।... আমাদের আহার-বিহার, বসনভূষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত এই সুদীর্ঘ শব্দেতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই হিসাবে এই শব্দগুলিই আমাদের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক উপাদান এবং নির্ভরযোগ্য উপাদানও বটে।'

আক্ষরিক অর্থের লোপ

কতকগুলি শব্দ লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের আক্ষরিক অর্থ এবং উদ্দিষ্ট অর্থ এক নহে।

ত্রিপুরা জেলার কোথাও কোথাও 'আধঘরা' কথাটি প্রচলিত আছে। উহার আক্ষরিক অর্থ, অর্ধেক ঘর বা ঘরের অর্ধ ভাগ; কিন্তু তদঞ্চলে 'আধঘরা' বলিতে বুঝায় বৈঠকখানা। এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়, এক সময়ে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে বৈঠকখানা বলিয়া কিছু ছিল না। শয়ন-গৃহেরই এক অংশ বেড়া দিয়া পৃথক করিয়া তাহাতে বাহিরের লোকজনদের বসিতে দেওয়া হইত। কালক্রমে এইরূপ বসিবার এবং আলাপ আলোচনা করিবার ঘরের অংশ বিশেষের নাম হইয়া দাঁড়ায় 'আধঘরা', স্থানীয়

১। বাগর্থ, ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। কি নাম রাখি ওর? (মৎলিখিত প্রবন্ধ)—মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬২।

উচ্চারণে 'আদ্‌গরা।' বর্তমানে একটি পৃথক সম্পূর্ণ ঘর বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইলেও তাহার পূর্ব নাম 'আধঘরা' একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

চণ্ডীশালের আক্ষরিক অর্থ, চণ্ডীর ঘর অর্থাৎ যে ঘরে চণ্ডীদেবতার পূজা হয় বা চণ্ডীর ঘট স্থাপিত আছে। কিন্তু মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলে এই কথাটি রান্নাঘর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার পশ্চাতেও ইতিহাস আছে। ভাল রান্না করিতে জানা স্ত্রীলোকের অন্যতম প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য হয়। আমরা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে দেখিতে পাই, বিবাহের পাত্রী হিসাবে ফুল্লরার গুণ সম্পর্কে বলা হইতেছে,

'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥'

রান্না যাহাতে ভাল হয়, সকলে খাইয়া প্রশংসা করে, তদুদ্দেশ্যে গৃহিণীরা চণ্ডীর শরণ লইতেন, রান্নাঘরে তাঁহার ঘট বসাইয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রার্থনা করিতেন। এখনো এই প্রথা বিরল নহে। এই হইতেই রান্নাঘরের এক নাম হইয়া দাঁড়ায় 'চণ্ডীশাল'। (চণ্ডীশাল দ্র)

বাঁকুড়ার কোনো কোনো অঞ্চলে দেবতার পূজামণ্ডপকে 'মেলা', তথা চণ্ডীমণ্ডপকে 'দুর্গামেলা' বলা হয়। মেলার আক্ষরিক অর্থ, যেখানে বহুলোক মিলিত হয়। চণ্ডীমণ্ডপে এককালে গ্রামের মজলিস বসিত, পাঠশালা জমিত, সামাজিক অনেক বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি হইত; শুধু তাহাই নহে, গ্রামের যুবকবৃন্দেরাও সেখানে খেলাধুলার আড্ডা জমাইতেন। এই মেলামেশা হইতেই দেবতার মণ্ডপ 'মেলা' নাম পরিগ্রহ করে।

'গোচালার' (৭০ পৃ) মূল অর্থ, যে ঘরে গোরু-বাছুর রাখা হয়। কিন্তু সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। পূর্ব-ময়মনসিংহে গোচালা বলিতে বুঝায়, যে ঘরে গোরুর খাইবার নাড়া রাখা হয়। এইরূপ অর্থ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, পূর্বে গোচর-ভূমির অভাব ছিল না, গো-মহিষাদি সারা বৎসর কাঁচা ঘাস খাইয়াই পুষ্ট হইত, খড়-নাড়া সংগ্রহ করিয়া রাখিবার তেমন প্রয়োজন হইত না; কালক্রমে গোচারণ ভূমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে থাকে এবং মাঠের নেড়া ধান গাছগুলিও (নাড়া) কাটিয়া আনিবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। অনেকে এইগুলির জন্য আর পৃথক ঘর না বাঁধিয়া সেগুলি গোচালার তথা গোশালারই একপাশে মাচার উপর সাজাইয়া রাখিতেন। এইরূপে গোচালার অর্থ-পরিবর্তন ঘটে এবং বর্তমানে মাত্র নাড়া রাখিবার ঘরকেই গোচালা বলা হয়।

গোবাট / গোপাট শব্দগুলির বর্তমান অর্থ দাঁড়াইয়াছে—লোকালয়ের সাধারণ পথ। এইরূপ নামকরণের ভিতর দিয়া সেকালের মানুষের একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়। তখন গোরু ছিল মানুষের সম্পদ, গোপালন ছিল তাহাদের অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। প্রতিদিন অসংখ্য গো-মহিষাদির যাতায়াতের ফলে লোকালয় হইতে গোচরভূমি পর্যন্ত যেসকল পথের সৃষ্টি হইত, সেই সকল পথই গোবাট নামে পরিচিত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়। বর্তমানে অনেক গোবাটই লোপ পাইয়াছে; যেগুলি আছে, সেগুলিও মানুষের যাতায়াতের পথে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটিলেও নামটি পূর্ববৎ আছে।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, অনেক শব্দেরই কালক্রমে অর্থ-পরিবর্তন ঘটিলেও, উহাদের বাহ্যিক রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে নাই এবং সেগুলির মধ্যে জাতির অনেক ঐতিহাসিক উপাদান প্রচ্ছন্ন আছে।

আম, কলা, মাছ

কোনো কোনো শব্দকে মানুষ শুধু ব্যবহারিক মূল্যই দেয় নাই, অন্তরের মূল্যও দিয়াছে।

আম (১৫৪ পৃ) একটি উৎকৃষ্ট ফল। ইহা সে খায়; ইহা দ্বারা নানা উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী তৈয়ার করে; আম এবং আমজাত দ্রব্যের ব্যবসা করিয়া তাহার আর্থিক সংস্থানও হয়; আমকাঠ সে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে, আমের তক্তা নানা কাজে লাগায়। এইসব কারণে আম, আমগাছ মানুষের কাছে বিশেষ মূল্যবান। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আমকে বাঙ্গালী মহিলারা পুণ্য অর্জনের সহায়ক বস্তু বলিয়াও মনে করেন। বারুণী-স্নান তাঁহাদের কাছে 'আম-বারুণী', সেদিন তাঁহারা গঙ্গায় জোড়া কাঁচা আম উৎসর্গ করেন। অরণ্যষষ্ঠী বাংলার কোথাও কোথাও 'আম-ষষ্ঠী'; এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সন্তানের হাতে ষষ্ঠীর আশীর্বাদ স্বরূপ একটি আম অবশ্যই দিতে হয়। পুণ্যকামী বাঙ্গালীরা দেবতার উদ্দেশে এবং গুরু-পুরোহিতকে আম উৎসর্গ (আম উচ্ছুগ্যে) করে। ঘটের মুখে সে আমসরং (আম্রপল্লব) স্থাপন করিয়া দেবতার উদ্দেশে ভক্তি-কামনা জানায়। বিবাহ-বাসরে, 'কলাতলে' আম পাতার বেষ্টনী রচনা করে। সে আমগাছ, কাঁঠালগাছ রোপণ করে শুধু আম খাইবার বা আমের ব্যবসা করিবার জন্যই নহে। সে মনে করে, আম-কাঁঠালের বাগান করিলে তাহার স্নেহের

তুলালী ছায়ায় ছায়ায় যাইতে পারিবে। 'আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।'—তাহার প্রাণের কথা। আম-বাগানের সহিত বাঙ্গালীর ইতিহাসের এক বিষাদমাখা অধ্যায়ও জড়িত রহিয়াছে, পলাশীর 'আম্রকুঞ্জে'র কথা স্মরণ করিয়া এখনো সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আবার শান্তিনিকেতনের 'আম্রকুঞ্জ' বিশ্বের কাছে তাহার আর এক রূপ তুলিয়া ধরে।

কলা (১৫০ পৃঃ) আর একটি উৎকৃষ্ট ফল, ছেলে বুড়া সকলেরই অতি প্রিয়। বাঙ্গালী কলা খায়, থোড় খায়, মোচা খায়, বাসনা দিয়া উনন ধরায়, কলার বাগান করিয়া অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নয়। কলা এবং কলাগাছকে সে তাহার মনোজগতের কারবার দরবারের মধ্যেও স্থান দিয়াছে। তাহার এমন আচার-অনুষ্ঠান খুব কমই আছে যাহাতে কলা দেওয়া হয় না। কাঁটালি কলা না হইলে লক্ষ্মী পূজা হয় না, আরও অনেক পূজা-ব্রতই অপূর্ণ থাকে। কলা বারমাসই পাওয়া যায় এবং একটি উৎকৃষ্ট ফলও বটে। তাই হয়ত আচার-অনুষ্ঠানে কলার এত প্রাধান্য। কিন্তু স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, মর্তমান ইত্যাদি আরও ভাল কলা থাকিতে বীচিযুক্ত কাঁটালি কলা কেন? মনে হয়, সংশ্লিষ্ট ব্রতাদির উদ্ভবের কালে এই জাতের কলাটিই সুলভ ছিল। সাধারণ মানুষের মন রক্ষণশীল, একবার যাহা দেবতার পূজার উপকরণ হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার সে পরিবর্তন করিতে চায় না। মর্তমান কলা বিদেশাগত বলিয়াও একটা জনশ্রুতি আছে, গোঁড়া রক্ষণশীল সমাজে পূজাদি অনুষ্ঠানে বিদেশী বস্তু কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই হয়ত গোলাপ ফুল 'ফুলের রাণী' হইলেও পূজায় লাগে না। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চলে 'মর্তমান' কলাকে বলা হয় 'সবরী কলা' এবং সেদিকে ইহা বিদেশাগত বলিয়াও কোনো লোকশ্রুতি নাই। সেদিকে বরং শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপে এই কলাই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সবরী কলাটি তদঞ্চলে পূর্ব হইতেই ছিল, গাঙ্গেয় অঞ্চলে হয়ত উহা মার্টাবান হইতে আসিয়া মর্তমান নাম ধারণ করিয়াছে। বনদুর্গার পূজায় বা 'বারানে' (২২৭ পৃঃ) আবার বীচিপ্রধান আইঠ্যা কলাই (চব্বিশ পরগনায় 'ডেমবি' জাতীয় কলা) না হইলে চলে না।

কলা সম্পর্কে আরও নানা সংস্কার আছে। চাঁপা কলা পূজায় দিতে নাই, উহা নাকি বিশ্বামিত্র ঋষির সৃষ্টি। এই লোকবিশ্বাসের পশ্চাতে মনে হয় এই

সত্যটিই নিহিত আছে যে, আদিতে চাঁপা (চিনি চাম্পা) জাতের কলার চাষ বাংলাদেশে ছিল না, পরে বিশ্বামিত্র, কি অপর কাহারো দ্বারা উহা এদেশে প্রবর্তিত হয়। ততদিন হয়ত অন্য কলা শাস্ত্রীয় পূজাদিতে সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশ্বামিত্র ঋষির প্রতি যে বশিষ্ঠাদি ঋষির জাতক্রোধ ছিল তাহা ত সুবিদিত।

কিন্তু কলা বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উপকরণ হইলেও 'কলা অযাত্রা', 'কলা খাইয়া কোথাও যাইতে নাই', এইরূপ সংস্কার অনেকের মধ্যে বদ্ধমূল। একই সমাজে একই বস্তু সম্পর্কে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ মতের অস্তিত্ব বিভিন্ন মতাবলম্বী মানবগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু কলা নয়, বাঙ্গালীর সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কলাগাছও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। **'কলাতল', 'কলাতলা' 'কলাতলায় স্নান'** (২০৩ পৃ), **'কুঞ্জ'** (২০৪ পৃ) প্রভৃতি শব্দ-নির্দিষ্ট বিষয় লইয়া আলোচনা করিলে মানবগোষ্ঠীর যেন আদিম চিন্তাধারারই আভাস পাওয়া যায়। বাংলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দুসমাজে বর-কন্যার বিবাহ-কালীন স্নান চারটি কলাগাছ বেষ্টিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ছাঁদনাতলায়ও বহু অঞ্চলে কলাগাছ পুঁতিয়া বর-প্রদক্ষিণ ও সম্প্রদানাদি সম্পন্ন হয়। বিবাহে কলাতলাকে এত প্রাধান্য দেওয়ার মূলে হয়ত ছিল বহু সন্তানলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রয়োজন। সেই আদিম যুগে ধনবলের চেয়ে লোকবলই ছিল প্রধান বল। এক মানবগোষ্ঠীর উপর অপর মানবগোষ্ঠীর প্রভুত্ব এই লোকবলের উপরই অধিক নির্ভর করিত। কলার ঝাড় বাড়ীর আঙ্গিনায়ই ছিল ; সেই ঝাড়ের দিকে চাহিয়া মানুষের হয়ত মনে হইত, কি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়! এক একটি গাছ ঘেরিয়া দেখিতে দেখিতে কতগুলি চারা বাড়িয়া উঠে! প্রকৃতিরাজ্যের এই দৃষ্টান্ত হইতে আদিম মানুষের মনে এই ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, কলাতলে বর-কন্যার মিলন ঘটিলে কলার ঝাড়ের মতই দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হইবে। এই আদিম চিন্তাধারা হইতেই হয়ত এককালে কলাগাছের বেষ্টনীর ভিতর বিবাহ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল।

কোনো কোনো সমাজে বাঁশের কঞ্চি পুঁতিয়াও বিবাহ হইতে দেখা যায়। এই প্রথার মূলেও ঐ একই চিন্তাধারা থাকা বিচিত্র নয়। বাঁশের ঝাড়ও কলার ঝাড়ের মতই বাড়ে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ধানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিবার মূলেও হয়ত মানুষের অনুরূপ আদিম

চিন্তাধারাই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাহারা দেখিত, দূর্বাঘাস সহজে মরে না, বৃদ্ধিও পায় অতি দ্রুত। কাজেই দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলে কল্যাণীয় কল্যাণীয়ারা দীর্ঘায়ু হইবে, এইরূপ মনে করা বিচিত্র নয়। ধানকে সাধারণ মানুষ লক্ষ্মী মনে করে এবং বহু অঞ্চলে ধানছড়া ও কুনকেভরা ধান লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। কাজেই ধান দিয়া আশীর্বাদ করিবার মধ্যে 'সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি হউক' এই কামনাই যেন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

সাধারণ মানুষ কলাপাতাকেও শুধু পাতা হিসাবেই দেখে না, কলাপাতার অগ্রভাগ (আগপাতা, মাজপাতা) তাহার কাছে পবিত্র ; এই পাতায় সে দেবতার উদ্দেশে ভোগনৈবেদ্য সাজাইয়া দিয়া হৃদয়ের কামনা ব্যক্ত করে। জীবনের এক মহাক্ষণে—বিবাহকালে, সে কলার মাজপাতা (মাজদর্পণ ও ধুতুরাকাটাইল ২০৮ পৃ) হাতে রাখে। কলার খোলাও (বাকলা) তাহার কাছে অবজ্ঞার নয় ; খোলে, খোলের তৈয়ারি ডোঙ্গায় সে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করে (১৫৮-৫৯ পৃ)।

গৃহপ্রবেশ কিংবা গৃহ হইতে যাত্রা করিবার কালে, বিবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানে, সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতের সংবর্ধনায় সে কলাগাছ পুঁতে, দশপ্রহরণ ধারিণীর পূজার আগে কলাগাছের পূজা করে (কলাবউ ২২০ পৃ), কলা-বিবাহের (২২০ পৃ) অনুষ্ঠানে যোগদেয়, নিজে কলাগাছের সঙ্গে মালাবদল করে (গাছবেড়া ২২৯ পৃ)।

কলার মান্দাসের (ভেলা) সঙ্গে বাঙ্গালীর ধর্ম ও সমাজ জীবনের কত কাহিনীই না জড়িত আছে। কলার ভুড়া তাহার কাছে শুধু পারাপারের ডিঙ্গিই নহে, বেদনার মূর্ত প্রতীক।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, এক একটি শব্দের অন্তরালে মানুষের কত সংস্কৃতির ধারা, কত কথাকাহিনী প্রচ্ছন্ন আছে।

মাছ (১৭৮ পৃ) বাঙ্গালীর আর একটি অতি প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মাছকে বাঙ্গালী শুধু খাদ্য তালিকার মধ্যেই রাখে নাই। মাছ তাহার একটি প্রধান মাঙ্গলিক দ্রব্য। বৈবাহিক তত্ত্ব-সামগ্রীর মধ্যে মাছ (পোনামাছ) একটি থাকিবেই। শ্রীপঞ্চমীদিন জোড়া ইলিশ (১৭৮ পৃ) ঘরে আনিয়া সে উৎসব করে। অতি নগণ্য যে পুঁটি মাছ তাহাকেও সে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া বহুমূল্য গহনাদির পার্শ্বে স্থান দেয় (যাত্রাপাতা, ২২৯ পৃ)। বোয়াল মাছ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ ; দেখিয়াছি, এই মাছ দিয়াও প্রতিদিন ব্রাহ্মণ-সেবিত দেবী দয়াময়ীর (জামালপুর, ময়মনসিংহ) ভোগ দেওয়া হয়।

রাঘব বোয়াল (১৮৩ পৃ) মাছ বটে। কিন্তু ইহাও বাঙ্গালীর অসংখ্য রূপকথা, ব্রতকথার মধ্যে আসিয়া আসর জমাইয়াছে। রাঘব বোয়ালের সেই গহনার পুঁটলি ভক্ষণের ভিতর দিয়া (মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা) বাঙ্গালীর মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠে তাহার অতীত স্বর্ণযুগের চিত্র, যখন বণিকদের পণ্য ভরা ডিঙ্গা সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত।

কালভেদে অবশ্য, রাঘব বোয়াল এখন বাংলা ভাষার বক্রোক্তিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বড় বড় পুঁজিপতি, শিল্পপতি প্রভৃতিকেই এখন সাধারণ লোক রাঘব বোয়াল বলিয়া থাকে।

পান-তামাক

আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মজীবনে পান-তামাক একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অতিথি-অভ্যাগতকে পান তামাক দিয়া আদর আপ্যায়ন করিবার রীতি অতি প্রাচীন এবং এখনো বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সমভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে।

'পানখিল', 'পানচিনি', 'পান দেওয়া', 'পান লওয়া' (২১০ পৃ) প্রভৃতি শব্দের মুকুরে বাঙ্গালীর সেকালের, এমন কি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের বর্তমান কালেরও সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়। বিবাহোপলক্ষে আত্মীয়-বান্ধব এবং স্বসমাজের ঘনিষ্ঠ সকলকে পান দিয়া নিমন্ত্রণ করিবার রীতি এক সময়ে বহুপ্রচলিত ছিল। এখনো বাংলা এবং আসামের বহু স্থানে বহু সমাজে পল্লী অঞ্চলে এই প্রথার প্রচলন দেখা যায়।

শুধু বিবাহোপলক্ষে নয়, এককালে হয়ত সকল প্রকার নিমন্ত্রণই পান দিয়া করা হইত। এক সময়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে লোক মারফত সাদর সম্ভাষণ ও আহ্বান জানাইতে হইলেও, সঙ্গে পান পাঠাইয়া দিবার রীতি সুপ্রচলিত ছিল। আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

হিন্দুর বিবাহাদি শুভকার্য, দেবকার্য, পিতৃকার্য,—কিছুই পান ছাড়া সম্পন্ন হয় না। দেবতার পূজায়, উৎসবে-পার্বণে, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে পান-সুপারি অপরিহার্য উপকরণ। হিন্দুর সামাজিক জীবনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুদূরপ্রসারী অনুষ্ঠান হইতেছে বিবাহ। এই বিবাহের

সূচনা হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত পান-সুপারির অত্যাবশ্যকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চট্টগ্রামের নানাস্থানে মুসলমান সমাজে 'তেলোয়াই' নামে একটি প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কনের পিতা বরের বাড়ীতে একদফা উপহার পাঠাইয়া থাকেন। উহাতে 'পানের ঝাড়'ই প্রাধান্য লাভ করে। সাধারণতঃ একটি আমের ডালের প্রতি পাতার সঙ্গে পানের খিলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। একটি মজুর সেই ডালটি কাঁধে করিয়া বরের বাড়ীতে লইয়া যায় এবং সকলে তাহা হইতে পান তুলিয়া খায়; অবশিষ্ট পান পাড়ায় বিতরিত হয় ('আর্কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য')।

পানপড়া (২২৬ পৃ)—ইহা হইতে আমাদের সমাজের সেকালের আর এক রকম পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে পুরুষেরা প্রায়ই বহুবিবাহ করিত; সপত্নীদের মধ্যে এজন্য স্বামীকে আপন আপন বশে রাখিবার তীব্র প্রতিযোগিতা চলিত। অনেকে এই ব্যাপারে বশীকরণমন্ত্র, ঔষধ, কবচ ইত্যাদির আশ্রয় লইত। শুধু যে সপত্নীরাই এক্ষেত্রে অগ্রণী ছিল, তাহা নহে; পুরুষ-নারী নির্বিশেষে দুষ্টপ্রকৃতির যে কেহ ঈপ্সিত জনকে করায়ত্ত করিবার জন্য অনেক সময় বশীকরণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি লোকপ্রিয় এবং পান দিয়া আদর আপ্যায়নের প্রথা বহুপ্রচলিত বলিয়াই পানের ভিতর ঔষধ পুরিয়া কিংবা পান মন্ত্রপূত করিয়া কাহাকেও খাওয়ানো খুব সহজ ছিল।

এই 'পানপড়া'র ভীতি কোনো কোনো সমাজে এখনো আছে বলিয়াই মনে হয়। অতিথি-অভ্যাগতকে পান সাজাইয়া দিবার রীতি সকল সমাজে নাই। একটি বাটায় করিয়া পান, সুপারি ও চুন-খয়ের আগন্তুকের সামনে পৃথক পৃথক রাখা হয় এবং তিনি নিজ হাতে পান সাজাইয়া খান। দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের আর্যেতর জাতির মধ্যে এই রীতি সমধিক প্রচলিত। লক্ষ্য করিয়াছি, যে সব সমাজে পান সাজাইয়া দেওয়া হয়, সেইসব সমাজেও কেহ কেহ পানের খিলিটি মুখে দিবার পূর্বে প্রথমে শুঁকিয়া লন, কিংবা খিলির অগ্রভাগ দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেন। এইরূপ করার মূলে সেকালের পানপড়া-ভীতির প্রভাব প্রচ্ছন্ন আছে কি না কে বলিবে?

বাংলাদেশে এমন কয়েকটি ব্রত আজও প্রচলিত আছে, যেগুলির একমাত্র বা মুখ্য উপকরণ পান-সুপারি। ময়মনসিংহে গোটা পান ও সুপারি দিয়া

'ছুবচনাই' ব্রত (সুবনৌ ?) করা হয়। 'ঠুনকাপীর' নামক এক পীরের উদ্দেশও পান-সুপারি উপকরণে এক ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।[১]

আসামের গারো, খাসী প্রভৃতি পার্বত্য জাতির এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়বাসীর মধ্যেও পান-তামাক খাওয়ার এবং পান-তামাক দিয়া ভদ্রতা রক্ষার রীতির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। তাহাদের সমাজেও কেহ কাহারো বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে পান-তামাক না দেওয়াটা ভয়ানক অভদ্রতার মধ্যে পরিগণিত হয়। মালয়ে কোনো কোনো সম্প্রদায়ে এই লইয়া পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং এই সূত্র ধরিয়া অনেক সময় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা-হাঙ্গামা পর্যন্ত হইতে দেখা যায়।[২] গারো, খাসী, হাজং প্রভৃতির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, নিজেদের ঘরে না থাকিলেও প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে পান-তামাক আনিয়া তাহারা আগন্তুকের হাতে তুলিয়া দেয়।

পান-সুপারি ও তামাকের উৎপত্তি ও প্রচলন সম্পর্কে আসামের খাসীদের মধ্যে সুন্দর একটি উপকথা প্রচলিত আছে। কোনও সময়ে দুই বন্ধু ছিল, একজন খুব ধনী, আর একজন খুব দরিদ্র। ধনী বন্ধু প্রায়ই তাহার দরিদ্র বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, কিন্তু দরিদ্র বন্ধু আপনার অসচ্ছলতার জন্য আর প্রতিনিমন্ত্রণ করিতে পারিত না। ইহাতে সে একটা অস্বস্তি বোধ করিত। শেষে একদিন স্ত্রীর অনুরোধে মাত্র ভদ্রতা রক্ষার জন্যই ধনী বন্ধুটিকে আহারের নিমন্ত্রণ করিল। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও দরিদ্র স্বামী-স্ত্রী ধনী বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করিবার মত উপযুক্ত খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারিল না। ইহাতে ক্ষোভে দুঃখে অভিভূত হইয়া আসন্ন লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা উভয়ে আত্মহত্যা করিয়া বসিল। সেই রাত্রিতে এক ডাকাত দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদের ঘরে জ্বলন্ত আখার ধারে আসিয়া আশ্রয় লইল। প্রভাতে চলিয়া যাইবার মুখে পার্শ্বের দুইটি মৃতদেহ দেখিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে ডাকাতটিও নিজের প্রাণ নিজে বিসর্জন দিল। দুপুরে ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া ব্যাপার কি সমস্ত জানিতে বুঝিতে পারিল। তখন ব্যথিত চিত্তে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল,—'হে ভগবান, গরীব যাহারা, তাহারাও যাহাতে ভদ্রতা

১ সভ্যতায় পান তামাক, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৩

২ Ancient Rites & Ceremonies by Keith Murray.

রক্ষা করিতে পারে, এমন একটা কিছু উপায় করিয়া দাও।' তাহার প্রার্থনায় অচিরেই সেই তিনটি মৃতদেহ হইতে তিনটি গাছ উৎপন্ন হইল, একটি পানের, একটি সুপারির ও একটি তামাকের। খাসীরা বলে, এই ঘটনা হইতেই সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার ব্যাপারে পান-তামাকের প্রচলন হইয়াছে।[১]

অতিথি-অভ্যাগতকে পান দিয়া সমাদর করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, পল্লীগীতিতে ভুরি ভুরি। শুধু আদর আপ্যায়নের ব্যাপারেই নহে, কোনও মাননীয় ব্যক্তি বা রাজামহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেও পান-সুপারি ভেট দিবার প্রথা সুপ্রচলিত ছিল।

হুঁকা বন্ধ করা

হুঁকা বন্ধ করা (১১৬ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া আমরা সেকালের সামাজিক বিচার-আচারের একটা আভাস পাই। কেহ কাহারো বাড়ীতে উপস্থিত হইলে তাহাকে তামাক দিয়া সংবর্ধনা করাই ভদ্ররীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; তখন আগন্তুককে তামাক না দেওয়া মানেই তাহাকে অপমানিত করা। তখনকার সমাজপতিরা কোনও ব্যক্তিকে কোনও অপরাধের জন্য সমাজচ্যুত করিতে চাহিলে তাহাকে হুঁকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতেন; শুধু তাহাই নহে, ধোপা নাপিতও তাহার কাজ করিত না। সমাজের সকলের কাছে যথারীতি সম্মান না পাওয়াই সমাজচ্যুত হওয়া।

হুঁকাবরদার

হুঁকাবরদার (১১৬ পৃঃ) কথাটির ভিতর দিয়া সেকালে অনেক অভিজাত পরিবারে তামাক খাওয়াটা যে কিরূপ বিলাস ও আড়ম্বরের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারই আভাস পাওয়া যায়। নবাবী আমলে যখন কোনও ধনী অভিজাত ব্যক্তি ভ্রমণে বাহির হইতেন বা স্থানান্তরে যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে অন্ততঃ একজন হুঁকাবরদার থাকিত। সে বেশ একটা বড় কলকেতে তামাক সাজাইয়া গুড়গুড়ি হাতে মনিবের অনুগমন করিত, আর প্রভু মধ্যে মধ্যে নলটি হাতে লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে তামাক টানিয়া যাইতেন। তাঁহাদের আলবোলা নাকি গোলাপজলে পূর্ণ করা হইত এবং তামাকও সাধারণ থাকিত না, উহার

(১) Folktales of the Khasis by Mrs. K. U. Rafy.

মিঠাকড়া গন্ধ বেশ একটা আমেজের সৃষ্টি করিত। কোনো কোনো বড়লোকের আমিরি এত ছিল যে, তাঁহারা কলকে ঠাণ্ডা হওয়া বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গুড়গুড়িটি থাকিত ভৃত্য-মহলে, আর তৎসংলগ্ন নলের মুখটি থাকিত প্রভুর অন্তঃপুরে, বিশ্রামকক্ষে কিংবা শয়নাগারে। সেকালে অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীও যে এদেশের বড়-ঘরের প্রভাবে পাইপ ছাড়িয়া গুড়গুড়ি টানিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ত কত কত কথায় এবং প্রাচীন চিত্রে রহিয়া গিয়াছে। কালীকৃষ্ণ দাস-বিরচিত 'কামিনীকুমার' গ্রন্থে রামবল্লভের তামাক সাজার কথাটিও বেশ উপভোগ্য :—"রামবল্লভ তামাক সাজা কর্মে নিযুক্ত হইলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তামাক সাজিতে সাজিতে রামবল্লভের তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে, রামবল্লভ যদ্যপি ভোজনে কিম্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে, ওহে রামবল্লভ, কোথায় গেলে হে, রামবল্লভের উত্তর— 'আজ্ঞা, তামাক সাজিতেছি।' (বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়)

দরবেশের সেবা

দরবেশের সেবা (২২৪ পৃঃ) অনুষ্ঠানটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, হঁকা টানা প্রথা কেবল পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কোনো কোনো সম্প্রদায়ের বর্ষীয়সী মহিলারাও তামাক খাইতেন এবং এখনো অনেকে খাইয়া থাকেন,—'দরবেশের সেবা' একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অনেকে বলিয়া থাকেন, তামাকের ব্যবহার নাকি এই সেদিন পর্যন্তও অনেক দেশেই জানিত না। আমেরিকার মেক্সিকোর অধিবাসীদের মধ্যে তামাকের চাষ ও ধূমপান প্রচলিত ছিল এবং সময়ে সময়ে তাহারা এই ব্যাপার লইয়া উৎসবাদি করিত। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় স্পেনবাসীরা তামাক গাছের সহিত নাকি প্রথম পরিচিত হয় এবং ক্রমে সমগ্র ইউরোপ উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীর সকল দেশ তামাকের গুণাগুণ ও বিবিধ ব্যবহার জানিয়া লয়। ভারতের লোক যে কবে হইতে হুঁকা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহ বলিতে পারে না। তবে হুঁকা (হুঁকো, হুকা, হুক্কা, উক্কা), চিলম (চিলুম, ছিলুম, ছিলিম), আলবলা, হুঁকাবরদার প্রভৃতি শব্দ হইতে অনুমান করা যায় যে, বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে আরবী ফারসী শব্দের প্রবেশের মুখেই বাংলা দেশে হুঁকা খাওয়ার প্রথাও প্রবর্তিত হয়। ('সভ্যতায় পান তামাক)।

গায়ে হলুদ

গায়ে হলুদ (২০৪ পৃ) বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। শুধু হিন্দু-সমাজেই নহে,—ওরাওঁ, বাঙ্গারা প্রভৃতি পার্বত্যজাতির মধ্যেও ইহা সুপ্রচলিত। বিবাহ-দিবসে অথবা তৎপূর্বে কোনও সময়ে বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে হলুদবাটা প্রভৃতি মাখাইয়া স্নান করানো হয়। স্থান ও সমাজ-ভেদে হলুদের সঙ্গে 'মুথা' নামক একপ্রকার ঘাসের মূল, গিলা, সরিষা, মাষকলাই ইত্যাদি দ্রব্যও বাটিয়া দেওয়া হয়।

মনে হয়, দেহশুদ্ধিই এই আচারটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মন্ত্রপাঠে যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, ভেষজ দ্রব্য লেপনে তেমনই দেহশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। বিবাহের ভিতর দিয়া ভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে পরিবর্ধিত, ভিন্ন গোত্রীয় দুইটি পুরুষ-নারীর দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়। ইহার ফলে একের কোনো দেহ-ব্যাধি অপরের দেহে অনায়াসেই সংক্রামিত হইতে পারে। অনেক রোগের জীবাণুই পরস্পরের সংস্পর্শ হইতে শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়। এই সংক্রমণকে রোধ করিবার জন্য চর্মশুদ্ধির তথা দেহশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে তাহাই করা হয়। সেই আদি যুগে যখন সাবান, পাউডার, বিশোধক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক) ঔষধাদি আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন মানুষ রোগের চিকিৎসায় বা রোগ-প্রতিষেধে ভেষজ গুণসম্পন্ন লতাপাতা ফলমূল ইত্যাদি ব্যবহার করিত। কোন দ্রব্যের কি গুণ, কোন রোগে কি খাইতে হয়, কি মাখাইতে হয়, কোন রোগের কি প্রতিষেধক অতি সাধারণ লোকেও তখন জানিত। সেই যুগের কি আজও অবসান ঘটিয়াছে ? ঘটে নাই। গ্রামে গ্রামে টোটকা চিকিৎসা এখনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। সর্বসাধারণের মধ্যে হলুদের ব্যবহার যেরূপ ব্যাপক, তাহাতে মনে হয়, বিজ্ঞানপূর্ব যুগেই মানুষ হলুদের গুণাগুণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে হরিদ্রা এবং উপরোক্ত দ্রব্যগুলির নানা ভেষজগুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিদ্রা যেমন নানা রোগের প্রতিষেধক, তেমনই নানা রোগের নিবৃত্তিকারকও বটে। বিশেষ করিয়া ইহা দেহকান্তি বর্ধিত করে। অমাদের ভাজা ব্যঞ্জন ডাল ইত্যাদি আহার্যে হলুদ ত অপরিহার্য। অনেকে প্রতিসকালে নিয়মিত হলুদ-গুড় খাইয়া থাকেন। অনেক সমাজে বর-কন্যাকে হলুদ মাখাইয়া শুধু একদিনই স্নান করানো হয় না, বিবাহের পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়াই নাওয়ানো হয়। বিবাহ-উপলক্ষ্য ছাড়াও অন্যসময়ে গায়ে হলুদ মাখিয়া স্নান করিবার রীতি বহুস্থানে প্রচলিত আছে। বাংলার বহু অঞ্চলে

শ্রীপঞ্চমী-দিবসে ছেলেমেয়েরা হলুদ এবং সরিষা বাটা গায়ে মাখিয়া স্নান করে এবং হলুদ-ছোপানো কাপড় পরে। মাদ্রাজেও কোনো কোনো সমাজে পৌষ-সংক্রান্তিতে হলুদ ও মাষকলাই বাটা মাখিয়া স্নান করিবার প্রথা আছে। শুধু অন্নপ্রাশনাদিতে নহে, অন্য সময়েও অনেক জননীকে তাহাদের শিশুকে তেলহলুদ মাখাইয়া স্নান করাইতে দেখা যায়। এই সকল হইতে অনুমান করা যায়, 'গায়ে হলুদ' আচারটির উদ্ভবের মূলে আছে হলুদের বিশোধক ও অঙ্গরাগবর্দ্ধক গুণ।

জলসহা

জলসহা—জলসাওয়া, জলসাধা (২০৬ পৃ), সোহাগমাগা (২১৬ পৃঃ) —এইগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার। পুত্র ও কন্যার বিবাহে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের শুভেচ্ছা ও সন্তোষ এবং অনুমোদন কামনা করাই ইহাদের মূল উদ্দেশ্য। বিবাহ যে এককালে সামাজিক ব্যাপার ছিল, উহাতে সমাজের সকলের অনুমোদন লাভ করিতে হইত, উল্লিখিত আচার-গুলির ভিতর তাহারই আভাস পাওয়া যায়। শুধু স্বসমাজ নয়,—গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, নাপিত, মালাকার, কামার, কুমার, সকল সম্প্রদায়ের বাড়ী হইতেই শুভেচ্ছাপূত জল সংগ্রহ করিয়া পুত্র-কন্যাকে বৈবাহিক স্নান করানো হইত। 'সোহাগমাগার' ভিতর দিয়া কন্যাকে পরগৃহে পরহস্তে সমর্পণ করিবার প্রাক্কালে স্নেহাতুরা জননীর মনের বিষম অবস্থাটিই প্রকাশ পায়। তিনি কৌলিন্যের অহঙ্কার, ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার,—সকল অহঙ্কার মুছিয়া ফেলিয়া গলায় কাপড় জড়াইয়া, মাথায় কুলা তুলিয়া খালি পায়ে প্রতিবেশীনীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহাদের সোহাগ সন্তোষ, তাহাদের অনুমোদন কামনা করেন। তিনি মুখে কিছু বলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মন হয়ত কেবলই বলিতে থাকে, 'ওগো, আমার যে দুলালী এতদিন তোমাদের মধ্যে ছিল, কাজে-অকাজে তোমাদের অতিষ্ঠ করিয়া মারিত, আজ সে পরগৃহে যাইতেছে,—তোমরা অনুমোদন কর, তোমরা তাহাকে আশীর্বাদ কর, তোমাদের শুভেচ্ছা তাহার উপর বর্ষিত হউক, তাহার যাত্রাপথ শুভ হউক, তাহার জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়া উঠুক।[১]

১। বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত, মাসিক বসুমতী, কার্তিক—ফাল্গুন ১৩৫৭।

সিঁদুর দান

সিঁদুর দান (২১৬ পৃঃ)। বিবাহে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর দান এবং সধবাদের সিঁদুর ধারণের প্রথা বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে বহুপ্রচলিত। সাঁওতাল মুণ্ডা, ওরাওঁ, বীরহোড়, নেওয়ার ইহারাও বিবাহে বধূর কপালে সিঁদুর দানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ইহাদের মধ্যে সিঁদুরদানই বিবাহের মুখ্য আচার, ইহা দ্বারাই বিবাহ পাকা হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের অপেক্ষা ইহাদের সমাজে সিঁদুরের মর্যাদা অধিক।

অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন, বাংলা এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহের হিন্দুরা প্রতিবেশী কোনও অনার্য বা আদিবাসী সমাজ হইতে বিবাহে বর কর্তৃক বধূকে সিঁদুর পরাইবার প্রথাটি গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বলিবার আরও হেতু আছে। বৈদিক গৃহসূত্রাদিতে বিবাহে বর কর্তৃক বধূকে সিঁদুর দানের কোনও নির্দেশ নাই, পরবর্তী কালে কোনো কোনো পদ্ধতিকার 'শিষ্ট-সমাচার' রূপে মাত্র উহা অনুমোদন করিয়াছেন। আর্য-সংস্কৃতিতে আদিবাসী উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে এবং আমাদের সমাজে খাঁটি আর্যরক্ত বিরল,—নানা দিক্ দিয়া নানা তথ্যের আবিষ্কার দ্বারা ইহা একরূপ প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই সিঁদুর দানের মধ্যে আর্যেতর সমাজের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। আর্যধর্মের বিস্তারকালে বাঙ্গালী ও বিহারী আর্যদের মধ্যে সিঁদুর ব্যবহারকারী মানবগোষ্ঠীই হয়ত সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে এবং তাহাদের সহিত আর্যসমাজের নিবিড় সংমিশ্রণের ফলে বাংলা দেশে এক স্বতন্ত্র ভাবধারা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজে যে সিঁদুর দানের প্রথা নাই, পূর্বভারতে, তথা বাংলায় আছে, তাহার কারণ হয়ত এখানকার আর্যসমাজে সিঁদুর ব্যবহারকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাহাদেরই প্রভাবের ফলে পশ্চিম দেশাগত সংখ্যালঘু আর্যরা এবং অপর অনেকে কালক্রমে বিবাহে সিঁদুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করা যায়।[১]

কন্যাদায়

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কন্যার বিবাহ বড়ই বেদনাদায়ক। সন্তান সে পুত্রই হউক, আর কন্যাই হউক, সুরূপই হউক আর কুরূপই হউক, মাতাপিতার

১ সিঁথির সিঁদুর, গল্পভারতী পূজাসংখ্যা

নিকট তাহার ন্যায় আনন্দদায়ক আর কিছুই নহে। কিন্তু এই নয়নানন্দ, হৃদয়ানন্দ গৃহের আনন্দ সন্তান যদি কন্যা হয়, তবে আমরা তাহাকে দায়স্বরূপ মনে করি; কন্যাদায়ের মত দায় আর নাই। কন্যাকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত পিতামাতার চিন্তা-চেষ্টার, দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। পাত্রস্থ করিয়াও কি তাঁহাদের স্বস্তি আছে? পাত্র যদি সুপাত্র না হয়, কন্যা যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর না পড়ে, অন্তর্জ্বালায় তাঁহারা সকলে নীরবে অহর্নিশ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা কি দেখিতে পাই? কন্যাটি হয়ত সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং গৃহকর্মে নিপুণা; কিন্তু তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে এক দরিদ্র অশিক্ষিত স্বামী, তিনি বৃদ্ধ, মৃতদার অথবা বহুদারও হইতে পারেন। যোগ্যতার মধ্যে তাহার হয়ত আছে বল্লালী কৌলিন্যের গর্ব, আর একান্নবর্তী পরিবারে কাহারও উপর নির্লজ্জ নির্ভরশীলতা। কন্যা অপাত্রে বা দারিদ্র্যে পড়ুক, ইহা কোন মাতাপিতাই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু আমাদের সমাজে তেমন সুপাত্র আর কয়টি মিলে? নির্দিষ্ট বয়সে নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মেয়েদের বিবাহ দিতে হয়; তাহার ব্যতিক্রম হইলেই চারিদিকে নিন্দাচর্চার সীমা থাকে না। ছেলের বিবাহে যেমন দেখিবার শুনিবার বুঝিবার পক্ষে অপেক্ষা করা যায়, মেয়ের বিবাহে তেমন দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার শক্তি কোথায়? চারিদিকে যেরূপ তাণ্ডব-তাড়না তাহাতে মেয়েটিকে কোনওরূপে পাত্রস্থ করিতে পারিলেই বাঁচি। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষের এই অসহায় অবস্থার কথা ভালরূপেই জানেন এবং সেই অবস্থার সুযোগে তাঁহাদের দাবী-দাওয়া আরও পীড়াদায়ক করিয়া তোলেন। অধিকাংশ স্থলেই কন্যার মাতাপিতা এই পীড়ন নীরবে সহ্য করিয়া সাশ্রুনেত্রে আপনাদের হৃদয়ানন্দকে পরের হাতে তুলিয়া দেন এবং আপাততঃ দায়মুক্ত হন।

গ্রামদর্শনী ও চুলাখোদানি

বর্তমানে বিবাহ-ভোজ যত সহজে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, পূর্বে তত হইত না; প্রায়ই গণ্ডগোল বাধিত। এক সময়ে কৌলিন্য-গৌরব অত্যন্ত প্রবল ছিল; কুলীনেরা পারতপক্ষে অকুলীনে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চাহিতেন না, পক্ষান্তরে মৌলিকেরা সর্বদাই কুলীনে বিবাহ দিতে বা করাইতে চেষ্টা করিতেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে এবং অন্য নানাভাবে বেগ পাইতে হইত। বর কুলীন এবং কন্যা মৌলিক হইলে কুলীনেরা 'বাঙ্গাল' গ্রামে প্রবেশ করিবার জন্য 'গ্রামদর্শনী' নামে একটা মোটা টাকা পাইতেন। মৌলিকের

পক্কান্ন তাঁহারা খাইতেন না, তাহাদের নিকট হইতে 'সিধা' পাইতেন এবং নিজেদের লোকদ্বারা আখা তৈয়ার ও রান্নাবান্না করাইয়া খাইতেন। এই আখা তৈয়ারির জন্যও তাঁহাদিগকে 'চুলাখোদানিঃ নামে একটা 'বিদায়' দেওয়া হইত। অনেক গোঁড়া কুলীন নিজেদের চাকর দ্বারা থালা, বাটি, গ্লাস, পিঁড়ি পাঠাইয়া দিতেন, তাহারাই জায়গা করিত, গৃহকর্তা শুধু লবণ, লেবু ও জল পরিবেশন করিতেন। বিবাহ-ভোজে মৌলিক ও কুলীনেরা পৃথক পৃথক বসিতেন। বিবাহের পর অভ্যাগত কুলীনেরা প্রত্যেকে মৌলিক কন্যাপক্ষ হইতে ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, এইরূপ কি ততোধিক পরিমাণ টাকা 'বিদায়' পাইতেন, তাঁহাদের সঙ্গীয় ব্রাহ্মণ, গোমস্তা, ধোপা, নাপিত—তাহারাও অল্পবিস্তর পাইত।

মনসা ও চেঙ্গমুড়ি

বাংলাদেশের মহামান্যা দেবী মনসার '**মনসা**' নামটির উৎপত্তি নির্ণয়ে এপর্যন্ত বহু গবেষণা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ ভারত হইতেই কোনও সূত্রে বাংলায় মনসাপূজার প্রবর্তন হইয়াছে এবং সেখানকার সর্পদেবী 'মনে মাঞ্চী' বা 'মঞ্চাম্মা'ই এখানে আসিয়া মনসা বা মনসামাতা নামে পরিচিতা হইয়াছেন। আবার কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণের মতে, নাগপিতা কশ্যপ আপনার মন হইতে এই দেবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেজন্যই ইহার নাম মনসা (মনস্ + ষ্ণ, আপ)। আবার বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে (ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত) 'মনসাকুমারী'কে ত্রিপুরারির মানসকন্যা বলা হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে মনস এবং মনসা নাম বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় আর্য-সাহিত্যে থাকায় বাংলার সর্পদেবতার মনসা নামটি সেই উৎস হইতেও আসিতে পারে।

বাংলা শব্দভাণ্ডারে 'মনসা' একটি বহু প্রচলিত দেশী শব্দ। সংস্কৃতে যে বৃক্ষটিকে স্নুহী বলা হয়, বাংলার সর্বত্র তাহা সিজ বা মনসাগাছ নামে পরিচিত। সিজের চেয়ে মনসা নামেরই ব্যাপ্তি বেশী। মনসার আবার শ্রেণীভেদও আছে: সিজ মনসা ; ফণী মনসা। তবে মনসাগাছ বলিতে সাধারণতঃ সিজ মনসাকেই বুঝায়। গ্রামে এমন হিন্দুবাড়ী (বিশেষ করিয়া অন্ত্যজদের) খুব কমই দেখা যায়, যে বাড়ীতে মনসাগাছ নাই বা বৎসরে একবারও মনসাতলায় পোচ পড়ে না। সাধারণের বিশ্বাস, মনসাগাছে মনসাদেবী বাস করেন, এজন্য এই গাছকে কেহ অমান্য করিতে সাহসী হয় না। তাহাদের কাছে মনসার মূর্তির চেয়ে, মনসাগাছের মূল্য কম নয়। অনেক গ্রামেই নির্দিষ্ট 'মনসাতলা' আছে এবং সেখানে

মনসাদেবীর পূজা হয়। দেখা যায়, ঘটে পটে মূর্তিতে সর্পফণাতে কি মাটির ঢিবিতে পূজা হইলেও সে পূজায় মনসাগাছের ডাল কিংবা পাতা অবশ্যই দিতে হয়, নতুবা পূজার অঙ্গহানি ঘটে। এই সকল হইতে অনুমান করা যায়, আদিতে সাধারণ লোক মনসাগাছেই (হয়ত উহার নানা গুণে আকৃষ্ট হইয়া) সর্পদেবতার পূজা করিত, এবং কালক্রমে সেই গাছের নাম হইতেই তদধিষ্ঠিত দেবতার নাম মনসা হইয়াছে।

বাংলাভাষায় অনেক দ্রাবিড়ী উপাদান আছে। আমাদের অনেক শব্দের বিশ্লেষণে সে উপাদান ধরা পড়ে। যেমন, ছেলেপিলে (তা পিল্লৈ, তে পিল্লা কা পিল্লে), বিলাই (তা বুলই), বান (তা বানা), ভিটা (তা বিটি), মোট (তা মূটৈ), উলুখড় (তা উলবৈ), ইচা / ইচলা (তা ইরবু)। এই হিসাবে মনসা নামটির উপর 'মঞ্চাম্মা'র ছায়া পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু আমরা জানি, দাক্ষিণাত্যে 'মঞ্চাম্মা'র পূজা বহুপ্রচলিত নহে এবং কয়েকটি নিম্ন বর্ণের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। কিন্তু মনসাপূজা বাংলার জাতীয় উৎসব, সকল বর্ণের লোকই ইহা করিয়া থাকে, এবং মনসাগাছ বাংলার সর্বত্রই সুপরিচিত। এমতাবস্থায় স্বল্পখ্যাত 'মঞ্চাম্মা' বাংলায় আসিয়া মনসা নামে সর্বত্র জুড়িয়া বসিয়াছেন,—এই অনুমানের চেয়ে বাংলার বহুপ্রচলিত মনসাপূজাই কোনও কালে মনসাপূজক কোনও বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক মানবগোষ্ঠী দ্বারা দক্ষিণ ভারতে নীত হইয়া 'মঞ্চাম্মা' পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে—এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পাঞ্জাবে এবং হরিদ্বারেও মনসাদেবীর মন্দির আছে ; সেই মনসা নামের উপরও বাংলার মনসার প্রভাব যে নাই, তাহা কে বলিবে ?

আবার দুইটি নাম এক হইলেই যে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক থাকিবে, তাহাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। কাহারো সহিত কাহারো সম্পর্ক নাই এইরূপ বহু ব্যক্তির বহু বস্তুর একই নাম থাকিতে পারে। বর্তমান গ্রন্থে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

মনসার **'চেঙ্গমুড়ি কানি'** বা **'চেঙ্গমুড়ী কানী'** নামটি লইয়াও অনেক গবেষণা হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে, স্নুহীবৃক্ষকে (মনসাগাছ) তেলেগু ভাষায় 'চেংমুড্ডু' বা 'জেমুড্ডু' বলা হয় এবং মনসার চেঙ্গমুড়ি (-মুড়ী) বা চেংমুড়ি নাম এই চেংমুড্ডু শব্দ হইতেই আসিয়াছে।

আমাদের 'চেঙ্গমুড়ি' বা 'চেঙ্গমুড়ি কানি'র উৎস সন্ধানে দক্ষিণ ভারতে যাইবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। চেঙ্গ (চেং, চ্যাং) একটি "দেশী

লৌকিক শব্দ। ইহা বিভিন্নার্থক শব্দ হইলেও এক অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর মাছ অর্থেই সাধারণ্যে বহুপ্রচলিত। পচা ডোবা, নালা, নর্দামায়ই ইহারা বেশী থাকে। বিষধর কোনো কোনো সাপের মাথার সহিত ইহাদের মাথার কতকটা সাদৃশ্য আছে (১৮০ পৃ)। বাঙ্গালী মাছখেকো হইলেও পারতপক্ষে এই মাছ খায় না, উচ্চকোটি সমাজে ত একেবারে তাবু (taboo)। বাংলায় মুণ্ড বা মাথা অর্থে মুড়া, মুড়ি শব্দও বহুপ্রচলিত (মাছের মুড়া, মুড়িঘণ্ট)। যাহার এক চক্ষু নাই, পুরুষ হইলে তাহাকে কানা এবং স্ত্রীলোক হইলে কানি বা কানী বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শব্দটি গালি অর্থেই বেশী প্রযুক্ত হয়। কেবল এক চক্ষু না থাকিলেই যে কেহ কানা বা কানী হয়, তাহা নহে, যে ব্যক্তি পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, তাহাকেও সাধারণতঃ কানা (পুরুষকে) বা কানী (স্ত্রীলোককে) বলিয়া গালি দেওয়া হয়। চণ্ডী মনসার এক চক্ষু কানা করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে ; কিন্তু আমাদের শিষ্টাচারে কানাকেও কানা বা কানী বলা গালিরই সমতুল্য। তাহা হইলে চেঙ্গমুড়ি কানির (চেঙ্গমুড়ী কানী) এক অর্থ (আক্ষরিক) দাঁড়ায়, 'যে একচক্ষু স্ত্রীলোকের মাথা চেঙ্গমাছের মাথার মত।' আর এক অর্থ দাঁড়ায় নিছক গালি। আমাদের মতে, ইহা মনসার কোনও নাম নহে, তাঁহার প্রতি সর্বস্বান্ত চাঁদসদাগরের তীব্র কটূক্তিমাত্র। 'চেঙ্গমুড়ী কানী' কথাটি যে গালি-বাচক তদ্বিষয়ে ডঃ প্রদ্যোৎকুমার মাইতি তাঁহার Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa গ্রন্থেও আলোচনা করিয়াছেন।

রোগ চালনা

গ্রামে যখন কলেরা বা বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দেয়, তখন কোথাও কোথাও ফকির ওঝাদের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। তাহারা নানা প্রক্রিয়া দ্বারা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে রোগ চালনা করিয়া দিতে পারে, এইরূপ বিশ্বাস অনেকেরই আছে। কিন্তু ইহার মূলে ফকির-ওঝাদের যে কাণ্ডকারখানা অনেক সময় ধরা পড়ে, তাহার তুলনা নাই। উহারা 'রোগচালনা'র নাম করিয়া গ্রাম-বাসীদের নিকট হইতে টাকা বা ধান-চাল গ্রহণ করে, এবং রাত্রির অন্ধকারে সকলের অগোচরে রোগীর কাপড়-চোপড় অন্য গ্রামের পুকুরে বা হাটে-বাজারে ফেলিয়া দিয়া আসে, এবং তাহা হইতেই সেই গ্রামে অনায়াসে রোগ ছড়াইয়া পড়ে, আর ফকির-ওঝার কেরামত বাড়ে।

শিথ্‌লে দেওয়া, শীতলিয়া রাখা

কোনও কারণে সধবাদের শাঁখা বা নোয়া (লোহা) সাময়িকভাবে খুলিয়া রাখিতে হইলে তাঁহারা 'খুলা' শব্দ উচ্চারণ না করিয়া 'শীতল করা' বা 'ঠাণ্ডা করা' কথা ব্যবহার করেন। শিবায়নে ইহার একটি প্রয়োগ-উদাহরণও আছে: 'কঙ্কণাদি আভরণ শীতলিয়া রাখে'। মদীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, খুলিয়া রাখার সঙ্গে শীতলিয়া রাখার বা ঠাণ্ডা করিয়া রাখার কোনও সম্পর্ক নাই; মূল শব্দটি হইতেছে 'শিথিল' এবং উচ্চকোটি সমাজে 'শিথ্‌লে দেওয়া' বা 'শিথ্‌লে রাখা' কথাটিই বহু প্রচলিত। কিন্তু ঐ কথাগুলি যথাসময় আমার গোচরে না আসায় শব্দাংশে যথাস্থানে উল্লেখ করিতে পারি নাই।

প্রকৃত শব্দ উচ্চারণ না করিয়া অন্য শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু বুঝানোর মধ্যে আছে মানুষের অন্ধসংস্কার। এই সংস্কার বশেই অলক্ষ্মীর দৃষ্টিকে বলা হয়, 'মাসীমার দৃষ্টি', বসন্ত রোগের আক্রমণকে 'মায়ের দয়া' (২২৯ পৃঃ)।

মানুষের মন বড় দুর্বল। যাত্রাকালে আমরা বলি—'আসি'; প্রিয়জনকে বিদায় সংবর্ধনা জানাই, বলি—'এসো'। দূরদেশে কেন, সামান্য কাজে সামান্য দূরে গেলেও 'যাই', 'যাও' কথায় আমাদের বুকটা যেন ছাঁৎ করিয়া উঠে। তাই কথাগুলি ঘুরাইয়া বলি, আসি, এসো। শাঁখা খুলিয়া রাখার ক্ষেত্রেও তাই 'শিথ্‌লে রাখা', 'শীতলিয়া রাখা' কথার ব্যবহার।

* * *

ভূমিকা আর দীর্ঘ করিব না। গ্রন্থের শব্দাংশেই অনেক ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে। এখানে তাহারই জের টানিয়া কোনো কোনো বিষয়ে আরও কিছু কিছু বলিতে এবং আপনার মন্তব্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভুল-ত্রুটি অসঙ্গতি অসামঞ্জস্য অনেক কিছু ঘটিয়াছে, অপূর্ণতা ত রহিয়াই গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই ভাবিয়া পরম স্বস্তি অনুভব করিতেছি যে, সাধ্যমত কর্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই।

রথযাত্রা, ১৩৭৫
[illegible]শে জুন, ১৯৬৮
৫/১, হরিদেবপুর রোড,
কলিকাতা-৪১

শ্রীকামিনীকুমার রায়

সঙ্কেত

অঞ্চল বা জেলা সঙ্কেত (শব্দের পরে বসানো হইয়াছে)

আসা আসাম (উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন অঞ্চল)
উব উত্তরবঙ্গের বহু অঞ্চল
ক কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল (বৃহত্তর কলিকাতা)
কা কামরূপের পশ্চিমাংশ
কো কোচবিহার
খু খুলনা
গো গোয়ালপাড়ার পশ্চিমাংশ
চ চব্বিশপরগনা
চট্ট চট্টগ্রাম
জ জলপাইগুড়ি
টা টাঙ্গাইল
ঢা ঢাকা
ত তরাই অঞ্চল (শিলিগুড়ি)
ত্রি ত্রিপুরা (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগড়তলা)
দচ দক্ষিণ চব্বিশপরগনা (বেহালা, বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিংপ্রভৃতি অঞ্চল)
দি দিনাজপুর (বিভাগপূর্ব দিনাজপুর)
ন নদীয়া (বিভাগপূর্ব)
নো নোয়াখালি
পব বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চল
পা পাবনা
পু পুরুলিয়া
পূব বিভাগপূর্ব ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চল
ফ ফরিদপুর
ব বরিশাল
বগু বগুড়া
বর্ধ বর্ধমান

বাঁ বাঁকুড়া
বী বীরভূম
ম ময়মনসিংহ
মা মালদহ
মু মুর্শিদাবাদ
মে মেদিনীপুর
য যশোহর
রং রংপুর
রা রাজসাহী
রাঢ় রাঢ়ের বহু অঞ্চল (দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গ)
শ্রী শ্রীহট্ট (সিলেট)
হা হাওড়া
হিজ হিজলী (মেদিনীপুর)
হু হুগলী

ভাষা-সঙ্কেত (শব্দের পূর্বে বসানো হইয়াছে)

অস আস আসামী
আ আরবী
ইং ইংরেজী
ও ওড়িয়া
কা কানাড়ী
তু তুর্কী
তা তামিল
তে তেলেগু
পো পোর্তুগীস
ফা ফারসী
সং সংস্কৃত
সাঁ সাঁওতালী
হি হিন্দী

গ্রন্থকার ও গ্রন্থাদির সঙ্কেত (উদ্ধৃতির পর বসানো হইয়াছে)

কবিক	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)
কেক্ষেমা	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল)
চৈমঙ্গ	চৈতন্যমঙ্গল (জয়ানন্দ)
পূগী	পূর্ববঙ্গ গীতিকা
বংশীদা	দ্বিজ বংশীদাস (মনসামঙ্গল)
বিগুপ্ত	বিজয়গুপ্ত (মনসামঙ্গল)
বিদাস	বিপ্রদাস (মনসাবিজয়)
মা রা গা	মানিকচন্দ্র রাজার গান
মৈগী	মৈমনসিংহগীতিকা
য ম বাগচী	কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী
র	রবীন্দ্রনাথ
রায়ম	রায়মঙ্গল (কবি কৃষ্ণরাম দাস)
রারচ	রামেশ্বর রচনাবলী (রামেশ্বর ভট্টাচার্য)
শ্রীকৃ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
স.প.প.	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

বিবিধ সঙ্কেত

দ্র	দ্রষ্টব্য
প্র	প্রবাদ। প্রয়োগ-উদাহরণ
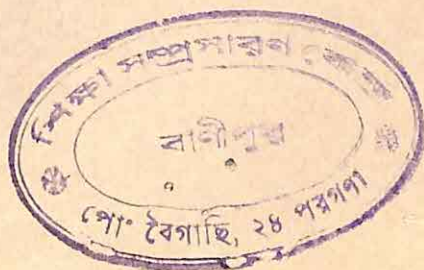
"মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। * * * বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়-সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না।"

—রবীন্দ্রনাথ

প্রথম অধ্যায়

ঘরবাড়ী

অশৌচঘর / অশুজঘর-পূব—সূতিকাগৃহ। শিশুর জন্মের পর ষেটেরা পর্যন্ত কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোক এই গৃহটিকে অশুচি মনে করে এবং ইহার সংস্পর্শে স্নান না করিয়া অন্য কিছু ছোঁয় না। তৎপর্যায় :—আঁতুড়-ক, আঁতড়ি-শ্রী, আঁচঘর-রা, আধোয়াঘর / আধুয়াঘর-ম। সাধারণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে আঙ্গিনার এক কোণে (প্রায়ই সেই স্থানটি সেঁৎসেঁতে থাকে) একটি কুঁড়ে বাঁধা হয়। বাংলার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসূতির জন্য কোনও পৃথক ঘর থাকে না ; শয়ন-গৃহেরই এক কোণে কিংবা বারান্দার এক পার্শ্বে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। অশুজ, অশুচ, অশোজ, অশোচ—অশৌচের উচ্চারণ-বিকৃতি।

আওতা-ক—বৃক্ষাদির ছায়া ; ছায়ায় ঢাকা স্থান।

আগচালা-পা, **আগচালি**-রা—বারান্দা (সাধারণতঃ সামনের দিকের)। উত্তরবঙ্গের অপর বহু অঞ্চলে (কো. জ. রং. দি.) বারান্দা অর্থে চালি এবং ধাপ শব্দ ব্যবহৃত হয় (বারান্দা দ্র)।

আগড়-পব. হু. বর্ধ—সবজিবাগান, পাঁচিল ইত্যাদির বাঁশের দরজা. ঝাঁপ, আঁগুড়-বাঁ। **আগদার**-পা—গোশালা (গোহাল দ্র)।

আগদুয়ার—বহির্বাটী, বাহির মহল। **আগনা**. **আগিনা** (আঙ্গিনা দ্র)।

আগল [সং অর্গল, হি অর্গলা]—হুড়কা, খিল, **আগুল**-চট্ট (হুড়কা দ্র)।

আঙ্গিনা [সং অঙ্গন, ইং **courtyard**]—বাড়ীর চৌহদ্দিভুক্ত উন্মুক্ত স্থান। আগনা / আগনে-বর্ধ. হু. বী. মে, এগন্যা-বাঁ, আঙন্যা-মু, আগিনা / এঘিনা-জ. কো—আঙ্গিনার উচ্চারণভেদ। তৎপর্যায় :—উঠান, উঠন, চাচর / চাতোর-জ. কো, বাকুল-রাঢ়. দচ। বাহিরআঙ্গিনা—বাইরবাড়ী, বাইরাগ / বাইড্ডাগ-ম, আগদুয়ার-পা, খুলি-বগু. রং. কো. জ, খোলাত / বাহিরআগিনা-জ. কো।

আঁচঘর-রা—সূতিকাগারে বহু সমাজেই সর্বদা আগুনের আঁচ রাখিতে দেখা যায় ; হয়ত এজন্যই ইহাকে আঁচঘর বলা হয় (অশৌচঘর দ্র)।

আটচালা—আট চাল বিশিষ্ট ঘর। মূল ঘরের চার চাল এবং চারদিকের

বারান্দার চার চাল, এই আটচাল। আর্চালা-ম—আটচালার উচ্চারণভেদ। শুধু আট চালের ঘরকেই নহে, চৌচালা, পাঁচচালা, নচালা যে-কোনো বড় ঘরকেও প্রায়ই আর্চালা বলিতে শুনা যায়। আটচালা—বারোয়ারি অনুষ্ঠানের প্যাণ্ডাল। নাটমন্দির।

আটন / আঠন-ম. ত্রি. ফ—বাঁশের গোল বাখারি যাহা প্রধানতঃ খড়ের চাল ছাওয়ার কাজে লাগে। এইরূপ বাখারির সাহায্যে চালের বাঁধন খুব আঁট হয়। তৎপর্যায়ঃ—আটনি-ঢা, আটনকাঠি / ছানিকাঠি-ম, বেতর-কো :

আটন-বাঁ. বী—পূজার বেদী ; দেবতার পূজার স্থান।

আড়া-চ. ন. বর্ধ. ফ. ব.—ঘরের লম্বালম্বি দুই দেওয়াল বা দুই পাড়ের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া আড়াআড়িভাবে যে-সকল শক্ত মোটা কাঠ বা বাঁশ দেওয়া হয়। (পাকাঘরের ছাদের নীচের এইরূপ কাঠ বা লোহাকে বলা হয়—কড়ি, joist)। তৎপর্যায়ঃ—আড়, আড়কাঠ, আড়বাঁশ, রলা-বাঁ, লরা-ঢা, সাঙ্গা, ধরনা-মে. উব, ধন্না-ম। আড়া—জমি বা ফসলের মাপ বিশেষ।

আঁতুড়—আঁতুড়ঘর, সূতিকাগৃহ।

আদাড়-ক—আবর্জনা ফেলিবার স্থান (আঁস্তাকুড় দ্র)। আদাড়ে কচু—যে কচু বিনাযত্নে আবর্জনার স্তূপে আপনিই উৎপন্ন হয়।

আধঘরা-ত্রি—ত্রিপুরার কোথাও কোথাও শয়ন-গৃহের অর্ধাংশ আবরু বেড়া দিয়া বৈঠকখানারূপে ব্যবহার করা হয়। ইহা হইতেই হয়ত বৈঠকখানার সাধারণ নাম হইয়াছে আধঘরা।

আধোয়াঘর / আধুয়াঘর-ম—সূতিকাগৃহে প্রসূতি যতদিন অবস্থান করে, ততদিন ঐ গৃহ সাধারণতঃ ধোয়া মোছা হয় না। তাই সূতিকাগৃহের এক নাম আধোয়াঘর (অশৌচঘর দ্র)।

আনধারি-উব—ছাউনির কাজ যাহাতে খুব পরিপাটি হয়, খড়পাতা ইত্যাদি যাহাতে মেজের উপর না পড়ে, তদুদ্দেশ্যে খড়ো চালের ফ্রেমের উপর দরমার একটা আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ইহারই নাম—আনধারি, আনধরা-ম. ঢা, আইনধারা-রা, আঁধারি-চ।

আনধন ঘর-জ. কো. রং. দি (রান্ধন ঘর)—রান্নাঘর।

আন্ধাপুকুর, আন্ধ্যাপুখুর-ম—ঝাড়ে জঙ্গলে ঘেরা, দলে পানায় ভরতি বাড়ীর পিছনের দিকের পুকুর, যাহার উপর সূর্যের কিরণ বড় পড়ে না। ('গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যাপুখুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা। চাইর দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া।'—মৈগী)।

আঁস্তাকুড়-ক—এঁটো-কাঁটা, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলিবার স্থান। সাধারণতঃ এই স্থান বাড়ীর পিছনের দিকে থাকে। তৎপর্যায়ঃ—সারগাদা-বর্ধ. মে, সারকুড়-মু, আদাড় / পাঁদাড় / ক্যাঁদাল-পব.হু.বর্ধ.বাঁ, পিছেড়-বী, ছিটাল-ঢা.ফ, উশিট্টাল / উছিষ্টাল (উচ্ছিষ্ট+টাল)-ম, আষ্টল-মা, আষ্টাল-রা, আইষ্টাল-রং, আইড্যাল-ম, আইওাল-পা, আইচ্ছাল-ত্রি, আইঠাশাল-ব, ঢল-জ, আঁচাইল-ম (প্রধানতঃ যেখানে আঁচান হয়)। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহুস্থানে 'টাল' বলিতে বুঝায়—শস্য, আবর্জনা ইত্যাদি যে-কোনও বস্তুর স্তূপ (heap)। যেমন, মাটির টাল, ধানের টাল, আবর্জনার টাল, উচ্ছিষ্টের টাল।

উগর, উগার-ম.—দুই তিন ফুট উঁচু মাচা বিশেষ। সাধারণতঃ ইহা প্রধান গৃহের (যে-গৃহে বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণী থাকেন) একাংশে তৈয়ার করা হয়। ইহাতে সংসারের নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র—চালের আতলা, চিড়ামুড়ির টিন, গুড়ের নাগরি, কলাই সরিষার মট্‌কি. ধানের ডুলি, ডালাকুলা, হাঁড়িকুড়ি স্থান পায়। প্রায়ই দরমার একটি বেড়া দিয়া ঘরের অপর অংশ হইতে ইহার আবরু রক্ষা করা হয়। অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থের ইহাই ভাঁড়ার। গৃহিণীরা সর্বদা ইহার আধিপত্য নিজের হাতে রাখেন। উগৈর-ফ.ত্রি.ব, উইর-চট্ট।

উছিষ্টাল / উশিট্টাল-ম.—উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলিবার স্থান (আঁস্তাকুড় দ্র)।

উঞ্ঝা-বাঁ. বী—গোবরাট (চৌকাঠ দ্র)। **উঠান / উঠন**—আঙ্গিনা।

উব্বি-ব—কপাট ইত্যাদির ফ্রেমের দুই পার্শ্বের খাড়া কাঠ, বাজু-ক।

উয়ারি-ম.ঢা—বাড়ীর বহির্ভাগ ('তেঁতুল চালিতা রোয়ে ভরিয়া উয়ারি' —বংশীদা)।

উলটি, উলতি-ম—ছঞ্চা, ছাঁচ, eaves, ওলথিয়া-জ. কো. রং (ছঞ্চা দ্র)।

উসারা—বারান্দা দ্র। **ঐশান, ঐশানগাড়া**—(ভিত দ্র)।

ওটা / ওডা-ফ. ব—ঘরে উঠিবার মাটির সিঁড়ি বা ধাপ। তৎপর্যায়ঃ—পইঠা / পৈঠা, পাঁহুটি-মু, পাউটি-বী। **ওটাচালা**—ওটাসংলগ্ন বারান্দা, যাহার উপরে শুধু চাল, পার্শ্বে কোনও বেড়া নাই; পরচালা বিশেষ।

ওরসা / ওস্‌সা-ফ. ব—রান্নার বারান্দা, যে-বারান্দায় রান্না হয়।

কচা—গাছের সরু ডাল, twigs (কচার বেড়া)।

কঞ্চি, কইঞ্চা-পূব—বাঁশের সরু ডাল। তৎপর্যায়ঃ—আটকি, টনি-ফ. ব, জিংলা / জিংগৈল-ম। বাংলার বহু অঞ্চলেই ঘরের বেড়ার কাজে কঞ্চির ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। এই সকল বেড়ার উভয় দিক রাঙ্গামাটি দিয়া অতিসুন্দর করিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালদের ঘরের দেওয়ালে

নানাবিধ জীবজন্তু ও লতাপাতার আলপনা শোভা পায়। মাটির লেপদেওয়া কঞ্চির বেড়াকে পশ্চিমবঙ্গ ও রাঢ় অঞ্চলে 'ছিটে বেড়া' বলে। কঞ্চি দিয়া ঝুড়ি চুপড়ি ইত্যাদি জিনিষপত্রও তৈয়ার করা হয়।

কপাট, কবাট—কাঠের দরজা; দরজার পাল্লা। তৎপর্যায়ঃ—কেওড়-মু, কোয়ার-উব, কেওয়ার-ম. ত্রি, দরজা-জ. কো. রং।

কপালী-ক—দরজা বা জানালার ফ্রেমের মাথার কাঠ (চৌকাঠ দ্র)।

কপালী-ম—বিবাহের সময় কন্যার মাথায় সোলা ও জরির তৈয়ারী যে-মুকুট পরানো হয়। **কাইম**-ফ. ত্রি—বাথারি বিশেষ।

কাচারিঘর-ম—বৈঠকখানা, দরবার-গৃহ (কাচারির এক অর্থ দরবার)।

কাচারি / কাছারি—আপিস, আদালত। জমিদারি সেরেস্তা।

কাচি-চ—চালের রুয়া যাহার সঙ্গে বাথারি বাঁধা হয়। কাইচ—কাচির আঞ্চলিক প্রতিরূপ।

কানটা, কানাচ—চালের যে-অংশ বেড়ার বা দেওয়ালের বাহিরের দিকে থাকে।

কান্তা-ম—ঘরের খুঁটি বা থাম্বার খাঁজকাটা মাথা, মাথাল-চ. মু।

গাব্বোকাটা-চ—খাঁজ কাটা।

কাবারি-ফ. ব—সুপারি গাছের ফালি; বাথারি। **কামটুঙ্গি**—(জলটুঙ্গি দ্র)।

কামড়া-মে—চালের বরগা। **কামরা** [পো. camara]—কোঠা (দুই কামরার ঘর)।

কামলা—পূর্ববঙ্গে কামলা বলিতে ঘরামি এবং অপর নানা শ্রেণীর শ্রমিক ও শিল্পীকে বুঝায়ঃ—ঘরামি ('কামলার কাম বিনোদ তাও ভালা জানে। ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী সুত্যা নদীর কানে॥'—মৈগী); মাটিকাটা মজদুর ('কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কুনি কাটায়।'—মৈগী); রাজমিস্ত্রী (রাজকামলা); ক্ষেতমজুর (ধানকাটার কামলা); দিনমজুর (আজকাল কামলার রোজ চার টাকা); গৃহকর্মে নিপুণা বধূ (রামবাবুর পুত্রবধূ ভারী কামলা)। কামিলা-রাঢ়—কারুশিল্পী ('কেমন করিয়া কৈল কামিলার বেটা। শঙ্খের উপর এত নির্মাণের ঘটা॥'—রারচ); বিশ্বকর্মা ('কামিল্যা বিদায় হয়ে গেল নিজপুরী।'—কেক্ষেমা)। কামলা—রোগবিশেষ, jaundice.

কুড়ে, কুঁড়ে (কুড়িয়া, কুঁ-)—কুটীর, খড় পাতা দিয়া ছাওয়া অতি ছোট ঘর, hut. কুঁড়্যা-বাঁ.মে, কুঁড়্যো-বর্ধ, কুইড়্যা-ম.ঢা, কুড়া-ত্রি ('ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি পত্রের ছাওনী'—কবিক)। তৎপর্যায়ঃ—ডেগুরা / ডেরা-পুব। কুড়ে—অলস।

কুরুই-দচ—ছোট মরাই বিশেষ। **কুরো**-ম—চালের বরগা (বরগা দ্র)।

কেওড়, কেওয়ার, কোয়ার—কাঠের দরজা (কপাট দ্র)।

কেচা-ঢা—বাঁশ ফাটাইয়া থেঁতো করিয়া বেড়ার জন্য যে-আবরণ তৈয়ার করা হয়, ছেঁচা। কেচার বেড়া—ঐরূপ থেঁতলানো বাঁশের বেড়া, ছেঁচার বেড়া (ছেঁচা দ্র)। কেচা—পিষ্ট করা, থেঁতো করা, ছেঁচা। কেচা কেচা করা—কথার আঁচে সর্বদা জ্বালাযন্ত্রণা দেওয়া।

কোঠা [সং কোষ্ঠ, হি কমরা, ইং room]—কলিকাতা অঞ্চলে সাধারণতঃ পাকাঘরকে কোঠা বা কোঠাঘর এবং পাকাবাড়ীকে কোঠাবাড়ী বলা হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদ এবং রাঢ়ের কোথাও কোথাও মাটির নানাপ্রকার দোতলা ঘরকেও কোঠা বলিয়া নির্দেশ করা হয়। যেমন, মাটকোঠা-মু, মাটকঠা-বাঁ, চিলেকোঠা-মু, বাদামেকোঠা-মু, পাখাপেড়ে কোঠা-মু। এই সকল ঘরের দেওয়াল মাটির এবং ছাউনি খড় খোলা টালির, কখনো বা টিনের। চোরকোঠা, চোরকুঠুরি—সিঁড়ির তলের ঘর।

কোর-বী. বর্ধ—চালের তথা পাড়ের (চালের নীচের ভার পাড়ের উপর ন্যস্ত থাকে) বাঁক। তৎপর্যায়ঃ—রাগ, জুইত। কোর দেওয়া চাল বীরভূম অঞ্চলেই অধিক দেখা যায়। ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চলে কোর দেওয়া দোচালা ঘরকে 'জুইতের ঘর' বলা হয়।

খলপা-ঢা—দরমা, চাঁচ, টাট, চাটা। **খলা**—(খোলা দ্র)।

খাটাল-ফ. ব—ঘরের মেঝে, গৃহতল। খাটাল-পু—ঘর,-ক—গোমহিষাদির খাটাল। ঘরের দুই খাম্বার ব্যবধান, খিলান।

খানকা-রং—বৈঠকখানা। **খাপ, খাপাসি / খাবাসি**—বাখারি।

খাপ—আধার, sheath (চশমার, তরোয়ালের)। খাপ খাওয়া—মানান, মিল হওয়া (ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে বুট খাপ খায় না)।

খাম [সং স্তম্ভ]—খাম্বা, খুঁটি, পোই ('ভেরেণ্ডার খাম তার আছে মধ্য ঘরে'-কবিক)। খাম—লেফাফা।

খিড়কি [সং খিড়ক্কিকা]—বাড়ীর পিছনের দরজা, খিড়কি দরজা। জানালা। পূর্ববঙ্গে জানালা অর্থেই খিড়কি / খেরকি শব্দের প্রয়োগ বেশী শুনা যায়।

খিল [সং কীল]—হুড়কা, অর্গল, গোঁজ (হুড়কা দ্র)। খিল—অনাবাদী জমি (চাষ-আবাদ দ্র)। খিল—অঙ্গের আড়ষ্ট ভাব (কোমরে খিল ধরা)।

খুঁটি-চ. বর্ধ—বাঁশ কাঠ ইত্যাদির খাম্বা, post. তৎপর্যায়ঃ—খুঁটা / খোঁটা, খাম্বা / খাম-ক, মেক / মেকা-মে, পালা-ম. নো, পোই-জ. কো. রং. দি, থাম (প্রায়ই ইট পাথরের), ঝাকিয়া-রং (কাঠের খুঁটি), বাতি-পব (কাঠের,

বিশেষ করিয়া শালের খুটি)। খুঁটি, খুঁটা, খোঁটা—বাঁশের বা কাঠের কীলক বিশেষ।

খুলি-উব—বাহিরের আঙ্গিনা (আঙ্গিনা দ্র)। **খোয়া**—চৌকাঠ দ্র।

খোলা-ফ. ব—লৌকিক দেবতার পূজার স্থান (শীতলা খোলা)। খোলা / খলা-ম—খামার, যেখানে ধান্যাদি গোরু দ্বারা মলন দেওয়া হয় (ক্ষেতখলা)। খোলা—খই চিড়া ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

খোলাত-জ. কো. রং—বাহির আঙ্গিনা। **গজাল**—বড় পেরেক।

গাবহারা-চ—ঘরের চারদিকের খুঁটির সঙ্গে উহাদের মাঝামাঝি স্থানে চারটি বাঁশ (আড়) বাঁধিয়া দেওয়া হয়; ইহাতে খুঁটিগুলির শক্তি বাড়ে। এইরূপ বাঁশবাঁধার নাম 'গাবহারা দেওয়া।' **গোচ**-উব—হুড়কা বিশেষ।

গোচালা-ম—ইহা গোরু থাকিবার নয়,—গোরুর খাইবার খড় নাড়া রাখিবার ঘর (সাধারণতঃ নাড়া থাকে)। পূর্ব ময়মনসিংহের মাটি অত্যন্ত আর্দ্র বলিয়া ঘরের ভিতরে এক ফুট কি দেড় ফুট উঁচু করিয়া মাচা বাঁধিয়া তদুপরি নাড়ার আঁটিগুলি (গল্লা) সারা বছরের জন্য সাজাইয়া রাখা হয়। রাঢ়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে খড়ের গাদা বা পালুই-এর উপর পৃথক কোনও আচ্ছাদন থাকে না, নীচেও মাচা বাঁধিতে হয় না।

গোবরাট-ক—দরজা জানালার ফ্রেমের বা চৌকাঠের নীচের কাঠ বা স্থান।

গোলা, গোলাঘর—যে-ঘরে শস্যাদি (বিশেষ করিয়া ধান) রাখা হয়। তৎপর্যায় :—মাচা-উব. মে, মরাই-রাঢ়. পব, হামার-মে. বাঁ, বাখার-মু. বী. হিজ, কুরুই / ঠিকরি-দচ, মুরকি-জ. কো. রং।

শস্যাদি রাখিবার এইসব নানা প্রকার ঘরের সাধারণ নাম গোলা হইলেও বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে মাত্র আয়ত বা চতুরস্র আসন বিশিষ্ট এবং চালু-চালযুক্ত শস্যাগারকেই গোলা বলিয়া থাকে এবং বড় বড় জোতদারের বাড়ীতেই এই শ্রেণীর গোলা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মরাই, হামার, বাখার, ঠিকরি প্রভৃতির আসন বৃত্তাকার এবং চালের গড়নও ভিন্ন। পশ্চিমবঙ্গ এবং রাঢ় অঞ্চলে এই শ্রেণীর গোলাই বেশী দেখা যায়।

বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় **মরাই** নামীয় গোলা :—ইহাতে কোনও কাঠ বা বাঁশের খুঁটি পোঁতা হয় না, চাল বা উপরের আচ্ছাদন অনেকটা রবের টোপরের মত। খড়ের আঁটি এবং খড়ের দড়ি ইহার প্রধান উপকরণ। বৃত্তাকার একটা শক্ত মাচার উপর গদির মত করিয়া কতকগুলি খড়ের আঁটি, চাটাই, তালাই পাতিয়া দেওয়া হয়, আর কতকগুলি আঁটি বৃত্তাকারে খাড়া

রাখা হয়। একদিকে উহাতে ধান তোলা হইতে থাকে, আর একদিকে খড়ের মোটা দড়ি (যাহার স্থানীয় নাম বড়্) বাখারির মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া উহার কাঁথ তৈয়ারির কাজ চলিতে থাকে। ধান-তোলা সম্পূর্ণ হইলে আধারটির উপরিভাগ খড়ের বহু আঁটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এই ঢাকনিই মরাই-এর চাল, টোপরের মত ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া উপর দিকে উঠে ; ছাঁচা, আসন ও কাঁথ সবই বৃত্তাকার। ধান বাহির করিবার সময় খড় এবং বড় উপর হইতে আস্তে আস্তে খসাইয়া লইতে হয় এবং মরাইটির ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে ; আবার নূতন ধানের দিনে সে নবজন্ম লাভ করে।

স্থান ভেদে মরাই-এর প্রকার-ভেদ লক্ষিত হয়। চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়ার মরাই বর্ধমানের মরাই-এর ন্যায় গোলঘর হইলেও, ইহার কাঁথ খড়ের দড়ি দিয়া তৈয়ারী হয় না এবং ইহা এত অস্থায়ীও নহে। একবার নির্মিত হইলে বিনা মেরামতে বেশ কয়েক বৎসর চলিয়া যায়। এই শ্রেণীর মরাই কাঠের গুঁড়ির শক্ত মাচার উপর বাঁশের শলা বৃত্তাকারে ন্যস্ত করিয়া তাহার সহিত বাখারি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বুনিয়া তৈয়ার করা হয়। ছয় সাত ফুট উঁচু বেড়ার উপরে বরের টোপরের আকার চাল বসে। চালের চূড়ায় থাকে উপুড়-করা একটি নাদা বা গামলা। মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া অঞ্চলে মরাই-এর বেষ্টনীতে মাটির ঘন প্রলেপ দেওয়া হয়। এই শ্রেণীর মরাই-এর অপর স্থানীয় নাম **হামার**।

গোহাল, গোয়াল—গোশালা, গোরু থাকিবার ঘর। গোহালি-জ. কো. রং, গোহিল-মু, গুওল-চ. হা. য, গু'য়্যাল-বাঁ. বী, গোয়াইল-ম. ঢা, ভাওর-ফ. ব, আগদার-পা। পূর্ববঙ্গের গোয়াল প্রায়ই দোচালা ঘর এবং উহার প্রধান দরজা ও বারান্দা আড়ের দিকে থাকে। সেই দরজার কাছেই প্রতি সন্ধ্যায় সাঁজাল (তুষঘসির ধোঁয়া) দেওয়া হয়। বহু অঞ্চলে পৃথক গোশালা বড় দেখা যায় না, বহু ক্ষেত্রেই বারান্দায়, উন্মুক্ত আঙ্গিনায়, ছাঁচতলায় গোরুগুলি বাঁধা থাকে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বাছুরগুলিকে প্রায়ই একটি পৃথক ঘরে রাখা হয় এবং বাঘের ভয়ে উহাকে বেশ সুরক্ষিতই করা হয় ; এই ঘরের নাম **খপরা**।

ঘর—গৃহ, কক্ষ। বাড়ী, নিবাস (তোমার ঘর কোথায় ?)। ঘর-জ.কো— দল (গীতালের ঘর 'নিমাই সন্ন্যাস' গাহিবে)। প্রতিদিন ('মারিয়া বনের হাথি যার ঘর ভক্ষ'-রায়ম)। রেখা বেষ্টিত স্থান ('ষোল ঘরে ষোলবর্তী তার এক ঘরে আমি বর্তী'—সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)। খোপ (দাবার ঘর)।

গর্ত (সাপের ঘর)। বংশ (ঘরবর দেখা)। পরিবার (পাঁচঘর ব্রাহ্মণ)। সংসার (ঘর চালান দায়)। স্থান (স্ত্রীর ঘরে শূন্য)। ঘরকরা—স্ত্রী নিয়া কিংবা স্ত্রী হইয়া বাস করা।

ঘরামী, ঘরামি-চ. ন. বর্ধ. মে—যাহারা খড়ো বা কাঁচা ঘরদুয়ারের কাজ করে। তৎপর্যায় ঃ—ঘরামু-মু, পাইট-দি.মা. রং, বাড়ই / বাড়ুই-বর্ধ. বাঁ. বী, ছাপরবন-উব. পূব, কামলা-পূব (কামলা দ্র)।

ঘাট—নদী পুকুর ইত্যাদিতে নামিবার নির্দিষ্ট স্থান। **ঘাটলা**-ম—পাকা ঘাট (ঘাটলা বান্ধা পুকুর)।

চটা—ম. ঢা. বাঁ. বী—বাঁশ ফাটাইয়া থেঁতো করিয়া বেড়ার যে-আবরণ তৈয়ার করা হয় (চটার বেড়া)। ছেঁচা দ্র।

চটা-ফ. ব. য. খু—সাধারণ বাখারি। চটা—বাঁশ কাঠ ইত্যাদির উপরের স্তর, চাকলা (চটা ওঠা)। চটা—রাগ করা।

চটি-ম. ঢা—ছোট সরু বাখারি। তৎপর্যায় ঃ—বাতি-মু. বী, চিপে-য. কাইম-ফ. ত্রি, বেচাইর-টা। চটি-বাঁ. বর্ধ. বী—তাল পাতার আসন। পাতলা বই। সরাই। জুতা বিশেষ (বিদ্যাসাগরের চটি)।

চণ্ডীমণ্ডপ-ক—যে-মণ্ডপে বা ঘরে বিবিধ পূজানুষ্ঠান (বিশেষ করিয়া দুর্গাপূজা) হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা যে-ঘরে বসিয়া নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন বা এককালে করিতেন (মণ্ডপ দ্র)। চণ্ডীমণ্ডপ এককালে বৈঠকখানারও কাজ দিত, এখানে গ্রামের মজলিস বসিত, সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্মীয় বহু জটিল বিষয়ের এখানেই নিষ্পত্তি হইত। তৎপর্যায় ঃ—মণ্ডপ / মণ্ডব, পূজামণ্ডপ, মণ্ডোপঘর-পা, ঠাকুরদালান, মেড়, মন্দির।

চণ্ডীশাল-হিজ—রান্নাঘর। এককালে নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহের পাত্রী-নির্বাচনে ভাল রান্না করিতে জানা পাত্রীর অন্যতম প্রধান গুণরূপে বিবেচিত হইত। মুকুন্দরাম পাত্রপক্ষের কাছে ফুল্লরার গুণের পরিচয় দিতে লিখিয়াছেন, 'রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে। যতবন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে ॥' অনেক বৃদ্ধার মুখে শুনা যায়, চণ্ডী নাকি রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার সুদৃষ্টির উপরই রন্ধনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। তাই আজিও সেকালের গৃহিণীরা রন্ধনকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে চণ্ডীর উদ্দেশে ভক্তি-কামনা নিবেদন করেন।

চাটি-জ.কো—চাঁচ, দরমা ইত্যাদির বেড়া। তৎপর্যায় ঃ—টাটি, টাট, আগড়। চাঁটি—চড় (চাঁটি মারা)। টোকা (তবলায় চাঁটি)।

চাতাল [সং চত্বাল]—পাকাঘরের অনাবৃত বারান্দা, রোয়াক। উঠান, পাঁকা উঠান (ধানকলের চাতাল)। উত্তরবঙ্গে (জ. কো) এক একজন জোতদার এবং তাহার আধিয়ারদের একত্র বিন্যস্ত বাড়ীঘরকে চাতাল (যাহার অপর স্থানীয় নাম—চাতর, টারি) বলা হয়। সেদিকে এইরূপ কয়েকটি চাতাল মিলিয়া এক একটি গ্রামের পত্তন হইয়াছে।

চান্দরা-ঢা—দোচালা ঘরের আড়ের দিকের চৌকাঠের (কপালীর) উপরকার ত্রিকোণাকার ঝাঁপ বা বেড়া। এই ঝাঁপ দেখিতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মত। তৎপর্যায় :—চাঁদারি-চ, চান্দার-ফ. ব, চান্দসা-টা, চানকা-রং, চানরা / চানদারি / চানদোয়ারি-জ. কো, ঝাঁপ, ভেলকি-পূব, মুরলি-দচ। যে-কোনও ঘরের চৌকাঠের (কপালীর) উপরকার লম্বালম্বি অপ্রশস্ত আবরণকেও পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ঝাঁপ / ঝাপ, ভেলকি বলতে শুনা যায়।

চাল—গৃহাদির উপরের আচ্ছাদন। খড়ো বা কাঁচাঘর সম্পর্কেই ‘চাল’ কথাটি ব্যবহৃত হয় (খড়ের চাল, টালির চাল. টিনের চাল)। পাকাঘরের আচ্ছাদনকে ‘ছাদ’ (roof) বলা হয় (চালি দ্র)।

চালা, চালাঘর—সামান্য ঢালু এক চাল বিশিষ্ট ঘর। তৎপর্যায় :—একচালা-চ, চায়লা-ম, ছাপরা-ব. ত্রি। চালা নানা প্রকারের :—আটচালা, চৌচালা, দোচালা, পাঁচচালা, নচালা।

চালি-জ. কো. রং—বারান্দা ; খড়ো চাল। চালি-ম—একচাল বিশিষ্ট ঘর।

চালি, চাল—প্রতিমার চাল বা পিছনের পট।

চেগার-পূব. উব—বাড়ীর চারিদিকের আবরু বেড়া (চেগার-ঘেরা বাড়ী), চেকওয়ার-রং। ইট পাথরের এইরূপ পাকা বেষ্টনীকে বলা হয়—প্রাচীর, দেওয়াল, সারদেওয়াল-পূব। দেওয়াল কাঁচা মাটিরও হইতে পারে। বলিতে কি, বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ ঘরবাড়ীরই দেওয়াল মাটির।

চেঁচাড়ি, চেয়াড়ি—বাঁশের পাতলা কাঠি বা পাত (যাহাকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বাঁশের বেত / বেতি বলা হয়) যাহা দিয়া ঝাঁপ, দরমা, বিবিধ আস্তরণ, ডালা, কুলা ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়।

চৌকাঠ—দরজা জানালা ইত্যাদির ফ্রেমের চারিখণ্ড চৌপল কাঠ। ফ্রেমের উপর দিকের কাঠটিকে বলা হয়—কপালী, নীচেরটিকে—গোবরাট / উঞ্জঠা / ডেওয়া, দুই পার্শ্বের দুইটিকে—বাজু / উবি (কপাট দ্র)। ঝনকাঠ—কপাটের মাথার শক্ত মোটা কাঠ (কপালী) যাহা দেওয়ালের ভার সহ্য করিতে পারে।

চৌচালা—চার চাল বিশিষ্ট ঘর। চৌকারি-ম, চৌয়ারি-জ. কো. রং. নো. ব. ফ, নিমের চালা-ব। বড় চৌচালা ঘরকে আর্চালা বলিতেও শুনা যায়।
ছঞ্চা, ছাঁচ [হি মোরী, ইং eaves]—চালের নিম্নাংশ যাহা ঘরের বেড়া বা দেওয়ালের বাহিরের দিকে থাকে। তৎপর্যায়ঃ—ছাঁচা-বাঁ. বী. হা, ছাঞ্চা-রং, ছাইঞ্চা-রা, ওলথিয়া/ছাঞ্চা-জ. কো, ছাইচ-ফ. ব, ছেইচা, ছেঁইচাল, কানাচ, কানটা-মু, উলটি-ম।

ছাঁচতলা, ছেঁচতলা, উলটিতলা, খুকসি, কাইনছাখুলি, কাইনঠাখুলি—ছঞ্চার জল যেখানে গড়াইয়া পড়ে। উত্তরবঙ্গের কোথাও কোথাও গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে 'কনেকে' ছেঁচতলায় বসাইয়া নাওয়ান হয়।
ছনদার-জ. কো—বহির্বাটী। **ছিটকন**-জ. কো—চালের ফ্রেম বা কাঠামো।
ছিটকিনি-(হুড়কা দ্র)। **ছিটাল**-ঢা. ফ—আঁস্তাকুড় বিশেষ।
ছেঁচা-চ. মু. বর্ধ. মে—থেঁতলানো বাঁশ যাহা দিয়া সাধারণতঃ ঘরের বেড়া দেওয়া হয় (ছেঁচার বেড়া)। তৎপর্যায়ঃ—চটা, কেচা। ছেঁচা—পিষ্টকরা, কোটা (হলুদ ছেঁচা)। সেচন করা (জল ছেঁচা)।
জলটঙ্গি, জলটুঙ্গি—জলাশয়ে নির্মিত ধনীদের সুরম্য বিহার-গৃহ ('বাপের বাড়ীতে আছে গো জলটুঙ্গীর ঘর'—মৈগী)। পল্লীগীতিতে 'কামটুঙ্গি' শব্দটিও পাওয়া যায়। ('বসন্ত কালেতে যেন কামটুঙ্গী ঘর'—মৈগী)।
জানালা / জানলা [পো janella, ইং window, হি খিড়কী]—বাতায়ন, খিড়কি। জানালা নানা প্রকারের—বারজালা, ঝড়কা, খড়খড়ি, ঝিলমিলি, জাংলা। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘরের কোনও জানালা থাকে না।
জাফরি—জালের মত ফাঁক ফাঁক করিয়া বোনা বেড়া; দরমার বেড়া।
জিংলা-ম—কঞ্চি, জিংগৈল।
জুইতের ঘর-পূব—হাতীর পিঠের মত অর্ধবৃত্তাকার দোচালা ঘর। এই শ্রেণীর ঘরের চালে এত রাগ (বাঁক) দেওয়া হয় যে, চালের নীচের কোনাচগুলি মাটির একেবারে কাছাকাছি আসিয়া যায়; মাঝখানের উচ্চতা নাগালের বহু উর্ধ্বে থাকে।
ঝনকাঠ (চৌকাঠ দ্র)। **ঝাটি**-জ. কো—ঘরের নক্সা।
ঝাঁপ, ঝাপ—বাঁশের চেঁচাড়ি বাখারি ইত্যাদির দরজা, আগড়, টাটি। পূর্ববঙ্গে ঝাঁপের আর একটি স্থানীয় অর্থ আছে। সেদিককার ঘরের বেড়া প্রায়ই দুইভাগে বিভক্ত থাকে; একটি ভাগ থাকে গোবরাট হইতে কপালী পর্যন্ত, আর একটি অংশ থাকে কপালী হইতে ছাঁচা ও পাড়ের সংযোগস্থল পর্যন্ত।

কপালীর উপরকার বেড়ার এই অপ্রশস্ত অংশটিকে বলা হয়—ঝাপ (ঝাঁপের উচ্চারণভেদ), ভেলকি। এক সময়ে নিপুণ ঘরামিরা (ছাপরবন) এই সকল ঝাঁপে বা ভেলকিতে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত এবং তাহা দেখিতে দূর দূরান্ত হইতে আগত দর্শকদের বাস্তবিকই ভেলকি লাগিয়া যাইত ('ঝাঁপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম। দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান' —মৈগী)। ঝাঁপের অন্যান্য প্রতিশব্দ 'চান্দরা' শব্দে দ্রষ্টব্য। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে ঝাঁপের অপর স্থানীয় অর্থ—লেপ, আলোয়ান।

টাট, টাটি—বাঁশের চেটাই, সুপারির ফালি, সরকাঠি, পাটকাঠি, নলঘাস, বেনা ইত্যাদির বেড়া (চাটি দ্র)। টাট—তামার ছোট থালা বিশেষ, ইহা পূজায় ব্যবহার করা হয়।

টারি-জ.কো—মৌজার অংশ যাহার উপর এক একজন জোতদার ও তাহার আধিয়ারদের ঘরবাড়ী থাকে। তৎপর্যায় :—চাতাল, চাতর।

টুই-ম.মে—ঘরের চালের মাথা বা দুই মাথার সংযোগস্থলের আচ্ছাদন ('ছাপরবনের টুই উদাম'—প্র)। তৎপর্যায় :—টুঙ্গি-জ. কো. রং, মটকা-ক, মচকা-পূব।

ঠাকুরদালান-পব—মণ্ডপ, পূজামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ। ঠাকুরঘর—চণ্ডীমণ্ডপের পার্শ্বস্থিত কোনও গৃহদেবতার পূজার ঘর। ঠাকুরবাড়ী—দেবতার (প্রায়ই গৃহদেবতার) পূজার পৃথক আঙ্গিনা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে তুলসীমঞ্চকে রাজবংশীরা 'ঠাকুরবাড়ী' বলিয়া থাকে ; সেখানে শাদা নিশান উড়িতে দেখা যায়।

ঠিকরি-দচ—গোলা বিশেষ। তামাক সাজাইবার সময় কলিকার ছিদ্রপথে মাটির যে-ডেলা বা চাকতি দেওয়া হয়—ঠিকরা / ঠিকরে।

ঠেক, ঠেকনা, ঠেকা-ক. চ. বর্ধ—ঝড়-বাতাসে যাহাতে গৃহাদি সহজে হেলিয়া না পড়ে, তদুদ্দেশ্যে উহাদের সঙ্গে বাহির হইতে ঠেস দিয়া রাখা বাঁশের বা কাঠের লম্বামজবুত খুঁটি। তৎপর্যায় :—ঠিকা / ভেজা-ম, পেলা / প্যালা-টা.উব, ঢোকা-জ. কো. রং, ঠেস, prop.

ঠেঙ্গা / ঠ্যাঙ্গা-ফ. ব—হুড়কা। লাঠি (ঠেঙ্গার বাড়ি)। ঠেঙ্গা-ম—মুগুর।

ডাব-ফ. ব—বাঁশের বা সুপারির মোটা চেপটা বাখারি যাহা সাধারণতঃ বেড়ার আসন বা গোবরাটরূপে ব্যবহৃত হয়, খোয়া-রং। ডাব—কচি নারিকেল।

ডারিঘর-উব—বৈঠকখানা ; ইহা রাজবংশীদের সবচেয়ে বড় ঘর ; ইহার একদিকে লম্বা বারান্দা থাকে। **ডাসা**-ফ. ব—মোটা বাখারি বিশেষ।

ডেগুরা /-**ডেউগরা**-ম—কুঁড়ে, খড় পাতার ছোট ঘর ('বান্ধিল ডেগুরা এক কয়বর উপরে'-মৈগী)। তৎপর্যায় :—ডেরা। সাধারণ বাড়ী অর্থেও বাংলায় ডেরা শব্দের প্রয়োগ শুনা যায় (গরীবের ডেরায় একদিন যাবেন)।

ডোয়া-উব.ঢা.ফ.ব.নো.ত্রি—জমি হইতে গোবরাট পর্যন্ত ভিতের বা বারান্দার প্রান্ত। তৎপর্যায় :—ধারি-উব. পব. রাঢ়, ধাইর-ম।

ঢেঁকিশাল—যে-ঘরে ঢেঁকি দিয়া ধান ভানা, চিড়া কোটা ইত্যাদি কার্য নিষ্পন্ন হয়। ঢেঁকশাল-চ. ন. বর্ধ. মে, ঢিঁসক্যাল-মু, ঢেকিঘর-পূব।

ঢেঁকিশালকে বাঙ্গালী গৃহিণীরা অতি পবিত্র মনে করেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে ঢেঁকিপূজার এবং ঢেঁকিতে ধান ভানিবার ও হলুদ কুটিবার রেওয়াজ আছে। এককালে 'নান্দীমুখের বারাভানা' বিবাহাদি সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। 'ঢেঁকি পড়ন্ত, গাই বিয়ন্ত, উনুন জ্বলন্ত' (সেঁজুতি ব্রতের ছড়া) এক সময়ে গৃহস্থের সচ্ছলতার প্রতীক ছিল। 'ধান ভানতে শিবের গীত', 'মহীপালের গীত',—এই সকল প্রবাদ রচন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, অনেক রূপকথা গল্পকথার উৎসভূমি এই ঢেঁকিশাল।

ঢোকা-উব—ঠেক, ঠেকনা। **তড়কা, তাত্তুয়া, তাঁতো**—(দড়ি দ্র)।

তীর—ছোট ছোট খাম্বা যাহা মাটিতে না গাড়িয়া ঘরের চালের সঙ্গে ঠেকাইয়া আড়া বা সাঙ্গার উপর বসাইয়া দেওয়া হয় ; ইহাতে বড় বড় চালের মধ্যভাগ নীচের দিকে হেলিয়া পড়িতে পারে না। তীর—ধনুকের তীর, arrow.

তুয়াল-ম—অপুষ্ট বাঁশের সরু চেঁচাড়ি বা পাত যাহা সাধারণতঃ ঝাঁপ, বেড়া, চাল ইত্যাদি বাঁধাছাঁদার কাজে লাগে, তেওয়াল / তেওরি-জ. কো. রং।

তুলসীমঞ্চ—তুলসীতলা। প্রায় সকল হিন্দুর বাড়ীতেই তুলসীগাছ আছে এবং প্রতিসন্ধ্যায় উহার সুমার্জিত গোড়ায়, তথা মঞ্চে প্রদীপ দেওয়া হয়। অনেক ব্রতানুষ্ঠান এই তুলসীতলাতেই উদযাপিত হয়। ইহার অপর নাম ঠাকুরস্থান (থান), ঠাকুরবাড়ী-জ. কো। লোক-বিশ্বাস এই যে, এখানে বিষ্ণু সর্বদা (ত্রিসন্ধ্যা) বিরাজ করেন।

থান-রাঢ়. চ—লৌকিক দেবতার পূজার স্থান। সাধারণতঃ খোলামাঠে, বৃক্ষতলে, ঝোপে-ঝাড়ে এই সকল 'থান' দেখা যায়। যেমন, মেদিনীপুরের 'ভূমিজ ধান শোল' গ্রামের লোধাদের ঠাকুর থান, ভূমিজদের জহির থান, কালী আসন থান, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বাবাঠাকুরের থান। তৎপর্যায় :—খোলা-ফ. ব, তলা (মনসাতলা)। অনেক থানেই পোড়া মাটির হাতী, ঘোড়া, বাঘ দেখা যায়।

থান—জামা কাপড়ের থান। শাদা পাড় ধুতি।
থাম [সং স্তম্ভ, ইং pillar]—ঘরের খুঁটি, থাম্বা।
দড়ি—রসি, অসি-জ. কো. রং, রজ্জু। কাঁচা বা খড়ো ঘর বাঁধিতে নানা রকম দড়ির আবশ্যক হয়। কথায় বলে, 'ঘর বাঁধতে দড়ি, বিয়ে করতে কড়ি।'

মোটাদড়ি—দড়া, রসা, অসা-জ. কো. রং. দি, কচড়া-রং, আগাশি-রা, কাছি। খুঁটির সহিত পাড় এবং পাড়ের সহিত চাল বাঁধাছাঁদার দড়িকে বলা হয়—দিগড়দড়ি-চ, ছান্দনদড়ি-পূব, ছাঁদনদড়ি-খু, হাড়বাঁধনদড়ি-রং। চাল ছাওয়ার কাজে ব্যবহৃত সরুদড়ি—সুতলি, তাত্তুয়া-ম, তাইতা-টা, তাঁতো-খু, ডুরি, ছোতা-রং।

নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি—কাতা। খড়ের মোটা দড়ি—বড়্-চ. ন. মু, তড়কা-খু, বজনা-হিজ। খড়ের সরু দড়ি—ছোট্, ছোটা।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য দড়ির বিবরণ সম্পর্কে 'চাষ-আবাদ' দ্রষ্টব্য।
দরজা / দরোজা [ফা. দরবজা]—প্রবেশ এবং নির্গমন পথ এবং সেই পথের আচ্ছাদক, দ্বার, দুয়ার। উত্তর বঙ্গের কোথাও কোথাও কাঠের আচ্ছাদককে দরজা এবং বাঁশের আচ্ছাদককে দুয়ার বলা হয় (আগড়, কপাট ও ঝাঁপ দ্র)।

সদর দরজা—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ ও নির্গমন পথ (নাছ দ্র)।
খিড়কি দরজা—বাড়ীর পিছনের দরজা।
দরদালান-ক—দেওয়াল ঘেরা বারান্দা (বারান্দা দ্র)।
দরমা—বাঁশের লম্বা চেঁচাড়ি জালের মত ফাঁক ফাঁক করিয়া বুনিয়া তৈয়ারী আস্তরণ (খলপা দ্র)।
দশমর্দনা / দশমর্দানা—পড়ন্ত অবস্থা হইতে গৃহ, বৃক্ষ ইত্যাদি রক্ষা করিতে হইলে অনেক সময় ঠেকনার সাহায্য লইতে হয়; ঠেকনাটি খালি হাতে না ঠেলিয়া উহার গোড়ায় আড়াআড়িভাবে আর একটি শক্ত দণ্ড বাঁধিয়া চাড় দিলে অতি অল্প লোকের দ্বারাও কাজটি অতি সহজে সম্পন্ন হয়। দশজনের শক্তিপ্রদানকারী এই দণ্ডটিকে বলে—দশমর্দনা / দশমর্দানা-ম, লাট-ব।
দাওয়া—(বারান্দা দ্র)। দাওয়া—ধানকাটা (ধান দাওয়া)।
দালান—অট্টালিকা। দলান-পূব—দালানের আঞ্চলিক রূপভেদ। দালান—দরদালান, ঘেরা বারান্দা (পাকা)।
দেউড়ি [সং দেহলী]—বাড়ীর প্রধান প্রবেশ দ্বার ('নয় দেউড়ি পার হইয়া গেলাম দরবারে'—কৃত্তিবাস), সদর দরজা। দেউড়ি-মে. খু—বাহিরের বসিবার ঘর। দেউড়ি-ম—বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের মুখের আবরু বেড়া, রাওটাটি-রং।

দোচালা—দুই চাল বিশিষ্ট ঘর। তৎপর্যায় :—আলং-ম, বাংলাঘর-উব।

ধন্না, ধরনা—আড়া, আড়কাঠ বা আড়বাঁশ (আড়া দ্র)।

ধারি—(ডোয়া দ্র)। ধারি-ম—বাঁশের মজবুত চাটাই বিশেষ ; ইহাতে ধান কলাই রৌদ্রে শুকায়, গরীবেরা ইহা বিছানার পাতনি বা মাদুররূপে ব্যবহার করে।

নাছ, নাছদুয়ার, লাছদুয়ার-রাঢ়—বাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার (সদরদরজা) ও তৎসংলগ্ন আঙ্গিনা। মাঠের ধান কাটা হইলে ধান্যলক্ষ্মীকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখানেই প্রথম বরণ করিয়া লওয়া হয়। এক সময়ে হয়ত লক্ষ্মীর এই পাদপীঠেই সুখী বাঙ্গালীরা নাচগানের আসর জমাইত ('নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়াহুড়ি—চৈমঙ্গ)।

পই / পোই-উব—বাঁশের খুঁটি (ঘরের)। মূলী পোই, মোথা (মুথা) পোই, কোণ পোই—ঘরের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রকম খুঁটির নাম।

পরচালা—একপ্রকার বারান্দা। **পাইট**—ঘরামী।

পাঁচিল-ক—প্রাচীর, পাচির-বধ. হু।

পাট-রাঢ়—মাটির দেওয়ালের এক একটি স্তর। মাটির দেওয়াল বিশেষ প্রণালীতে অতি পরিশ্রম করিয়া উঠাইতে হয় ; উহা এক নাগাড়ে তৈয়ার করা হয় না। এক একবারে এক ফুট কি দেড় ফুট তুলিয়া কয়েকদিন ফেলিয়া রাখা হয়। তারপর আবার উহার উপরে এক ফুট কি দেড় ফুট তোলা হয়। এইরূপে কাজ চলিতে থাকে। দেওয়ালের এইরূপ এক একটি স্তরকে **'পাট'** বলা হয় ('প্রথমে প্রাচীর বিশাই কৈল চারি পাট'—কবিক)। চাল ছাইবার সময়ও খড় স্তরে স্তরে বিছাইয়া যাইতে হয়, ঐ সকল স্তরের নামও 'পাট'—('চারি হালা খড়ে ছাইল চারি পাট'—কবিক)। (পাটের অপর বিবিধ অর্থ অন্য স্থানে দেওয়া হইয়াছে)।

পাড়, পাইড়—ঘরের থাম্বার মাথায় কিংবা কাঁথের উপরে যে-দুইটি বা ততোধিক শক্ত মোটা কাঠ বা বাঁশ ন্যস্ত থাকে এবং প্রধানতঃ যাহাদের উপর চালের নীচের ভার পড়ে। তৎপর্যায় :—মারুল-ম, মারোল-উব। পাড়—নদ্যাদির উচু কিনারা। প্রান্ত (কাপড়ের পাড়)। পাতকুয়ার বেষ্টনী।

প্যাঁদাড়—বাড়ীর পিছনের আবর্জনাপূর্ণ স্থান, আদাড়, আঁস্তাকুড়।

পাইখানা, পায়খানা—মলত্যাগের স্থান। তৎপর্যায় :—সেৎখানা-পূব, টাট্টি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার বহু অঞ্চলেই গ্রামে নির্দিষ্ট কোনও

পাইখানা নাই ; প্রায়ই ঝোপে-জঙ্গলে, মাঠে, জলাশয়াদির ধারে মলত্যাগ করিতে দেখা যায়।

প্যাল্লা-ম—ঘরের থাম্বা (খুঁটি দ্র)। সরু ডাল। ডালপালা—সরু ডাল কঞ্চি ইত্যাদি। পালা ঝিঙ্গা—ডালপালা আশ্রয় করিয়া যে-ঝিঙ্গা গাছ বাড়িয়া উঠে এবং ফল দেয়। পালা—পর্যায়, turn. অভিনয়াদির বিষয় (রাবণ-বধ পালা)।

পাউটি, পাঁছটি—পইঠা, পিঁড়া। **পিঁড়া / পিঁড়ে, পিঁড্যা**-বাঁ—পইঠা ; মাটির ঘরের বারান্দা (গৃহ-সামগ্রী দ্র)।

পেরেক [পো prego]—লোহার কাঁটা বিশেষ,—এক মাথা চাকতির মত, অপর মাথা সূক্ষ্ম। পেরাগ-ম—পেরেকের উচ্চারণভেদ। পেরেক নানা প্রকার : গজাল-পূব, গজার-ম, জিনালি, জিনারি, খেরিগজাল-ফ. ব, তারকাঁটা, ডামিশ ব, জোলুই-বী।

পেলা / প্যালা-উব—ঠেকনা। পেলা-ক—গানের আসরে শ্রোতারা খুশী হইয়া গায়ক গায়িকাকে যে-পুরস্কার দেয়। গ্রামে কাহারো বাড়ীতে রামায়ণ-গান, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি হইলে গৃহস্বামীকে অতি অল্পই খরচ করিতে হয়, গায়ক-গায়িকারা শ্রোতাদের নিকট হইতে পেলা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

পোঁতা, পোতা [ইং plinth]—ভিত, ভিটার নীচের জমি হইতে মেঝে পর্যন্ত বেদী, গোরোট-বী. মু। পোঁতা—প্রোথিত করা। পোতার প্রান্ত—ধারি, ডোয়া।

বড়্-চ. ন. মু. বর্ধ. বাঁ—খড়ের মোটা দড়ি। সাধারণতঃ 'মরাই' তৈয়ার করিতে এবং খড় বিচালির বড় বড় বোঝা বাঁধিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ('বসন খসায় যেন মরাইর বড়'—কবিক)। তৎপর্যায় :—বড়িয়া-ম. তড়কা-মু, বজনা-হিজ। খড়ের সরু দড়ি—ছোটো চ. ন. মু. বর্ধ, ছোটা-য।

বনিয়াদ [ফা বুনিয়াদ, ইং foundation]—ভিত, গৃহভিত্তি, গোরোট। বনেদ, বুনিয়াদ—বনিয়াদের রূপভেদ। বনেদপূজা, ভিতপূজা—যে-ভূমির উপর বাস্তু নির্মিত হইবে, সেই ভূমির সংস্কারার্থে বাস্তুদেবতাদির পূজা এবং ভিত্তিপ্রস্তর (অট্টালিকার ক্ষেত্রে) স্থাপন বা প্রথম থাম (চালা ঘরের ক্ষেত্রে) পোঁতা। এই থামটিকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও 'ঐশান' এবং থাম-পোঁতাকে ঐশানগাড়া / ঐশানতোলা বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের শাস্ত্রীয় নাম 'গৃহারম্ভ'। প্রথমতঃ গৃহভিত্তির ঈশানকোণে কিংবা ঈশানকোণ হইতে সূত্র ধরিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভ বা খুঁটি স্থাপন করা হয়। কুদৃষ্টির আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু ক্ষেত্রেই খুঁটির মাথায় ঝাঁটা, ছেঁড়াজুতা, চুনকালি মাখা হাঁড়ি

ইত্যাদি টানাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে গৃহ-নির্মাণ-ভূমি চাষ করাইয়া শোধন করিয়া লন। লোকশ্রুতি এই যে, লাঙ্গলের ফলার আঘাতে সমস্ত অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়।

বরগা [পো Verga, ইং rafter]—সরু সরু বংশদণ্ডের উপরে খোপ খোপ করিয়া বাখারি বাঁধিয়া চালের ফ্রেম বা কাঠামো তৈয়ার করা হয়। টালির বা টিনের চালের ফ্রেমের ক্ষেত্রে সরু সরু চৌপল কাঠের উপর পেরেক মারিয়া আঁটকাইয়া দেওয়া হয়। চালের এই সকল বংশদণ্ড বা কাঠ যাহার উপর বাখারি বা বাটাম বসে, তাহাদিগকে বলা হয়—বরগা-ক, রুয়া / রুয়ো-চ.ন.ফ.ব, রুইও-বাঁ.বী.মু, রুয়া / উয়া-জ. কো. রং, কামড়া-মে, কাচি-দচ, কাইচ, কুরো-ম। বরগা—ভাগে অপরের জমি চাষ আবাদের ব্যবস্থা (চাষ-আবাদ দ্র)।

বাইরাগ, বাইড্ডাগ-ম—(বাড়ীর আগ) বহির্বাটী, বাহির আঙ্গিনা। তৎপর্যায়:—বাইরবাড়ী, আগদুয়ার-পা, ছনদার / খোলাত / খুলি-উব (আঙ্গিনা দ্র)। **বাকুল**—(আঙ্গিনা দ্র)। **বাখার**—বড় মরাই।

বাখারি—বাঁশ কাঠ ইত্যাদির লম্বা ফালি। বাখারি নানা প্রকারের :— বাতা-ক, বাতি / বাত্তা-উব, চটি-ম. ঢা. ফ. ব, চিপে-য, কাইম-ফ. ত্রি, বেচাইর-টা, চটা-য.খু.ব, চেরা-ব, লাইম-ঢা. য, খাপ / খাপাসি / খাবাসি-ম. ঢা, আটন, আটনি, বাটাম, সাঁড়ক / সাঁড়োক-চ. বাঁ. রং, বাঘা, কাবারি, ডাসা। ইহাদের অনেকরই পরিচয় বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইয়াছে।

বাজু-ক—কপাটের ফ্রেমের এবং খাটের পাশের কাঠ (চৌকাঠ দ্র)। বাজু—বাহুর অলঙ্কার বিশেষ।

বাটাম—কাঠের মোটা চেপটা বাখারি। কপাটের বাজুতে ঝুলানো হুড়কা বিশেষ।

বাড়ি, বাড়া [সং বাটী, হি মকান]—বসতবাড়ী, ভদ্রাসন, বাস্তু / বাস্তুভিটা, ভিটা/ভিডা-ম ('বাপের ভিডাৎ বাতি দিতে আমরা দুই ভাই' – মৈগী)।

শহুরে বাড়ী এবং বাংলার গ্রামের বাড়ীতে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে। শহুরে বাড়ী প্রায়ই গৃহপ্রধান, গৃহগুলিও আবার ঘনসংবদ্ধ; গৃহবেষ্টিত বিস্তৃত স্থান বা উঠান সেখানে অতি অল্পসংখ্যক বাড়ীতেই দেখা যায়; শহরের বাড়ী মুখ্যতঃ বসতবাটী, বাসা। কিন্তু গ্রামের বাড়ী বলিতে নানাশ্রেণীর ঘরদুয়ারের সঙ্গে আরও অনেক কিছু বুঝায় :—উঠান, বাগান, পুকুর, খামার, দেবতার থান; সর্বোপরি উহা সুখে দুঃখে বিবাদে সম্প্রীতিতে অযাচিতভাবে আত্মীয়বান্ধব

পাড়াপ্রতিবেশীর সমাগম-স্থান। গ্রামের বাড়ীর অপর নাম 'দেশ' (আপনার দেশ কোথায় ছিল ?—সাম্প্রতিক কালের বহুশ্রুত জিজ্ঞাসা)।

চকমিলানবাড়ী—যে-বাড়ীর মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ এবং চারিদিকে সারিবদ্ধ গৃহ। দস্যু তস্করাদির আক্রমণ প্রতিহত করিতে এককালে এইরূপ বাড়ীই উপযুক্ত মনে হইত। বাংলার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মাটির দেওয়ালযুক্ত চকমিলান বাড়ী প্রায়ই দেখা যায়।

বাসাবাড়ী—অস্থায়ী বাসস্থান বা ভাড়াটে বাড়ী। হাবেলি, বাসা, হাউলি-পূব।

বাগানবাড়ী—বাগানবাড়ীর বাড়ীটা গৌণ, বাগানটাই মুখ্য। বিত্তবান সৌখীন ব্যক্তিরা অনেকসময় স্থায়ী বসতবাটী থাকা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে বেশী পরিমাণ জমি রাখিয়া প্রায়ই উহার চারিদিকে পাঁচিল দেন, ফলফুল শাকসবৃজির চাষ করেন, পুকুর কাটেন, মাছ ছাড়েন, মাছ ধরেন, ছোটখাট কুঠিও নির্মাণ করেন। সাধারণতঃ মালীরাই সেখানে বসবাস করে, তাহাদের হেপাজতেই সব থাকে। মালিকরা খেয়ালখুশিমত মধ্যে মধ্যে আসেন, ইয়ার গোছের লোকও প্রায়ই সঙ্গে থাকে। সহসা ঘুমন্তপুরী যেন জাগিয়া উঠে। বেশ কয়েক ঘণ্টা হাঁকডাক, আমোদস্ফূর্তি চলে। তারপর সব নীরব হইয়া যায়। বাগানবাড়ীর ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। (বাড়ির অন্য অর্থ 'চাষ-আবাদ' দ্র)।

বাড়ুই, বাড়ই—এক শ্রেণীর ঘরামি যাহারা প্রধানতঃ ছাউনির কাজ করে।

বাতা—খড়ো চালের বা বেড়ার চেপটা বাখারি ('প্রাণধন পাইলুঁ আমি ধরি চালবাতা'—কবিক)। খাগড়াজাতীয় তৃণ ('পাঞ্চ গাছি বাতার ডুগল হাতেতে লইয়া—' মৈগী)। বাতাগাছ বেড়ার উপকরণ রূপেও ব্যবহৃত হয়।

বারদুয়ারী ঘর, বার বাংলার ঘর—তখনকার দিনে বিত্তশালী অনেকেই যেমন মঠ মন্দির নির্মাণ করিয়া পরকালের পথ সুগম করিতেন, তেমনি ইহকালে খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্যও অনবদ্য কারুকার্যমণ্ডিত 'বার বাংলার ঘর' নির্মাণে উদ্যোগী হইতেন। বাড়ীর বাহিরের দিকে এই সকল ঘর তৈয়ার করা হইত। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ঘরদরজার কাজে নামকরা শিল্পীদের উচ্চ পারিশ্রমিক দানের প্রতিশ্রুতিতে আহ্বান করিয়া আনা হইত। নির্বাচিতেরা মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর কাজ করিয়া এক একটি ঘরের শিল্প-কার্য শেষ করিতেন। এই সকল ঘরের উপকরণ ইট পাথর সিমেণ্ট বালি নয়; বাঁশ বেত চটি পাটি উলুখড় প্রভৃতি সামান্য উপকরণ লইয়াই শিল্পীরা কাজ করিতেন। বেড়ায়, ঝাঁপে, চাঁদারে, সামান্য একটি বাখারিতে, এক টুকরা শীতল পাটিতে তাঁহারা এমন সব কারুকার্য করিতেন,

পুরাণ ইতিহাসের কথা কাহিনী রূপায়িত করিয়া তুলিতেন, যাহা দেখিবার জন্য দূর দূরান্ত হইতে দলে দলে লোক ছুটিয়া আসিত। সেইসব ঘরদুয়ার এখন আর চোখে পড়ে না। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের 'বাঙ্গলা ঘর' সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকায়'ও তদনুরূপ 'বার বাংলার ঘর' 'বার দুয়ারিয়া ঘর' সম্বন্ধে উল্লেখ আছে: 'রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে। বার বাংলার ঘর বানছে ফুলেশ্বরীর পাড়ে ॥'..... 'আটচালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর। ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বার দুয়াইরা ঘর ॥'

বারান্দা, বারাণ্ডা [পো varanda, ইং veranda, হি বরামদা]—অলিন্দ, গৃহের ভিতসংলগ্ন উদ্‌গত অংশ, গৃহের বাহিরের দিকের ঢাকা বা খোলা বাড়তি অংশ। তৎপর্যায় :—পিঁড়া-বাঁ.বী, পিঁড়ে-ন. বর্ধ, পিঁড়্যা- মু, দাওয়া-চ. হু. মে. শ্রী, দলিচ-মে, হাতনে-য. খু, হাইতনা-পূব. ত্রি. নো. শ্রী, উসারা-ম, উছরা-শ্রী, ওসরা-মা, আগচালা-পা, আগচালি-রা, চালি / ধাপ-জ. কো. রং। রোয়াক, রক—পাকা খোলা বারান্দা। ভিতর দাওয়া-মে—কাঁচা ঘরের ঘেরা বারান্দা। দালান, দরদালান—পাকাঘরের ঘেরা বারান্দা। পরচালা, ওটাচালা—দরজার সম্মুখের বারান্দা। ওরসা—বারান্দার যেস্থানে রান্না হয়।

বাস্তুঘর—জ. কো. দি—বাড়ীর ভিতরের প্রধান শয়ন ঘর, ভিটার ঘর-রা।

বেঙ, বেঙি—বেঙের ধরন কাঠের ছিটকিনি বিশেষ। বেঙ/ব্যাঙ—ভেক।

বেড়া—বেষ্টনী, যাহা দ্বারা কোনও স্থান, ঘর বাগান ইত্যাদি ঘেরা হয়। সাধারণতঃ বাঁশ কাঠ কঞ্চি ইত্যাদির বেষ্টনীকে বেড়া এবং ইট-পাথরের বা মাটির বেষ্টনীকে দেওয়াল/দেয়াল বলা হয়।

নানা উপকরণে নানা প্রকারের বেড়া তৈয়ার করা হয়। যেমন, ছেঁচাবেড়া, তলতাবাঁশের বেড়া, চাঁচের বেড়া, ছিটেবেড়া, কাঁটা তারের বেড়া, টিনের বেড়া, তক্তার বেড়া ইত্যাদি।

বেত—[বেত্র, ইং cane.] গোটা বেত দিয়া এবং বেত চিরিয়া সূক্ষ্ম পাত করিয়া নানা রকম জিনিষ তৈয়ারী হয়। কুটীরশিল্প হিসাবে একসময়ে বেতশিল্প বাংলা দেশের দিকে দিকে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। 'বার বাংলার ঘরে', উহার বেড়ায় ভেলকিতে শিল্পীরা যে-শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতেন, তাহাতে বেতের কাজই প্রাধান্য লাভ করিত। সুন্দিবেত-ম. ত্রি. শ্রী—এই বেত অতি সরু এবং দীর্ঘ, সত্তর আশি হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বাঁশের পাত বা চেঁচাড়িকেও বেত বা বেতি বলা হয়। **বেন্দা**—হুড়কা বিশেষ।

বৈঠকখানা [ইং drawing room]—নিজেদের এবং অতিথি অভ্যাগতদের বসিবার ঘর। সাধারণতঃ এই ঘর বাহিরমহলের দিকে থাকে। তৎপর্যায়ঃ—বৈঠকঘর/আধঘরা-ত্রি, বাংলা-মু, দলিজ-মু, থানকা-রং, ডারিঘর-জ. কো. দি, কাচারিঘর/বাইর বাড়ীর ঘর/বাইড্ডাগের ঘর/বাইরাগের ঘর-ম, মেলা-বাঁ.বী।

ভারা—উঁচুতে কাজ করিবার সময় জিনিষপত্র সহ রাজমিস্ত্রীদের ভার ধারণ করিতে পারে, এইরূপ সিঁড়ি বা মাচা বিশেষ। কতকগুলি খাড়া বাঁশের বা কাঠের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে আর কতকগুলি বাঁশ বা কাঠ বাঁধিয়া এই ভারা তৈয়ার করা হয়। অট্টালিকাদি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'ভারাবাঁধা', 'আড়বাঁধা' অপরিহার্য। ভারা—লাউকুমড়ার মাচা।

ভিটা/ভিটে—বাস্তভিটা, যে-ভূমিখণ্ডের উপর কাহারো বাসগৃহ আছে বা এককালে ছিল বা এককালে হইতে পারে।

ভিটার ঘর-রা—প্রধান শয়নঘর। **ভিত** (বনিয়াদ দ্র)।

ভেজা-ম—ঠেকনা (ঠেক দ্র)। ভেজানো—বন্ধকরা (কপাট ভেজানো)।

ভেল্‌কি—চৌকাঠের মাথার উপরকার অপ্রশস্ত বেড়া (ঝাঁপ ও চান্দার দ্র)। ভেলকি—ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি (ভেলকি লাগা)।

মচকা, মটকা—মড়কোঁচা-মু.বী, চালের উপরের মাথা (টুই দ্র)।

মধ্যম পালা-ম—প্রধান বাসগৃহের কোনও থাম্বা যাহাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া প্রতি সন্ধ্যায় ধূপবাতি দেওয়া হয়। **মরাই** (গোলা দ্র)।

মাচা—মেঝে হইতে কয়েক ফুট উপরে বসিবার, শুইবার বা জিনিষপত্র রাখিবার বাঁশ কাঠ চাটাই, তালাই ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ারী স্থান। মাচান, মাচাং, মাচি—মাচার রূপভেদ। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও এইরূপ স্থানকে চাং বলে। কাঁচা ঘরের চালের নীচে জিনিষপত্র রাখিবার বাঁশের বা সুপারির ফালির তৈয়ারী মাচাকে ফরিদপুর ও বরিশাল অঞ্চলে 'কার' বলা হয়। তক্তার তৈয়ারী ঐরূপ মাচার নাম 'পাটাতন'। উত্তরবঙ্গে (জ. কো) মাচার অপর নাম—খারা, চাংরা, নোয়াখালিতে 'টোঙ'। [সং মঞ্চ]

ঘরের বাহিরে লাউ কুমড়া প্রভৃতি লতানিয়া গাছের জন্য ডালপালা বাঁশ কঞ্চি ইত্যাদি দ্বারা যে উচ্চ স্থান করিয়া দেওয়া হয় তাহারও সাধারণ নাম মাচা (লাউমাচা, পুঁইমাচা)। **মারুল, মারোল**—(পাড় দ্র)। মেরুদণ্ড।

মুদনি, মুড়নি, মুধুনি-বর্ধ. মে—দুই চালের মাথার সংযোগস্থলের নীচের শক্ত মোটা কাঠ বা বাঁশ।

মুরকি-জ. কো—গোলা বিশেষ। **মেক / মেকা**-মে—ঘরের থাম্বা।

মেঝে, মেজে [ইং floor]—গৃহতল। তৎপর্যায়ঃ—মাঝিয়া-জ. কো. রং. দি, মাইঝাশাল-ঢা. খাটাল-ফ. ব, কোঠা-হিজ, পোঁতা।

মেলা-বাঁ.বী—মিলিবার স্থান, বৈঠকখানা ; পূজার মণ্ডপ বা স্থান (দুর্গামেলা, মনসামেলা)। উৎসবাদি উপলক্ষে দর্শক ও ক্রেতা বিক্রেতার সমাগম। পূজা (ত্রিনাথের মেলা—গঞ্জিকাদি উপকরণে)। মেলা—অনেক (মেলা জিনিষ)। বিস্তৃত করা (কাপড় মেলা)। মেলা দেওয়া, মেলা করা—রওনা হওয়া, যাত্রা করা। মেলানি—বিদায়।

মোখা-জ. কো—দরজার উপরকার ঝাঁপ বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—চালকা।

রান্নাঘর [হি রসোইয়া ঘর, ইং kitchen]—যে-ঘরে রান্না করা হয়, রন্ধনশালা। রান্নাঘরের আঞ্চলিক প্রতিরূপ—রান্ধাঘর-ম, রান্ধনঘর, আনধন-ঘর-জ. কো. রং, রান্নুনঘর-পা, রাধুনঘর-ঢা। তৎপর্যায়ঃ—পাকঘর-ম. ত্রি, চুলোশাল-মু. বী, চণ্ডীশাল-হিজ, হেঁশেল (হাঁড়িশাল দ্র), রসুইঘর, ওরসা-ফ.ব। নিরামিষ ঘর—যে-ঘরে কেবল নিরামিষ রান্না হয়। আমিষ ঘর—যে ঘরে আমিষ নিরামিষ সব কিছুই রান্না হয়। বলিতে কি বাঙ্গালীর রান্নাঘর প্রধানতঃ আমিষ ঘর। অনেক বাড়ীতে শয়ন ঘরের বারান্দায়ই রান্না করা হয় ; ধান সিদ্ধ, কাপড় সিদ্ধ ইত্যাদি উঠানের উননে চলে।

রুইও, রুয়া—(বরগা দ্র)। **রোয়াক, রক**—পাকা ঘরের অনাবৃত বারান্দা।

সাঁড়ক / সাড়োক—কাঠের মোটা ফালি বা বাখারি বিশেষ (বাখারি দ্র)।

সারকুড়, সারগাড়ী, সারগাদা—আঁস্তাকুড় ; আবর্জনাদি ফেলিবার গর্ত।

সারদেওয়াল [ইং boundary wall]—বাড়ীর চারদিকের দেয়াল।

হাঁড়িশাল—রন্ধনশালা। হেঁশেল-ক, হেঁশ্যাল-বাঁ. বী, হাঁড়শাল-য, হাঁশ্যাল-পা, হাইশাল/আংশাল-জ. কো. রং, হাইনশাল-ফ. ব. খু, (রান্নাঘর দ্র)।

হাতিনা—বারান্দা দ্র। **হাবেলি, হাউলি**—বাসাবাড়ী।

হামার-মে.বাঁ—শস্যাদি রাখিবার গোলঘর, গোলা বিশেষ (গোলা দ্র)।

হুড়কা, হুড়কো [সং হুড়ুক্ক/হুড্ডুক, হি হুড়, ইং bolt, door fastener]—ঝাঁপ কপাট ইত্যাদি আট্‌কাইবার ডাণ্ডা বা কীলক বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—আগল, আগুল-চট্ট, ঠেঙ্গা/ঠ্যাঙ্গা-ফ. ব, বেন্দা-ম, গোঁচ-জ.কো, খিল। বাটাম-চ—কপাটের বাজুতে ঝুলন্ত হুড়কা। হুড়কাপালা-ম—ঝাঁপ (বাঁশের দরজা) আটকাইবার জন্য উহার দুই পার্শ্বে ভিতরের দিকে যে-দুইটি খুঁটি পোঁতা থাকে।

হেঁশেল—হাঁড়িশালের রূপভেদ (হাঁড়িশাল দ্র)॥
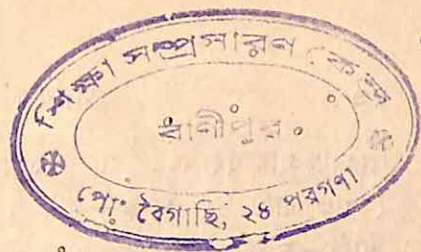
দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহ-সামগ্রী

অড়গড়ি, অর্গলি—যূপকাষ্ঠ (হাড়িকাঠ দ্র)।
অলতিয়া (বেড়ি দ্র)।
আইটনা-হিজ. শ্রী—ধোয়া বাসনকোসন রাখিবার বেদী বা মাচা।
আইভাঁড় বর্ধ—নানা রঙে চিত্রিত মাঙ্গলিক হাঁড়ি ; ইহাতে হলুদমাখা চাল ইত্যাদি থাকে। তৎপর্যায়ঃ—আইহাঁড়ি-চ. ন. মু. য, আঁওহাঁড়ি-রাঢ়, আ্যইঘট-ঢা, ছাউনি হাঁড়ি-ন, মুঙ্গলী হাঁড়ি-চ।
আইলসা (আলিসা দ্র)। **আওটা**-ম. ঢা. ত্রি. রং—দুধ ইত্যাদি জ্বাল দিবার হাঁড়ি বিশেষ। আওটানো—দুধ জ্বাল দিয়া ঘন করা।
আখা, আখাল—রন্ধনচুল্লী (উনন দ্র)।
আগল-ব—মাটি কাটার ঝুড়ি বিশেষ। হুড়কা। প্রধান।
আগুনের হাঁড়ি-ন—আগুন রাখিবার পাত্র। গ্রামে সাধারণতঃ গৃহস্থদের বাড়ীতে তুষ-ঘুঁটে জ্বালাইয়া দীর্ঘ সময়ের জন্য একটি পাত্রে আগুন রাখা হয়। তৎপর্যায়ঃ—আগুনের মালসা-চ. য. খু. রাঢ়, আগুনের পাতিল-নো, তাওয়া-ফ. ব, আতুয়া-ফ, আলিয়া/আ্যইল্যা-ম, আইলা-রা. পা, আলিসা/আইলসা-ঢা. টা, বোরশি-মে, জাগা-জ. কো। **আগুল, আগৈল** (ধামা দ্র)।
আড়—দুইটি খুঁটির সহিত আড়াআড়িভাবে বাঁধা বাঁশের বা কাঠের দণ্ড বিশেষ, সাঙ্গা। ইহা আলনারও কাজ দেয়, ইহাতে কাপড়চোপড় ইত্যাদি রৌদ্রে শুকায়। আড়াল। উঁচু পাড়। প্রস্থের দিক। বাঁকা (আড় চোখে)। জড়তা (আড় ভাঙা)। আড়বাঁশী—রাখালিয়া বাঁশী ; ব্রজরাখালের বাঁশী।
আড়গড়া (হাড়িকাঠ দ্র)। আস্তাবল বিশেষ। সিঁড়ি বিশেষ।
আড়ি/আড়ী [সং আঢ়ক]—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ। আড়ির নানা মাপ বাংলার বহু অঞ্চলেই প্রচলিত আছে। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও আড়ি (আরি)—ছোট ধামা বা পাঁচ সের মাপিবার পাত্র ; ইহার পাইয়া, পাঁইরি নামও শুনা যায়। নদীয়ার কোন কোন অঞ্চলে এক আড়ির

পরিমাণ প্রায় দুই মণ। রাঢ় অঞ্চলেও আড়ি/আড়ী শস্যমান ও মানপাত্র ('ধান্য ধারি দুই আড়ি'—কবিক ; 'ধান্য পাল্য আড়ী দুই'—কেক্ষেমা)। আড়ি—অপ্রণয় (তোমার সঙ্গে আড়ি)। আড়ি—ক্ষেতের আল।

আড়া, আঢ়া—শস্য বা জমির পরিমাণ বিশেষ (এক আড়া ধান, এক আড়া জমি)। কোথাও এক আড়া শস্যের পরিমাণ চারমণ এবং জমির পরিমাণ ষোল কাঠা বা প্রায় দেড় একর ; তদঞ্চলে ষোল আড়ায় এক পুরা। কোথাও আবার ষোল পুরায় এক আড়া ; সেখানে কাঠার পরিমাণও ভিন্ন। পুরা—স্থান ভেদে শস্যাদি মাপিবার কুনিকা জাতীয় পাত্র (কুনিকা দ্র)।

আতলা-মৃ. ম—বিস্তৃতমুখ মাটির পাত্র বিশেষ (তামাক মাখার আতলা ; চাউলের আতলা)।

আধলা-ব—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ (কাঠি দ্র)। ইটের অর্ধভাগ। আধ পয়সা (বর্তমানে অপ্রচলিত)। অর্ধভাগ।

আপখোরা, আবখোরা-পূব—চুমকি গ্লাস বিশেষ ; সাধারণতঃ ইহার গলা সরু, পেট মোটা, কানা বাহিরের দিকে হেলানো এবং প্রায়ই তলদেশে খুরা (বলয়াকার) থাকে। আককোরা-চট্ট, আগগোরা-ম, পালি-ম. ঢা. ত্রি, পাউলি-উব, চাকিয়া-মু, ফেরুয়া, ফেরো-ব. ফ, চুমকি ঘটী-চ।

আলগছি, আলগুছি-ম—ইংরেজী L-এর ধরন কাঠের দীপাধার বিশেষ ; ইহা ঘরের বেড়াতে হুকের সাহায্যে আলগোছে ঝুলাইয়া রাখা হয়। ঠকা-উব।

আলিসা / আইলসা-ঢা. টা—আগুনের হাঁড়ি (প্রায়ই মাটির)। পূর্ব ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরা অঞ্চলে 'আইলসা'—লম্বা ধরনের পিঁড়ি বিশেষ ; ইহার অপর নাম 'গাছপিড়ি' (একটি গাছের ডাল এবড়োখেবড়ো করিয়া কোপাইয়া পিঁড়ির মত করিয়া লওয়া হয় ; উচ্চকোটি লোকের বাড়ীতে নিম্নকোটি লোকদের প্রায়ই এইরূপ পিঁড়ি বসিতে দেওয়া হয়)। অলস। ছাদের প্রান্ত ; কানিস।

উড়কিমালা, উড়ি, উড়ুম—নারিকেল-মালার হাতা (ওড়োং দ্র)। উড়ি-ম—গোহালকাড়া ঝুড়ি বিশেষ। উড়ুম-ম. ব. পা—মুড়ি।

উনন/উনান/উন্মুন-ক [সং উদ্ধ্মান, হি চূলহা, ইং oven]—রন্ধনচুল্লী। তৎপর্যায়ঃ—আখা/আকা-ন. মৃ. বাঁ. বী. পু. উব. টা. ঢা. ফ. য. খু, আখাল-ব, চুলা/চুলো-ক, চুলী-মে, চৌকা-ম. ঢা. পা, তিউড়ি, তিয়ড়ি-বাঁ. বী, পাকাল-ত্রি. শ্রী, পাখা-দচ. বর্ধ। দুআখী-ঢা. ফ, দোপাখা-বর্ধ. হু—এক মুখ বিশিষ্ট জোড়া উনন ; ইহাতে একই আঁচে একই সঙ্গে দুইটি হাঁড়িতে রান্না করা যায়।

ওড়োং-বী—নারিকেল-মালার হাতা বিশেষ। এই শ্রেণীর হাতা দিয়া সাধারণতঃ আখের রস, খেজুরের রস, দুধ ইত্যাদি আওটানো হয়। তৎপর্যায়ঃ—গুড়ং-ঢা. পা. ত্রি, আড়োং-য, উড়কিমালা-চ, উড়ি-ব, উড়ুম/ডাবুর-ম।

কটুয়া/কট্যুয়া-পূব—কৌটা; ঢাকনিযুক্ত ছোট পাত্র ('সোনার কটুআ দুটি মানিকে পুরাআঁ'—শ্রীকৃ)। তৎপর্যায়ঃ—কটরা, কটোরা, ডিবা/ডিবে (পানের)।

কড়াই, কড়া [সং কটাহ, হি কড়াহা, ইং cauldron]—আংটাযুক্ত লোহার পাকপাত্র বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—কাস্তি-মু, চচ্‌লা/কানতাই-জ. কো. রং, লোহারা/লোয়ারা-পূব।

কলশ, কলস, কলশী, কলসী—কুম্ভ, স্ফীতোদর প্রসিদ্ধ জলপাত্র। তৎপর্যায়ঃ—ঘড়া, গাগরা, গাগরি, কলা-ত্রি, পোইলা-জ. কো। ছোট কলসী—চুকাই-জ. কো, ভাঁড়-ম, ঠিলি-ন. মু, নাগরি-চ, ডাবরি-ন. দচ, কোঁপা-মে, কারফা-চ (গলা মোটা, মধ্যভাগ স্ফীত, নিম্নাংশ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে)। কলসের আকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন। পূর্ব-বঙ্গের কলসের ডৌল এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলের ডৌল এক নহে। আবার মেদিনীপুরের কলসের সঙ্গেও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের প্রভূত পার্থক্য লক্ষিত হয়।

কাগমলা, কাগমল্লা-ম—মন্থনীর ন্যায় এক মাথা বিস্তৃত বংশদণ্ড বিশেষ; এই দণ্ডটি মাটিতে পুঁতিয়া ফাঁদালো মুখে রান্নার হাঁড়িকড়া তুলিয়া রাখা হয়। তৎপর্যায়ঃ—খুল্লা-ম, গুচকি-নো, ঝক-উব, হুপা-ন. ত্রি। মুণ্ডা ও সাঁওতালদের মধ্যে এই জিনিষটির ব্যবহার বেশী দেখা যায়।

কাচন-শ্রী—ছোট বাটি। তৎপর্যায়ঃ—কাতারি-মা, কুটুরি-বী (পাথরের), গীনা-হিজ (নুনের গীনা)।

কাঁচি [তু কাইঞ্চি, হি কাঁইচী, সাঁ কাপ্‌চি, ইং scissors]—চুলছাঁটা, কাপড় কাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত দোফলা অস্ত্র। কাঞ্চি/কেঞ্চি/কেঁচি-পূব।

কাছলা-ম—তিজেল জাতীয় মাটির হাঁড়ি বিশেষ ('কাছলা ভরা সাচ্চা দই পাতিল ভরা সর'—মৈগী)।

কাজললতা—কাজল করিবার চামচ ধরনের জোড়া ধাতুপাত্র; ইহার একটি দিয়া অন্যটি ঢাকা থাকে। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে বিবাহের কনেকে অধিবাস হইতে 'কাজললতা' এবং বরকে 'জাঁতি' ধারণ করিতে দেখা যায়।

কাটারি—(দা দ্র)।

কাঠকো-চ. ন—কাঠের গামলা জাতীয় পাত্র। তৎপর্যায়ঃ—পিপা, টব।

কাঠগড়া-পূব—হাড়িকাঠ। বেড়া দেওয়া কাঠের মঞ্চ, আদালতে যেখানে আসামীরা দাঁড়ায় বা সাক্ষীরা দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দেয়।

কাঠা—শস্যাদি মাপিবার পাত্র। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠার আকার এবং ওজন নানারূপ। যেমন, নদীয়াতে (আলাইপুর) এক কাঠা শস্যের পরিমাণ দুইসের, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার অঞ্চলে একসের হইতে পাঁচ সের (প্রায়ই আড়াই সের), পাবনায় পৌনে চার সের, ময়মনসিংহে কোথাও দশ সের, কোথাও বা সাড়ে বার সের, কি পনরো সের। মেদিনীপুরে ধান-মাপা পাত্রের বিভিন্ন নাম শুনা যায়। যেমন, ধামা, মান, বাগি, কোঁচা (কুনিকা, পঙ্কুরি ও আড়ি দ্র)।

কাঠা [সং কাষ্ঠা]—জমির পরিমাণ বিশেষ। শহরে বন্দরে সরকারী খাতাপত্রে এক কাঠা বিঘার ১/২০ অংশ বা ৭২০ বর্গফুট স্থান হইলেও বাংলার বহু অঞ্চলে কাঠার নানা রকম স্থানীয় মাপ প্রচলিত আছে। পূর্ব ময়মনসিংহের নশিরুজিয়াল, হুসেনসাহী প্রভৃতি কয়েকটি পরগনায় ১৮০০ বর্গ হাতে বা ·৯½ সাড়ে নয় শতাংশে এক কাঠা; স্পষ্টতঃই কলিকাতার প্রায় ছয় কাঠা ওদিককার এক কাঠার সমান। আবার ময়মনসিংহেরই পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে আলাপসিংহ ও রণভাওয়াল পরগনায় এক কাঠার স্থানীয় পরিমাণ ·৬½ সাড়ে ছয় শতাংশ। সেদিকে দলিল-পত্রাদিতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাপ লিখিয়া আবার স্থানীয় মাপও লিখিয়া দিবার রীতি আছে।

কাঠি-ব. দচ—শস্যমান; শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ। বরিশালের কোথাও কোথাও এক কাঠি ধান বলিতে বুঝায় আটাশ সের, কিন্তু এক কাঠি চালের পরিমাণ বত্রিশ সের। আধলা/বট্যিয়া—কাঠির অর্ধেক। দক্ষিণবঙ্গে এক কাঠির পরিমাণ দশ সের। কাঠি/কাটি—সরু শলা (ঝাঁটার—)।

কাঠুরা-মু—কাঠের বাটি। তৎপর্যায়ঃ—কাঠুরি-পা, কেটো/কেঠো/কাঠো-ক।

কাঁড়িয়া / কেঁড়ে—চ. ন. বর্ধ—দোহনপাত্র (মাটির বা বাঁশের)। তৎপর্যায়ঃ—দোনা-ম. ঢা. পা, দোয়নি-শ্রী. ত্রি, দুইনি-নো, হাতন-খু, হাতুয়া-ব, ডোল-দি. মা (দোহনের বালতি), জাম-মে (পিতলের), দুধের ভাঁড়-চ, ঘটি-জ, পালি / পেলে-মু।

কাইড়া / কাইরা-ঢা, কেঁড়ে-চ—তেল মাপিবার বাঁশের চোঙ্গা। কেড়িয়া-মে—চাষীদের বীজ ইত্যাদি রাখিবার চোঙ্গার পাত্র।

কাতলা-য.-পা—হাড়িকাঠ। খড়গ। ঢেঁকির খুঁটি। মৎস্য বিশেষ।

কাতা-পূব—খড়গ। কাতা-ক—নারিকেল ছোবড়ার দড়ি। কাতি—ছোটখড়্গ।

কাতান [পো catana]—দা বিশেষ।

কাতারি, কাতুরি, কাতানি] হি কতরনী, ইং shears]—ধাতুর পাত ইত্যাদি কাটিবার কাঁচি বিশেষ।

কাঁথা [সং কন্থা]—কয়েকটি কাপড় (সাধারণতঃ পুরাতন) একত্র সেলাই করিয়া তৈয়ারী গাত্রাবরণ বা শয্যাস্তরণ। পল্লীগ্রামে গরীবদের ইহা তোশক, গালিচা এবং শীতবস্ত্রের কাজ দেয়। এক সময়ে বাংলার কাঁথা-শিল্প ভারত-বিখ্যাত ছিল ; বিবিধ লতাপাতা, জীবজন্তু, ঠাকুরদেবতা, এমন কি পৌরাণিক কাহিনীও নিপুণাদের সূচি-কর্মের ভিতর দিয়া কাঁথার গায়ে মূর্ত হইয়া উঠিত। গাঁথা-হিজ, কেঁথা, ক্যাঁথা, খেতা—কাঁথার প্রাদেশিক উচ্চারণভেদ।

কানি-ক—কাপড়ের (সাধারণতঃ পুরাতন) টুক্‌রা। তৎপর্যায়ঃ—কানা-মে, নেকড়া, নেতা, নেথানি-জ. কো. রং. দি, তেনা-মু. পা. পূব, টেনা-বর্ধ, লাতা-বী, ছোঁচ-বাঁ. বী, পোচ-ফ. ব, ছাইচ-মা। কানি সংসারের নানা কাজে লাগে। যেমন, ঘর নিকানোর কানি, হাঁড়িকড়া পোঁছার কানি, ছাঁকনার কানি, গরীবের শিশুদের পরিধেয় কানি। মৃত্যুর পরও শবের বস্ত্রের কানি ছিঁড়িয়া শ্মশানে ধ্বজা উত্তোলনের প্রথা আছে—শ্মশানের কানি ('শ্মশানের কানি সাধু লাজে গিয়া পরে।'—কেক্ষেমা)।

কানেস্তারা—[পো canastra, ইং canister]—টিনের চতুষ্কোণ বড় পাত্র। তৎপর্যায়ঃ—টিন-ম. ত্রি, গিলান-পা।

কাপা-ক—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে তরল পদার্থ ঢালিবার ফাঁদাল মুখ নল বিশেষ। করপা-পা, টিপ / টিপনি-ম।

কাপি—হাড়িকাঠ। **কার**-পূব—মাচা, পাটাতন। **কারফা** (কলস দ্র)।

কাঁসি-ক—কাঁসার কানা উঁচু ছোট থালা। তৎপর্যায়ঃ—কাঁসা-মু, বেলি-পূব. পা. য. শ্রী। কাঁসর, gong।

কুচি, কুঁচি [সং কূর্চ]—শূকরের কর্কশ লোমে তৈয়ারী ব্রাস বা বুরুস ; এই বুরুস দিয়া গ্রামের মহিলারা শাঁখা, গহনা ইত্যাদি পরিষ্কার করে।

কুচি-পূব—বাঁশের কিংবা নারিকেল পাতায় কাঠির গুচ্ছ যাহা সাধারণতঃ খই চিড়া মুড়ি ইত্যাদি ভাজিবার কাজে লাগে। তৎপর্যায়ঃ—ভাজুনীশলা-য. খু, খোলাকুচি/খোলাকাঠি-ম, চেলো / ছেলো / ছিপা / লাড়ন—জ. কো।

কুড়াল, কুড়ুল, কুড়ালি—কুঠার, পরশু, কুড়্যাল-পা। টাঙ্গি—ছোট কুড়াল।

কুতলি-য. খু—মাটির ছোট বেদী যাহার উপর ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া ফেন গালা হয়। তৎপর্যায়ঃ—ঠনা-ম, পৈঠা-র, পৈথনা-ফ, বৈঠানি-ঢা।

কুনিকা / কুনকে-ক—চাল ইত্যাদি মাপিবার বাঁশের বা বেতের পাঁচ ছটাকী ছোটপাত্র। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ শস্যাদি মাপিবার ক্ষেত্রে পাল্লা-বাটখারার পরিবর্তে নানা শ্রেণীর নানা নামের পাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, কুনি-ব, কোঁচা-মে, খুঁচি [সং খুঞ্চিকা]-ন, দচ. খু. বী. ম. জ. কো. পা, খুবি-মে, টালা-রং, ঠিকে-মু, দোন-রং, পাই-বাঁ, পালি-চ. খু, পুরা-শ্রী. ত্রি. নো, পোয়া-বাঁ. য, রেক (আধপালি)-চ, সের-পূব. পা. মে, দন-চ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একই নামের ওজনপাত্র বহুস্থানে প্রচলিত থাকিলেও উহাদের মান যে সর্বত্র এক, তাহা নহে। যেমন, বীরভূমের কোথাও এক খুঁচির পরিমাণ দুই ছটাক, খুলনায় পাঁচ ছটাক, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় দশ ছটাক, এবং ময়মনসিংহে সোয়া সের, আড়াই সের—নানা রকম। চব্বিশ-পরগনায় এক পালি চাল বলিতে বুঝায় আড়াই সের, আবার খুলনায় পাঁচ সের। রেক-এর পরিমাণ সোয়া সের।

কুপা—তেলের স্ফীতোদর মাটির বা চামড়ার পাত্র।

কুপি—কেরোসিনের (আলো জ্বালাইবার) ডিবা (লম্প দ্র)।

কুরনি / কুরুনি-ক—নারিকেল ইত্যাদি কুরিবার দাঁতওয়ালা অস্ত্রবিশেষ। কোরন-য. খু, কুল্লি--মু, কুরানি-ম. ঢা. ব, কুরইন—কুরনির রূপভেদ।

কুলা / কুলো [সং কুল্য / সূর্প, হি সূপ, ইং winnowing basket]—সূপ-মে. পু। শস্যাদি ঝাড়িয়া বা বাতাসে উড়াইয়া বালি কাঁকর চিটা কুটা ইত্যাদি পৃথক করিবার চেপটা ধরনের বাঁশের পাত্র বিশেষ। অনেক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানেও কুলার প্রয়োজন হয়।

বরণকুলা—বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ চিত্রিত কুলা। যে-কুলায় বর-বধূকে বরণ করিবার বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য থাকে ; ইহার অপর নাম 'বরণডালা।' কুলো দেওয়া—কুলার বাতাসে শস্য হইতে খড়কুটা পৃথক করা।

কেটো, কেঠো—কাঠের ছোট বাটি। কচ্ছপ বিশেষ।

কেঁড়ে (কাঁড়িয়া দ্র)। **কৈলা**-শ্রী—মাটির বড় জালা বিশেষ।

কোঁচা—কুনিকা বিশেষ। **কোঁপা**—ছোট কলসী (ভাঁড় দ্র)।

কোলা—জালা বিশেষ (জালা দ্র)। শস্যক্ষেত্র ; কোলা ব্যাং—শস্যক্ষেত্রের গর্তে বাসকারী এক শ্রেণীর বড় ব্যাং।

কোস্তা—উলুখড়, পাতা ইত্যাদির ঝাড়ু (ঝাঁটা দ্র)।

খঞ্চা, খাঞ্চা, খুঞ্চি [ফা খঞ্চহ, হি খাঞ্চা]—কাঠের থালা, বারকোশ। খুঞ্চিপোষ—খুঞ্চি ঢাকিবার কাজকরা কাপড় বিশেষ।

খড়্গ—দা জাতীয় বৃহৎ অস্ত্র। তৎপর্যায়ঃ—কাতা-পুব, খাঁড়া-ক, খাণ্ডা / বলছিলা-ম, কাতলা-ঢা, টা। খড়্গ—গণ্ডারের শৃঙ্গ।

খড়ি—লাকড়ি [হি লোকড়ী] বা জ্বালাইবার উপযুক্ত কাঠ বাঁশ ইত্যাদি অর্থে 'খড়ি' শব্দটি পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু অঞ্চলে এবং উত্তর আসামে বহু প্রচলিত। যশোহর নদীয়াতেও জ্বালানি অর্থে খড়ি শব্দের প্রয়োগ কখন কখন শুনা যায় ('উল্টায়ে চড়ায়ে হাঁড়ি, উনুনে দেয় ভিজে খড়ি'—রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান)।

মেদিনীপুরে কাশ বা খাগড়া জাতীয় একরূপ শক্ত তৃণকে খড়ি / খড়ি-গাছ বলা হয়। ময়মনসিংহে এই খড়িগাছকে 'ইকড়' এবং ত্রিপুরায় 'বাতা' বলে। পানের বরজ বাঁধিতে খড়িগাছ চাষীদের বিশেষ কাজে লাগে এবং তাহারা ইহার রীতিমত চাষও করে।

খড়ি-ক—খড়িমাটি, chalk. হাতেখড়ি—সংস্কার বিশেষ, বিদ্যারম্ভ।

খতি-পূব—টাকা পয়সা রাখিবার থলি বিশেষ; সাধারণতঃ হাটে-বাজারে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা এই 'খতি' ব্যবহার করে।

খন্তা / খোন্তা-ক [সং খনিত্র]—মাটি খুঁড়িবার লম্বা হাতলযুক্ত অস্ত্র বিশেষ, খন্তি-পূব। শ্রীহট্ট অঞ্চলে খন্তা বলিতে খুরপা (খুরপ্র) বুঝায়।

শাবল—মাটি খুঁড়িবার খন্তাজাতীয় এক মাথা চেপটা লোহদণ্ড বিশেষ।

উছি-ম—সরু গর্ত করিবার সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠদণ্ড বিশেষ।

খন্তি, খুন্তি-ক. ঢা. ফ. ব. পা.—রাঁধিবার সময় ভাজাবড়া ইত্যাদি উল্টাইবার এক মাথা চেপটা লোহা ইত্যাদির তৈয়ারী কাঠি বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—ভাজাকাটি-পূব, ছেঁচ্‌কি-মু, লাফনা-য. খু, ছেনা-ম, ছেনি-শ্রী। (খন্তা দ্র)

খাচা, খাঁচা-ম—বাঁশের চেঁচাড়ি খোপ খোপ করিয়া বুনিয়া তৈয়ারী পাত্র; ইহা সাধারণতঃ গোরুর ছানি, ঘাস, আবর্জনা ইত্যাদি বহন করিবার কাজে লাগে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের (জ. কো) খাচা চব্বিশ পরগনার চাষীদের ঝাঁকার ন্যায় বিস্তৃতমুখ, যাহার অপর নাম কাছারি / চেঙ্গারি। পাখীর খাঁচা, বাঘের খাঁচা ইত্যাদির গড়ন স্বতন্ত্র। পাখীর খাঁচাকে জুলুঙ্গা / পিঞ্জরা / পিঁজরা বলিতেও শুনা যায়।

খাট [সং খট্বা]—বেশী মূল্যের শয্যাধার, পালঙ্ক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা বাঁশের তৈয়ারী শয্যাধারকে খাট এবং কাঠের তৈয়ারীকে চৌকি বলে। খাটিয়া—অল্পমূল্যের সাধারণ খাট; দড়ির খাট।

খাদা—পাথরের বাটি। তৎপর্যায়ঃ—পাথুরি-বাঁ. বী, খোরা/পাথরের খোরা। খাদা-পূব—গোরুকে যে পাত্রে (প্রায়ই মাটির) জাব দেওয়া হয়। -ম—ধামা।

-য. পা—জমির মাপ বিশেষ (১৬ বিঘায় এক থাদা)। থাদি-পূব—ছোটধামা। খদ্দর।

খাপরা, খাপরি—শরাজাতীয় মাটির পাত্র, চরাটি / খুলি-ফ. ব।

খারি, খাউরি-পূব—বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারী হালকা ধরনের ঝুড়ি বিশেষ ('খাউরি বিউনি করে যতেক ডোমের নারী'-মৈগী)। তৎপর্যায়ঃ-চাঙ্গারি / চেঙ্গারি-ক, ঠাকা-মে, পেচে-ন।

খালুই-ন. বর্ধ. বাঁ. বী. টা—মাছ রাখিবার চুপড়ি বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—খালই-মে. ম. ঢা. পা. খারই-মু. ন. য. খু. ব. ফ, খলই-জ. কো. নো, পেচে-ন, চুকরা / চুপরা-ম, ডোলা-ম. ঢা. ত্রি. নো, পাথি (পাথ্যা, পেথ্যা, পেথে)-রাঢ়।

খুঁচি, খুবি—শস্যাদি মাপিবার বাঁশের বা বেতের পাত্র (কুনিকা দ্র)।

খুরি—খুব ছোট বাটি (মধুপর্কের খুরি)।

খুল্লা (কাগমলা দ্র)। **খোরা**—বড় বাটি (পাথরের বা কাঁসার)।

খোলা—মুড়ি খই চিড়া ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র বিশেষ, ভাজনাখোলা, খোলাহাঁড়ি, খোলাপাতিল-ম, পালটা-মু। দেবতার থান। খামার। উন্মুক্ত।

পিঠেখোলা-চ—আস্‌কে এবং এই ধরনের সেকা পিঠা করিবার খোলা। কাঠখোলা—বালিশূন্য ভাজনাখোলা, চাটখোলা-ম।

গাছা-দচ—জেলেদের মাছ বহন করিবার বা রাখিবার মাঝারি ধরনের চুপড়ি। গাছা-পূব. উব—পিলসুজ, দেরকো, দেলকো। টি, টা, খণ্ড (একগাছা ফিতা)।

গাঞ্জিয়া-ম—জালের মত করিয়া বোনা দড়ির চতুষ্কোণ মাচা বিশেষ ; ইহা ঘরের চালের কিছুটা নীচে ঝুলানো অবস্থায় থাকে এবং ইহাতে দরিদ্র মানুষের কাঁথা বালিশ, পোঁটলাপুঁটলি ইত্যাদি স্থান পায়।

গারাশি-ম—খড়কাটা বঁটি ; ইহার মুখে কাস্তের মত দাঁত থাকে। তৎপর্যায়ঃ—ছানি কাটা বা শানি কাটা বঁটি-পব। গরশি-উব—খড় কাটা দা বিশেষ।

গাড়ু [সং গড্ডুক, সাঁ ঝারি]—নলযুক্ত ঘটী বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—ঝারি, বদনা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গাড়ু ঝারি এবং বদনা তিনটিই নলযুক্ত জলপাত্র হইলেও উহাদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য আছে, ঝারি সুন্দরতম। কমণ্ডলু—ইহাও গাড়ু শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু ইহার হাতল আছে এবং মুখ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ; সাধারণতঃ ইহা সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করেন। কেটলি / কেৎলি [ইং kettle] —জল গরম করিবার নল ও ঢাকনিযুক্ত পাত্র (চায়ের কেটলি)। ঝাজরি—গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র ঝারি বিশেষ (প্রায়ই টিনের)। সচ্ছিদ্র হাতা। নর্দমার মুখের লোহার জাল বিশেষ।

জগ [ইং jug]—হাতলযুক্ত ঠোঁটওয়ালা জলপাত্র। মগ [ইং mug]—গ্লাসের ধরন হাতলযুক্ত জলপাত্র বিশেষ, অনেকক্ষেত্রে ঘটির কাজ দেয়।

গামলা [পো gamella]—বিস্তৃতমুখ তলদেশ গোল কিংবা ঈষৎ চেপটা বাটি ধরনের বৃহৎপাত্র। সংসারী লোকের ইহা নানা প্রয়োজন মেটায়; মাটির গামলায় কৃষকেরা গোরুকে জাব দেয়, ধান ভিজায়, রজকেরা কাপড়ে কলপ লাগায়, সামাজিক ভোজে কিংবা মহোৎসবে (মচ্ছবে) ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখা হয়। দোনা-বী, পাতনা-চ. বী. মু, পাদনা-বর্ধ, নাদা-রাঢ়, টাট-হিজ, ডাবা-নু. হা. টা, গাভলা / হিমা-নো, মেচলা-চ, চাড়ি-ম. ত্রি. য. উব, পোহুনা-জ. কো. রং —বিভিন্ন নামের ও আকারের এই সব পাত্র সকলই গামলা পর্যায়ভুক্ত। পিতলের গামলাকে ময়মনসিংহে চরিয়া/ চইর‍্যা ও তাগাড়ি বলা হয়। নাদা, মেচলা, চাড়ি এবং পোহুনার গড়ন প্রায় একরূপ; ইহাদের তলদেশ গোল, অন্যান্য গামলার মত চেপ্‌টা নহে।

• রাজসাহী পাবনা এবং ময়মনসিংহের ভাটি অঞ্চলে বৃহদাকার চাড়িতে চড়িয়া অনেকে অপ্রশস্ত নদীনালা, বিলঝিল পার হয়, ছিপে মাছ ধরে। নোয়াখালিতে যাহাকে চাড়ি বলা হয়, তাহা মাটির তৈয়ারী নহে—কাঠের।

গীনা-মে—ছোট বাটি (নুনের গীনা)।

গেঁজে—সুতার থলি বিশেষ। সাবধানী লোক এইরূপ থলিতে টাকা পয়সা রাখিয়া কোমরে গুঁজিয়া চলাফেরা করে। গাইজা-পূব, গাঁজলে-মু।

গেলাস, গ্লাস [হি গিলাস, অন গিলাচ, ইং glass, tumbler]—পানপাত্র বিশেষ, গেলেস-পূব।

গোচৈ-ফ. ব—চাল ইত্যাদি ধুইবার বাঁশের সচ্ছিদ্র পাত্র, ধুচুনি।

গোড়া-মে, **গোঁদল**-হু. বর্ধ—দুধের আওটা ইত্যাদি চাঁচিবার, কিংবা শিশুদের দুধ বার্লি খাওয়াইবার ঝিনুক বা ঝিনুকের গড়ন ধাতুপাত্র বিশেষ। ঝিনুক, ঝিনই-পূব, আঁচড়া-রা।

ঘট—সংস্কৃতে ঘট অর্থ কলস এবং ক্ষুদ্রঘট—ঘটী। কিন্তু বাংলায় যে-কলস বা কলসজাতীয় পাত্র দেবতার পূজা-অর্চনায় বা অপর কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে স্থাপন করা হয়, তাহাকে ঘট বলে। সাধারণ কলস বা ঘটীকে 'ঘট' বলিতে বড় একটা শুনা যায় না। • অনেক লৌকিক দেবতার নিত্য পূজা অনেক ক্ষেত্রে ঘটেই সম্পন্ন হয়; এমন কি দুর্গাপূজা এবং কালীর নিত্য পূজাও কেহ কেহ শুধু ঘটেই করিয়া থাকেন। নানা রকম ঘটে নানা দেবতার

অধিষ্ঠান ; তাই ঘটকে প্রতীক কল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজা করা হয়। স্থান ও অনুষ্ঠান ভেদে ঘটের আকৃতি বিভিন্ন ; উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন।

দ্বারঘট-চ—কোনও শুভানুষ্ঠানে ঘরের বাহিরে, দ্বারের দুই পার্শ্বে সশীর্ষভাব ও আম্রপল্লব শোভিত যে-ঘট স্থাপন করা হয়।

মঙ্গলঘট, মঙ্গলকলস—বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে স্থাপিত তেল সিন্দুরের স্বস্তিকাদি চিহ্নলিপ্ত ঘট।

দেবীঘট-চ, জলঘট-পূব, ডাবরা-হিজ—পূজার বেদীতে বা বেদীর সম্মুখে স্থাপিত জলপূর্ণ ঘট।

বারা, বারি—রাঢ় অঞ্চলে মনসার ঘটের লোকপ্রসিদ্ধ নাম বারি ; কখন কখন 'বারা' কথাটিও শুনা যায়। ('গৃহমাঝে বসাইল রত্ন সিংহাসন। তথি মধ্যে স্বর্ণবারি কৈল আরোহণ'—বিদাস)। এক একটি মৃৎপাত্রের (মনসার ঘটের) গায়ে অতি নিপুণভাবে কয়েকটি সর্পফণা গড়িয়া তোলা হয়। কোন কোন ঘটে সর্পফণার সহিত হংসবাহনা একটি নারীমূর্তিও দেখা যায়। শুধু মনসার নয়, অন্য কোনো কোনো দেবতার পূজার ঘটকেও বারি, বারা বলিতে শুনা যায়। ('স্থাপিয়া আমার বারি করিও পূজন। নিযুক্ত করিও তাহে উত্তম ব্রাহ্মণ ॥'—কবিক। এখানে চণ্ডীর ঘটকে বারি বলা হইয়াছে)। আবার রায়মঙ্গলে দক্ষিণরায়ের ঘট বা মুণ্ডমূর্তি বারা ('দক্ষিণ-রায়ের বারা দেখিলেক কূলে। হরবরপুত্র জানি পুজে গন্ধফুলে ॥')। পূর্ববঙ্গে মনসার ঘটকে **'নাগঘট'** এবং কোথাও **'ভরক'** বলা হয় ('ভরক ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার'—মৈগী)। নাগঘটগুলিতে সর্প সংখ্যা (বংশের প্রথানুযায়ী ১. ৪. ৫. ৮. ৯. ১৬. ৪২ নানারূপ থাকে এবং সেগুলি প্রায়ই দীর্ঘাকার হয়। পূর্ববঙ্গের কোনও কোনও পরিবারে মনসাপূজায় **'কৈতরি ঘট'** নামে একটি স্বতন্ত্র ঘটও স্থাপন করা হয়। উহা বাঁশের চোঙার মত একটু লম্বা ধরনের এবং উহার (গা-বাহিয়া) দুই পার্শ্বে দুইটি সর্পমূর্তি থাকে। চট্টগ্রামের নাগঘটও চোঙাকৃতি, কিন্তু উহার গায়ে সর্পফণা থাকে না।

এতদ্ব্যতীত ইতুঘট, ধর্মের ঘট, কাতিকের ঘট—অনুষ্ঠানভেদে আরও নানা রকম ঘট ব্যবহৃত হয়। কাতিকের ঘট বিবিধ আলপনা যুক্ত থাকে। উহার অপর নাম—কার্তিকের ভাঁড়। ধর্মের ঘটে সূর্যের আলপনা শোভা পায় ; পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও কাতিক পূজার পূর্বদিন এই ঘট স্থাপন করা হয়। বারাঠাকুরের মুণ্ডমূর্তিও এক শ্রেণীর ঘট।

ঘটী [হি. সাঁ লোটা, ইং ewer]—জলপাত্র বিশেষ, লোটা / লুটা / হুটা-পূব ; চক্কি-ফ (ছোট ঘটী)। **ঘসি**—(ঘুঁটিয়া দ্র)।

ঘুটনি-ম—ফুটন্ত ডাল ঘাঁটিয়া জলো করিবার কাঠি বিশেষ, ডালের কাঁটা-ক. ঢা.পা, ডালঘুরনি / হীরাকাটি / মে, ডোই-মু.মা, নাকরি / নাকারি-জ. কো. রং।

ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে—শুষ্ক গোবর খণ্ড, ঘুইট্যা/গইঠা-পূব, ঘুঁট্যা-বাঁ.বী.মে, ঘসি, পাথার-জ.কো, উঁপুল-বী, চিপড়ি-মা। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ শুষ্ক গোবরখণ্ড মাঠ হইতে কুড়াইয়া আনা হয় ; কখনো বা কাঁচা গোবর তত না ঘাঁটিয়া মুঠি মুঠি করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে ঘুঁটে—গোবরের শুকনা চাকতি ; ইহা অমনি পাওয়া যায় না। কাঁচা গোবর ঘাঁটিয়া (প্রায়ই উহার সহিত কাঠের গুঁড়া, তুষকুটা ইত্যাদি মিশাইয়া) হাতের পাঁচ আঙ্গুলের চাপে ও ছাপে এই চাকতি (ঘুঁটে) তৈয়ার করা হয় এবং ইহা প্রধানতঃ কয়লার উনন ধরাইতে লাগে। গইঠা—গোবিষ্ঠা। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে ঘসির অনেক উল্লেখ পাওয়া যায় ('একেঁ দহ দহ ঘসির আগুন আরে কে না জ্বালে ফুকে'—শ্রীকৃ। 'তুষ ঘষি করি জড় শংকর জ্বালে খড়'—রারচ)। ঘসি শব্দটি সারা বাংলায় একই অর্থে প্রচলিত।

ঘোনা-ফ. ব—মশারি। **চক্কি**-ফ—ছোট ঘটী।

চটি-বাঁ. বী—তালপাতার আসন। সরু বাখারি। সরাই। জুতা বিশেষ।

চরিয়া / চইর‍্যা-ম [হি চরুয়া]—পিতলের গামলা। তাগাড়ি-ম. ঢা. ত্রি. শ্রী, তামারি-নো। পিতলের খুব বড় গামলাকে 'তাগাড়' বলিতেও শুনা যায়।

চাকি-ক—গোল পিড়ি যাহার উপর লুচি ইত্যাদি বেলা হয়, পিঁড়া / পিঁড়ে-মু। যে-গোলালো কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা লেচি বেলে তাহাকে বলে—বেলন, বেলনা, বেলুন, বেলাইন-ম (বেলন-চাকি, পিঁড়ে বেলন)।

চাকি-পূব [হি চক্কী, ও চকী]—জাঁতা-ক, চাক-মে, গম কলাই ইত্যাদি পেষিবার জোড়া পাথরের বৃত্তাকার যন্ত্র। -উব—আংটির মত গোল কর্ণাভরণ। -ম—পদ্মের চাকি। বাঙ্গালীর পদবী বিশেষ (চাকী)।

চাকিয়া-মু—চুমকি ঘটী বিশেষ (আপখোরা দ্র)।

চাকুন-দচ—জেলেদের মাছ বহন করিবার বড় ঝুড়ি।

চাঙ্গারি, চেঙ্গারি—ছোট ঝুড়ি বিশেষ (খারি দ্র)। চাঙ্গারি-জ. কো—বিস্তৃতমুখ ঝাঁকা। **চাটা**-শ্রী—মাটির প্রদীপ, মুচি।

চাটাই, চেটাই—বাঁশের চেঁটাড়ি, পাতি ঘাস, খেজুরপাতা ইত্যাদির তৈয়ারী আস্তরণ। ধান্যাদি রৌদ্রে শুকানো, ঝাঁপ-বেড়া বাঁধা, শোয়া-বসা অনেক কাজে

ইহা ব্যবহৃত হয়। কোথাও আবার খেজুরপাতার পাটিকে বলা হয়—তালাই-মে. বর্ধ। বরিশালে নলঘাস হইতে তৈয়ারী আস্তরণকে বলে—চাঁচ / চাচ। কলিকাতা অঞ্চলে দরমা বা চাঁচ বলা হয় বাঁশের আস্তরণকে।

চাটু-ক [সং চট্টু]—রুটি সেঁকিবার অগভীর পাত্র, তাওয়া-হু. বর্ধ। তোষামোদ।

চাটু হাঁড়ি-বর্ধ—ডাল রাঁধার চেপটা ধরনের হাঁড়ি, তিজেল। **চাড়ি / চারি** -উব. পুব—গামলা জাতীয় বৃহৎ মৃৎপাত্র (গামলা দ্র)।

চালনী [হি চলনী, ইং sieve]—শস্যাদি চালিবার ছিদ্রবহুল পাত্র। চালুনি-ক, চালুন-ম. ঢা, চালোন-মু. য, চালৈন-শ্রী. ত্রি. ফ, চালা-ঢা. ব—চালনীর নানা প্রতিরূপ। নানা কাজে নানা প্রকার চালুনি ব্যবহৃত হয়। খই চালুনি, আটাচালুনি, রাজমিস্ত্রীদের বালি চালুনি এক নহে।

চিরুনি-ক [হি কঙ্ঘী ইং comb]—চিরুন-মু, কাঁকই / কাঁকুই-পূব, কাঙ্গই / পনিয়া-হিজ, অনি-ত্রি. চট্ট, বিদা-জ. কো. ঝং (বাঁশের)।

চুকাই—জ. কো. দি—ছোট কলসী বিশেষ, ডাবরি।

চুনতি, চুনাতি—সাজানো পানের সঙ্গে বাটাতে পৃথকভাবে চুন দিবার কাঁসার খুরি।

চুপড়ি, চুবড়ি—বাঁশের চেঁচাড়ি বা সরু কাঠির তৈয়ারী নানা ধরনের ছোট ঝুড়ির সাধারণ নাম চুপড়ি। চুপড়ির অনেক কাজ, অনেক নাম। মাছের চুপড়ি (খালুই দ্র), শাক-সবজি ইত্যাদি রাখিবার বা ধুইবার চুপড়ি (খারি দ্র), দধির চুপড়ি ('পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী'—শ্রীকৃ)।

চেয়ার [ইং chair]—কুর্সি, কেদারা, মাইচ্যা-পূব, মাচান। ইজিচেয়ার [ইং arm-chair]—আরাম কেদারা। সোফা [ইং sofa]-গদিযুক্ত চেয়ার।

চৌকনা-ব—বড় আকারের ঝুড়ি বিশেষ, ঝোড়া।

চৌকা-ম. ঢা—উনন। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। **চৌকি**—কাঠের শয্যাধার ; সাধারণ খাট, তক্তাপোষ, তক্তপোষ। চকি-পূব— চৌকির প্রাদেশিক রূপভেদ।

ছাউনি হাঁড়ি-ন—(আইভাঁড় দ্রষ্টব্য)।

ছানতা-ক—ভাজাবড়া ইত্যাদি গরম তেল হইতে ছাঁকিয়া উঠাইবার সচ্ছিদ্র হাতা, ছান্না-মু, ঝাঁজরি, ঝাঁজরি হাতা। **ছিপি**-মু—ছোট থালা।

ছেঁচকি, ছেনা, ছেনি—ভাজাকাটি (খুন্তি দ্র)।

ছেনি-ন—হাঁসুয়া ধরনের বড় দা। ছেনি-ম—নিড়ানি বিশেষ। ছেনি-ক—লোহা ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ।

ছোঁচ-বাঁ. বী—ঘর নিকানোর নেকড়া ; নেতা। তৎপর্যায়ঃ—ছাইচ-মা. দি,

পোচ-ফ. ব, লাতা-বী, তেনা-পূব, টেনা-বর্ধ, নেথানি-কো, কানি-ক, লুড়ি-ম (প্রায়ই পাটের)।

জলই-চ. য. খু—খেজুরের রস জাল দিবার হাঁড়ি বিশেষ; ইহাতে ধানও সিদ্ধ করা যায়, জালহাঁড়ি-ন। জালা-য. খু—লোহার বিশেষ ধরনের হাঁড়ি, ইহাতে আখের রস জাল দেওয়া হয়।

জলকাঁথি-মু—জলের কলস রাখিবার বেদী, জলপিঁড়ি-ঢা (প্রায়ই কাঠের)।

জলচৌকি—বসিবার এবং স্নানাদি করিবার ছোট চৌকি। গ্রামে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে এই চৌকি চেয়ারের কাজ দেয়; চেয়ার না থাকিলে সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যাগতকে এই আসনেই বসিতে দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধাদিতে গুরুপূজায় গুরুকেও শ্রদ্ধার সহিত এইরূপ আসন দান করা হয়।

জাঁতা [হি চক্কী]—শস্যাদি গুঁড়া করিবার পাথরের বৃত্তাকার যন্ত্র। তৎপর্যায়ঃ—চাকি-পূব (চাকির আটা)। **জাঁতা**—ভস্ত্রা, bellows.

জাঁতি—সুপারি কাটার যন্ত্র বিশেষ, জাইতি-য, সরতা / ছরতা-পূব। স্থান ও সম্প্রদায় ভেদে বরকে বিবাহের সময় হাতে জাঁতি রাখিতে দেখা যায়।

জাম-মে—পিতলের দোহনপাত্র (কাঁড়িয়া দ্র)। ফল বিশেষ।

জামবাটি, জামখোরা-মা—কাঁসার বড় বাটি।

জালা [আ জারাহ]—অলিঞ্জর, মাটির বড় কলসী বিশেষ, কিন্তু কলসীর ন্যায় স্ফীতোদর নহে, দীর্ঘাকার (egg-shaped); কলসের ন্যায় ইহা দ্বারা জল বহন করিয়া আনা হয় না, ইহাতে জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়।

মটকি—মাটির বৃহৎ জালা বিশেষ; কিন্তু ইহার কানা জালার কানার ন্যায় হেলানো নহে,—খাড়া, দেখিতে কবন্ধের মত (গুড়ের মট্‌কি, ঘিয়ের মট্‌কি)। তৎপর্যায়ঃ—পেয়ে-ন, কোলা-মে. ঢা. টা. ফ. ব. নো. পা, কৈলা-শ্রী।

মটকা, মেটে-চ, মাঠি-ফ. ব, মাইট-পূব—মট্‌কির গড়ন দীর্ঘাকার (oval), কিন্তু মেটে বাতাবি লেবুর মত গোলাকার, মুখ সঙ্কীর্ণ, গলা খাট, কানা বাহিরের দিকে সামান্য হেলানো, মেটে রং; বড়গুলিতে ১০।১২ মণ ধান চাল রাখা যায়। মটকা—রেশমী কাপড়; চালের মাথা।

জোত-ফ—দড়ির আলনা বিশেষ (চাষ-আবাদ দ্র)।

ঝাঁকা-চ—কৃষিপণ্যাদি বহন করিবার বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারী বিস্তৃতমুখ অগভীর (থালার মত) পাত্র বিশেষ। বড় ঝাঁকার ব্যাস ৩ ফুটও হইতে পারে, কানা সাধারণতঃ ৪।৫ ইঞ্চি উঁচু থাকে। কৃষকেরা ইহাতে করিয়া

শাকসবজি, ফলমূল বাজারে আনে। এইরূপ ঝাঁকা ২৪ পরগনায়ই বেশী দেখা যায়। নদীয়ার ঝাঁকা ভিন্ন ধরনের, আরও গভীর। ঝাঁকামুটেদের ঝাঁকার গড়ন আবার এই সকল ঝাঁকা হইতে স্বতন্ত্র (পাছিয়া দ্র)।

ঝাঁজরিহাঁড়ি-ন—বিস্তৃতমুখ বহু ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ি। বিশেষ এক প্রণালীতে মুড়ি ভাজিবার সময় ইহার কাজ লাগে। তৎপর্যায়ঃ—ঝাঁজরি-বর্ধ, ঝাঁজর / ঝাঞ্জর-পূব (গাড়ু দ্র)।

ঝাঁটা [হি ঝাড়ু / বঢ়নী, ইং broom]—ঝেঁটা-রাঢ়, সম্মার্জনী, যাহা দিয়া অঙ্গনাদি ঝাঁট দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বাঁশের বা নারিকেল পাতার সরু কাঠি দিয়া এই ঝাঁটা তৈয়ার করা হয়। তৎপর্যায়ঃ—খাংরা / খেংরা, আইটা-ফ, পিছা / শলাপিছা-ঢা. টা. ফ. ব, বাদিনি / সামটা / খররা / বাড়ুন-জ. কো, হরকা, খরকা-মে, ঝাড়ু-ক। মুড়া ঝাঁটা / মুড়ো ঝাঁটা—যে ঝাঁটার অগ্রভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত ও শক্ত হইয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত কাঠির ঝাঁটা ছাড়াও উলুখড়, খেজুরপাতা ইত্যাদির তৈয়ারী নানা রকম ঝাঁটা আছে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠির ঝাঁটার ন্যায় ইহাদেরও বিভিন্ন নাম শুনা যায়। যেমন, বাড়ুন / বাড়োন-মু. ন. বর্ধ. হু. ঢা. টা. রা, পা, ঘরবরা-হিজ, কোস্তা-চ. য. খু, পালাঝাঁটা / ফুলঝাড়ু-চ, পিছা-ঢা. ফ. ব. নো. ত্রি, সাচুন / হাচুন-ম. ঢা. ত্রি, ফুরইন্-শ্রী। খড়পাতার ঝাঁটা সাধারণতঃ ঘরদুয়ার এবং শলির ঝাঁটা পথঘাট আঙ্গিনা ইত্যাদি ঝাঁট দিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঝাড়ন—বিছানাপত্র টেবিল চেয়ার ইত্যাদি ঝাড়িবার বস্ত্রখণ্ড, duster; কিন্তু কোনো কোনো অঞ্চলে ঝাঁটারও সাধারণ নাম ঝাড়ন।

ঝাঁপি-ক—বেতের তৈয়ারী পেটরা বিশেষ (লক্ষ্মীর ঝাঁপি), ঝাইল-পূব. উব।

ঝারি—নলযুক্ত জলপাত্র বিশেষ (গাড়ু দ্র)।

ঝিঁক-ক. বর্ধ. মে. পূব. উব—উননের উচ্চ মৃৎপিণ্ড যাহার উপর হাঁড়ি কড়াই ইত্যাদি বসানো হয়, পিড়া-শ্রী।

ঝুড়ি—বাঁশের পাতলা কাঠি, কঞ্চি, বেত ইত্যাদির তৈয়ারী অমসৃণ অর্ধ বৃত্তাকার পাত্র বিশেষ। চুপড়ির ন্যায় ঝুড়িরও অনেক কাজ, অনেক নাম। স্থানভেদে ঝুড়ির আকারও বিভিন্ন। বাজরা-চ, চাকুন-চ, গাছা-চ, পাজা-মু, পোয়াল-খু, চৌবনা-ব, ওড়া-ব. নো, আগৈল-ব, উড়ি-ম, টুকরি—ইহারা সকলই ঝুড়ি পর্যায়ভুক্ত হইলেও সকলে এক কাজ করে না এবং সকলের গড়নও একরূপ

নহে। বাজরা দ্বারা সাধারণতঃ চাষীরা বাজারে ফলমূল বহন করিয়া লইয়া যায়। বরিশালে মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত ঝুড়ির এক নাম আগৈল; ময়মনসিংহে ইহারই আবার টুকরি [হি টোকরী] নাম শুনা যায়। তদঞ্চলে গোহালকাড়া ঝুড়িকে বলা হয়—উড়ি। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় জেলেরা যে-বৃহৎ ঝুড়িতে মাছ বহন করে তাহার নাম—চাকুন এবং ঐ কাজে ব্যবহৃত মাঝারি ঝুড়ি—গাছা। ঝোড়া—বড় ঝুড়ি (প্রায়ই গোটা বেতের), ঝড়া-বাঁ।

টউ-ম. ঢা. ফ—রান্নার পিতলের হাঁড়ি বিশেষ। ডেক বা ডেকচির ন্যায় ইহা তত স্ফীতোদর নহে, ঘটীর মত খাড়া ধরনের।

টাইল-ম—ধান্যাদি রাখিবার বাঁশের খুব বড় আধার। ইহাতে ৪০।৫০ মণ ধান কলাই রাখা যায়। তৎপর্যায়ঃ—টোলা-মে, ডেলি-জ. কো, আউড়ি-খু।

টাকু, টেকো, তকলি—তুলা হইতে সুতা কাটিবার যন্ত্র বিশেষ।

টাকুর-পূব. উব. খু—পাট শণ ইত্যাদি হইতে সরু দড়ি তৈয়ারির যন্ত্র বিশেষ। ঢেড়া-চ. বর্ধ, ধেরা-জ. কো, টাকরাশি-রং—ইহারাও টাকুর জাতীয়, কিন্তু ইহাদের গড়ন ও টাকুরের গড়ন এক নহে।

টুকনি—বাটির মত বাঁশের বা বেতের ছোট পাত্র। তৎপর্যায়ঃ—টুকরি-বর্ধ, টুকি-বাঁ, টুকো / টুকোই-মু. বী, টুরি-ম. ঢা. পা. ত্রি. নো (ছেলেরা টুরিতে করিয়া মুড়ি খায়)।

টুকরি—(ঝুড়ি ও টুকনি দ্র)।

টুল—একজন বসিবার উপযোগী উচ্চ কাষ্ঠাসন; ইহাতে চেয়ারের মত হেলান দেওয়া যায় না। ইহার ছাউনিটি প্রায়ই গোলাকার থাকে বলিয়া ইহাকে 'গোলটুল' বলিতেও শুনা যায়।

টেনা-বর্ধ—কানি, তেনা-পূব ('মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা'-কেক্ষেমা)।

টেমি-চ—কেরোসিনের ডিবা বিশেষ (লম্প দ্র)।

টোকনা—ধাতুনির্মিত রন্ধনপাত্র বিশেষ।

টোকা-মে—চাল ধোয়ার বাঁশের ধুচুনি বিশেষ; ইহার মুখ গোল এবং তলা চতুষ্কোণ।

টোকা-হা. হু. বর্ধ. ন—বাঁশের ও পাতার তৈয়ারী টুপির ধরন ছাতা বিশেষ [প্তো touca]। অঙ্গুলির আঘাত (টোকা মারা)।

টুপা-ম—ঘটী ধরনের মাটির ছোট পাত্র,—অনেকটা ২৪ পরগনার 'দ্বারঘটের' মত ('টুপায় করিয়া জল কমলা আনিল'—মৈগী)।

ঠিলি-ন.মু—ঘটী জাতীয় মাটির পাত্র। সাঁওতালী ভাষায় ছোট কলসীকেও 'ঠিলি' বলা হয়।

ঠুলি—বাটির ধরন মাটির ছোট পাত্র। গোরু ঘোড়ার চোখের ঢাকনি।

ডখি / ডুখি-ম. ঢা. ব—ভাত রান্নার মাটির হাঁড়ি ; ইহাতে অপর অনেক কাজও হয়।

ডাবর-ক—গামলার গড়ন (কানা ভিতরের দিকে হেলানো) বড় বাটি বিশেষ (পানের ডাবর)। তৎপর্যায়ঃ—ডাবুর-ম, ডাবুরি-মু। ,ডাবুর-ম—নারিকেল মালার হাতা।

ডাবরা-হিজ—দেবতার উদ্দেশে স্থাপিত ঘট (ঘট দ্র)

ডাবরি-ন. দচ—লম্বাটে ছোট কলসী (গুড়ের ডাবরি)।

ডাবা-ন. টা—গামলাজাতীয় পাত্র ; ইহাতে সাধারণতঃ গোরুকে জাব দেওয়া হয়। ডাবা—থেলো হুঁকা।

ডাবুয়া-মে—কাপড়ের বড় টুকরা যাহা সাধারণতঃ পোঁটলাপুঁটলি বাঁধার কাজে লাগে, ডাবলা / ডুমা-ম।

ডালা—বাঁশের চেঁচাড়ির তৈয়ারী ঈষৎ গভীর থালার আকার পাত্র বিশেষ। এইরূপ ডালায় করিয়া সাধারণতঃ মুড়ি চিড়া খায়, ফকির বৈষ্ণবকে ভিক্ষা দেয়। গাঙ্গেয় অঞ্চলে ঈষৎ গভীর বিস্তৃতমুখ বাঁশের যে-পাত্রে ছাগল-খাসি এবং বাছুরকে জাব দেওয়া হয়, তাহাকেও 'ডালা' বলা হয়। আবার জেলেদের মাছের চুবড়ি ঢাকিবার এবং ছোট মাছের পসার সাজাইবার ঐরূপ পাত্রের নামও 'ডালা'।

ডালা—বাক্সের ঢাকনি। ডালা—দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ফলমূলাদি পূর্ণ পাত্র ; ইহার অপর নাম 'ডালি'।

ডালিয়া / ডাইল্যা-ম—ছোট ধামা (বাঁশের)। **ডিবা/ডিবে** [হি ডিব্বা]—কৌটা (নস্যের ডিবা)। বাটা (পানের ডিবা)। কেরোসিনের ডিবা (কুপি-দ্র)।

ডুলি—চেঁচাড়ির তৈয়ারী খাড়া গোলমুখ (ড্রামের মত) শস্যাধার বিশেষ ('মারিয়া পালের ষাঁড় পিঠে লইয়া তুলি। মানুষের শিরে যেন তুলা ভরা ডুলি' —রা:মু)। ডুলি [সং দোলী]—পালকি জাতীয় যান বিশেষ।

ডেক / ডেগ-ক [ফ্রা দেঘ]—ধাতুর তৈয়ারী বৃহৎ রন্ধনপাত্র বিশেষ (নিম্নাংশ অর্ধবৃত্তাকার, উর্ধ্বাংশ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, কানা প্রশস্ত এবং বাহিরের দিকে

হেলানো)। তামার কলাইকরা এইরূপ রন্ধনপাত্রকে বলা হয়—পতিলা-মু. মে। বিহারেও একই নাম শুনা যায়। ডেক্‌চি—ছোট ডেক।

ডেক্স-পূব—কাঠের বড় বাক্স বা সিন্দুক বিশেষ। তক্তাপোষের মত ইহার আয়তাকার ডালার উপর অনেক গৃহস্থকে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিতে দেখা যায়।

ডেলি-জঁ. কো. ত—বড় রকম ধান্যাধার ; ইহাতে প্রায় ৫০ মণ ধান রাখা যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট ধান্যাধার—ডোল।

ডেলুই-বী—প্রদীপ, তেল-ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালাইবার ছোট শরা বিশেষ (প্রদীপ দ্র)। **ডোই**—ডালের কাঁটা (ঘুটনি দ্র)।

ডোল-পূব. উব. [সং কণ্ডোল]—শস্যাদি রাখিবার বৃহৎ আধার, বড় ডুলি। -দি. মা—দোহনপাত্র রূপে ব্যবহৃত বালতি। -ক—কুয়া হইতে জল তুলিবার (তলা গোল) পাত্র বিশেষ। ডৌল, গড়ন (মুখের ডোল)।

ডোলা-পূব—মাছের চুঁপড়ি বিশেষ ('কোমরে বান্ধিয়া ডোলা হাতে লইয়া জাল'—মৈগী)। পালকি বিশেষ (দোলা)। বড় ডুলি।

ঢাকি-মু. ম. ঢা. উব. [হি ঢাকা / ঢাকী]—বাঁশের বড় ধামা বিশেষ। ঢাকী—পদবী বিশেষ। যে ঢাক বাজায়।

ঢেঁকি [ও ঢেঙ্কি, হি ঢেঁকী / ঢেঁকা]—ধানভানা, চিড়াকোটা ইত্যাদি কার্যে বহু-ব্যবহৃত কাঠের পদচালিত যন্ত্র। ঢেকি-পূব, ঢিঁকি-মু—ঢেঁকির উচ্চারণভেদ। বাংলার বাহিরে মধ্যপ্রদেশে, ওড়িশায়, বিহারে ও আসামের বহুস্থানে এবং চীনদেশেও ইহার প্রচলন আছে। এককালে 'ঢেঁকি পূজা এবং ঢেঁকিতে নান্দীমুখের বারা ভানা' বিবাহাদি সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল ('ঘরবাড়ী' অধ্যায়ে ঢেঁকিশাল দ্র)।

ঢেঁকির মুষল-ক [হি মুসর / মুসরা, ইং pestle]

ঢেঁকির অগ্রভাগ সংলগ্ন মুদ্গর, 'গড়ে' যাহার ঘা পড়ে, যাহার আঘাতে ধানভানা চিড়াকোটা ইত্যাদি কার্য নিষ্পন্ন হয়। তৎপর্যায় :—মোনা-চ. ন. বাঁ. বী. মে, মোহনা-রা, মনই-পা, মোনাই / মুষাল-ব. ত্রি, মউলা-নো, মুহুণ্ডা / ঢুস্‌লি-মে, ছিয়া-ন, ছে / মুগুর-য. খু, মুকইর-শ্রী, মুড়শালাই-মু, আগশালাই-রং, ওহ্না-টা, ওঁচা-চট্ট, চুরুন-ম. ঢা, চুরুম-পা।

ঢেঁকির গড়, গড়-রাঢ়. চ. ন. মু. রা

কাঠের বা মাটির (মাটির ক্ষেত্রে তলায় একখণ্ড তক্তা বা চেপ্টা পাথর থাকে)

বাটির ধরন যে গর্তে ঢেঁকির মুষলের ঘা পড়ে। সাধারণতঃ মাটির গড়ে ধানভানা হয়। কাঠের গড়ে চিড়া-বারা- দুই-ই হয়। পর্যায়শব্দ :—লোট / নোট-চ. ন. য. খু. ম. ঢা. ফ. ব. নো ত্রি. পা রা, পয়ল-চট্ট, গাইল-শ্রী, পারন-পা। যে কাঠে লোট তৈয়ার করা হয় তাহাকে বলে—নোট কাঠ-ন, লোট কাঠ-চ, গইড়া-ঢা।

ধান ভানিবার সময় গর্ত হইতে যাহাতে ধানগুলি এদিক ওদিক ছড়াইতে না পারে তদুদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও লোটের চারদিকে কুমারের চাকের মত (প্রায়ই মাটির) একটা বেষ্টনী দেওয়া হয়; খুলনাতে উহার 'গড়' এবং বরিশালে কায়াল / কাইওল নাম শুনা যায়।

শামা-রাঢ়, শামা / ছামা-উব [সং শম্ব]

ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের লৌহবেষ্টনী। তৎপর্যায়:—শামি / হামি-ম ত্রি, গুলা (গুলো, গুলে, গুলই)-চ. ন. মু. য. খু. ঢা. টা. পা. নো. শ্রী, বেড়ুয়া-ব। ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টে 'ঢেঁকির কালি' কথাটিও শুনা যায়। মনে রাখিতে হইবে, চিড়া কোটার মুষলে শামা থাকে না।

আঁকশলি-ক [সং অঙ্কশলাকা]

আড়াআড়িভাবে বিদ্ধ ঢেঁকির কোমরশলাকা, যাহা দুইটি শক্ত খুঁটির উপর থাকিয়া ঢেঁকিকে (beam) উঠায় নামায়। পর্যায়শব্দ:—আঁকশলাই-বাঁ বী, আঁকশোলোয়া / তশলী-মে, তশীল-চ ন, আড়শালাই-মু, আড়শলি-পা. রা. রং, আড়মলে-য, তড়শাল-খু, আঁরাল-চট্ট, সাওকা / সাওকাবাড়ি-ব, নাচনাকাঠি-ম. নো, কোমরিয়াকাঠি-ম, নাচুনি-ব।

পুয়া / পোয়া-ন. মু. য. রাঢ়. রা. রং

ঢেঁকির (কটির দিকের) দুই পার্শ্বের দুইটি খাঁজকাটা খুঁটি (pillars) যাহাদের উপর আঁকশলি বসে। তৎপর্যায় :—পই-চ. খু. রং, পাবা-মে, কাতলা-পা. ব, কিলা-চট্ট. নো, ঢেঁকির খুঁটি-ম. শ্রী ('আঁকশলি পুয়া মোনা গড়ে মেকামেকি'-অন্নদামঙ্গল)।

পাছুণ্ডা-মু

ঢেঁকির লেজ বা পিছনের চেপ্টা অংশ যাহার উপর ধানভানুনীরা পা চাপায়। তৎপর্যায় :—পাছা-চ. খু. য, পিছাই-চট্ট, ঢেঁকির লেজ-মে, ঢেকির লেঞ্জি-ম। ক্যাজাগাড়ী-মু—ঢেঁকির লেজে পা চাপাইলে উহা নীচু হইয়া যে-গর্তে গিয়া ঠেকে।

ইঁপঠা-ব, পোঠে-ন. মু. খু, ঢিপি / টিবি-চ
মাটির যে বেদীর উপর দাঁড়াইয়া ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া হয়।

আড়-ম. খু. ব
ঢেঁকির কটির ফুট তিনেক উপরে দুইটি খুঁটির মাথায় বা গায় আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত বংশদণ্ড যাহার উপর ভর দিয়া ধানভানুনীরা ঢেঁকি চালায়।

ঘাস্না / গায়না-ম
ঢেঁকি চালাইবার সময় যাহাতে উহার মাথাটি এদিক ওদিক হেলিতে দুলিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও গড়ের কাছাকাছি ঢেঁকির (beam) গা ঘেঁসিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি লম্বা খুঁটি পুতিয়া দেওয়া হয়; এই খুঁটি দুইটির আঞ্চলিক নাম—ঘাসনা, গায়না। গাঙ্গেয় অঞ্চলে ঘাসনা কদাচিৎ দেখা যায়; কোথাও ধানভানুনীরা ধান ভানার সময় ঢেঁকির মাথায় একটি দড়ি বাঁধিয়া উহা টানিয়া ধরিয়া রাখে।

ঢেঁকিছাঁটা চাল
ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া যে-চাল তৈয়ার করা হয়। ঢেঁকিতে চাল তৈয়ার করা —ধানভানা-ক, ধান বাহান-রা. রং, ধানভুকা-কো. জ, বারাবানা-ম. ঢা. ত্রি, বারাবাঁধা / বারাবান্দা-চট্ট, ধানকোটা-মে। কলে চাল তৈয়ারির ক্ষেত্রে 'ধানভাঙ্গা' কথাটিই অধিক শুনা যায়।

ধানভানুনী-য. খু মে
যে সকল স্ত্রীলোক পারিশ্রমিক লইয়া ঢেঁকিতে বা উখলিতে ধান ভানে বা চাল তৈয়ার করে। তৎপর্যায়ঃ—ধানকুটুনী-মু. মে, ভারানী-চ, বারানী-ম. পা, বাঁইচেবাড়ি-বী, বানুনী-ব, বারাবাঁধুনী / বারাবান্দনী-চট্ট। ধান ভানার খরচা বা পারিশ্রমিক—বোদ-মু।

সেঁকত দিয়নী
ধানভানার সময় যে-স্ত্রীলোক গড় বা লোটের কাছে বসিয়া এদিকে ওদিকে ছড়ানো ধানগুলি হাত দিয়া আবার গড়ে ফেলিয়া দেয়, কিংবা চিড়া কুটিবার সময় পিষ্ট ধানগুলি লোটে হাত দিয়া আলাইয়া দেয়। এইরূপ কাজকে বলা হয় —সেঁকে দেওয়া-চ. ন. মু. মে, সেঁকেত দেওয়া-বাঁ. বী, চালিয়ে দেওয়া-মে, এলিয়ে দেওয়া-খু. য. ন, আলাইয়া দেওয়া-ম. ত্রি. ব. পা, আইলাইয়া দেওয়া-ঢা.।

ঢেঁকিতে চাল প্রস্তুত করিবার সময় কয়েকটি কার্যক্রম অনুসরণ করিতে হয়। প্রথম দুই এক স্তরে তুষ-নিষ্কাশিত চালের সঙ্গে কতক আভাঙ্গা ও কতক

আধাভাঙ্গা ধান থাকে। এইরূপ তুষ ও ধানযুক্ত লাল চালকে বলে আউড়িয়া চাল-মে, বাখুরিয়া চাল-ম. খু,। এইগুলি কুলায় ঝাড়িয়া আবার গড়ে ফেলিয়া পাড় দেওয়াকে বলা হয়—পালটা দেওয়া-ব।

কাঁড়া—চাল প্রায় সম্পূর্ণ তুষমুক্ত করিয়া আবার ঢেঁকিতে পাড় দিয়া অবশিষ্ট কণাকুঁড়া পৃথক করা ('ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আঁকাড়া')। তৎপর্যায়ঃ—ছাঁটা / চাল ছাঁটা।

পাছুড়ি-মে, পাছুড়া-মু. উব, ঝাড়াপচা-ম—কুলার সাহায্যে চাল হইতে তুষকণা ইত্যাদি পৃথক করার কাজ।

উদূখল [হি ওখলী, ইং mortar]
হাতে মুষল চালাইয়া ধান ইত্যাদি ভানিবার বড় জামবাটির মত গর্ত বিশিষ্ট আধার বিশেষ (প্রায়ই কাঠের)। অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু তাঁহার 'ভারতের গ্রাম-জীবন' প্রবন্ধে (সা-প-প, ৬৮তম বর্ষ) চিত্রসহ নানাস্থানের নানারকম উদূখলের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশে ডমরুর আকৃতিবিশিষ্ট কাঠের উদূখলই বেশী দেখা যায়। কোথাও ইহার সরু অংশ মধ্যস্থলে এবং কোথাও উহা নীচের দিকে নামানো থাকে। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার নানা নাম শুনা যায়ঃ উখল / উখুল-মে, উখলি-ক, ছ্যাওয়া-মু, গাইল-ম. ত্রি, গামাইল-টা, হাত গাইল-শ্রী, ছাম / উরোন-উব, কাহাল / কাহাইল-ঢা।

উদূখলের মুষলকে (pestle) বলা হয়—সামাট-মু, ছেয়াঁ-মে, ছেকাট / ছেকাইট-ম. শ্রী. ত্রি, ছিয়া-ঢা, গাইন-উব, বারছা-শ্রী। উদূখল ও উহার মুষলকে একত্রে বলা হয়—গাইল-ছেকাট-ম, কাহিল-ছিয়া-ঢা। ছাম-গাইন-উব, উখুল-ছেঁয়া-মে।

তরোয়াল [হি তলওয়ার, ইং sword]—তরবারি, তরবার, তলোয়ার, তরাল, তরালি-পা। গুপ্তি—একপ্রকার তরোয়াল যাহা লাঠির ভিতরে গুপ্ত থাকে।

তসলা—পিতলের রন্ধনপাত্র বিশেষ।

তাওয়া-ম—পিতলের কড়াহীন (মালসার ধরন) হাঁড়ি বিশেষ। তাওয়া-হু. বর্ধ. মে. পা—রুটি সেঁকিবার লোহার অগভীর পাত্র, চাটু-ক, তই। তাওয়া-ফ. ব—আগুনের মালসা; ইহা বিশেষ ধরনের মাটির হাঁড়ি, ইহার তলায় খুরা থাকে।

তাগাড়, তাগাড়ি—পিতলের গামলা বিশেষ (চরিয়া দ্র)। তাগাড়—চুন সুরকি, সিমেণ্ট, বালি ইত্যাদি মিশাইবার চৌবাচ্চার মত গর্ত বিশেষ [তু তাগার]।

তাড়া-হিজ.—চাল ইত্যাদি রাখিবার মাটির পাত্র (চালের তাড়া)। তাড়া —বাণ্ডিল, গোছা (এক তাড়া নোট)। ব্যস্ততা (যাইবার তাড়া নাই)। ধমক (তাড়া খাওয়া)। **তামারি**-নো.—গামলা বিশেষ।

তারি-ম. জ. কো—তেল ঘি ইত্যাদি মাপিবার মাটির ছোট (এক ছটাকী) পাত্র। প্র. 'এক তারি তেল মাগী কেমনে কেমনে গেল্।'—ঘরকন্নার ছড়া।

তালাই-বর্ধ. বাঁ. বী. মে—খেজুরপাতা, তালপাতা ইত্যাদির আস্তরণ বা পাটি; সাধারণতঃ শোয়া-বসার কাজে ব্যবহৃত হয় (চাটাই দ্র)।

তিউড়ি / তিয়ড়ি-বাঁ. বী—উনন ('তিন নারিকেল দিয়া সাজাইল তিয়ড়ি'—কেক্ষেমা)।

তিজেল-চ [পো tigela]—ডাল ঝোল রাঁধিবার চেপটা ধরনের হাঁড়ি। তৎপর্যায় ঃ—তেলানি, তালানি-মে, চাটুহাঁড়ি-বর্ধ, থেলানি-বী, তাই-মু, পাতিল-পূব, আগৈল-চট্ট, তেইলা-শ্রী, খাপরি / খাবরি-মে. ঢা।

তেপায়া—তিন পা বিশিষ্ট টেবিল (teapoy) বিশেষ, সেপায়া-ম।

তোড়া [আ তুররাহ]—থলি (টাকার তোড়া)। গোছা (ফুলের তোড়া)।

তোলো, তোলোহাঁড়ি-ন. মৃ. য. খু [পো talha]—সাধারণতঃ মাটির যে-হাঁড়িতে ভাত রাঁধা হয়। তৎপর্যায়ঃ—তেওলো-বর্ধ, তৌলা-বী, ডখি / ডুখি-ম. ঢা. ব, রাইন / রাইও-ম. ঢা. ফ।

থলিয়া, থলি—চট কাপড় চামড়া ইত্যাদির তৈয়ারী আধার। নানা কাজে নানা রকম থলি ব্যবহৃত হয়। বাজার করার বা রেশন আনার থলি অর্থে বর্তমানে ব্যাগ (bag) শব্দটির প্রয়োগ খুব বেশী। কাঁধে ঝোলানো থলি —ঝুলি, ঝোলা। টাঁকার থলি—খতি, তোড়া, পোক, গেঁজে, বটুয়া, (money bag)। মোটা কাপড়ের থলি—ধোকড়, ধুকড়ি ('কুন্দলের ধুকড়ি আলাইয়া দিল মুনি'—রারচ)। চটের বড় থলি—থলে, থয়লা, বস্তা, বোরা, ছালা।

থাল, থালা [সং স্থাল/স্থালী, হি থালী, সাঁ থারি, ইং plate]—প্রাধানতঃ ভোজনপাত্র (প্রায়ই ইহা গোলাকার, সমতল ও সামান্য কানাযুক্ত হইয়া থাকে)। মাটি পাথর কাঠ এবং বিবিধ ধাতু দিয়া নানা রকম থালা এবং থালাপর্যায়ের পাত্র তৈয়ার করা হয়। কাঁসার, বগি, কাঞ্চন ও গয়েশ্বরী থালা বিখ্যাত।

থালি—ছোট থালা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববঙ্গের কোন কোন্ সমাজে সাধারণ থালা অর্থে থালি শব্দই অধিক প্রয়োগ করা হয়।

থুড়ি-ম—সঙ্কীর্ণ গর্তের নিম্নদেশ হইতে মাটি উঠাইবার একমাথা খোড়া বংশদণ্ড বিশেষ।

থুতকুড়ি-চ—থুথু ফেলিবার পাত্র, পিকদানি ('থুতকুড়ি, থুতকুড়ি। সতীন বেটী আঁটকুড়ি' ॥—সেঁজুতি ব্রতের ছড়া)।

থেলানি-বী—ডাল ঝোল ইত্যাদি রাঁধিবার চেপ্টা ধরনের হাঁড়ি (তিজেল দ্র)।

দয়েহাঁড়ি-চ. খু—দই-এর হাঁড়ি, যেরূপ হাঁড়িতে সাধারণতঃ দই পাতা হয়। তৎপর্যায়ঃ—কাছলা, কাতারি, দুই-এর ভাঁড়, দই-এর পাতিল।

দা [সং দাত্র, ইং billhook]—প্রসিদ্ধ কর্তনাস্ত্র। দাও দা-এর উত্তর ও পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ। দা নানা প্রকারের। ছোট বড় সাধারণ দা:—দা, কাটারি, কাতি-মু. বী. বাঁ. দি. মা, দাউলি-মু. মে, শোঁদা-বী, হাতদাও-জ. কো। ঘাস ইত্যাদি কাটার দা:—ঘাস্থুড়্যা-বাঁ, ঘাস্থুয়াদাও-জ. কো। পাট কাটার দা:—হাস্থুয়াদাও-জ. কো। খেজুরগাছ তালগাছ ইত্যাদির মাথা চাঁচিবার দা:—হাঁসুয়া/হেঁসো-ক, ছেনি-নো। ধানকাটার দা:—কাস্তে দা-মে, কাচিদাও-উব। মাছ আনাজ-তরকারি ইত্যাদি কুটিবার দা:—বঁটি / বঁটি দা। খড়কাটা দা:—গরসি-উব।

মেদিনীপুরের কোথাও কোথাও কাস্তেকে দা বা কাস্তেদা এবং সাধারণ দাকে কাটারি বলিতে শুনা যায়। ঢাকা অঞ্চলে কাটারি—ছোট দা; আবার কোথাও বড় দা। কাটারি-ম—আনাজ তরকারি কুটিবার একরূপ বঁটি দা।

দাউর, দাগুরা, দারু—জ্বালানী কাঠ (খড়ি দ্র)।

দিয়াশলাই, দেশলাই—দিয়াবাতি, মেচবাতি, আগুনের ভাণ্ডি।

দোন-উব—শস্যাদি মাপিবার পাত্র বিশেষ। অঞ্চলভেদে ইহার ওজনের বিভিন্নতা আছে। রংপুরে এক দোনের পরিমাণ তিনসের, জলপাইগুড়িতে আট সের, পনরো সের—নানারূপ।

দোনা, দোয়নি—দোহনপাত্র (কাঁড়িয়া দ্র)। দোনা—পাতার ঠোঙ্গা (পানের দোনা)। দোনা-বী—গোরুকে জাব দিবার গামলা বিশেষ।

ধামা—শস্যাদি বহন করিবার বা রাখিবার বিস্তৃতমুখ গভীর ঠাসবোনা বেতের পাত্র বিশেষ। ছোট ধামা মাপের পাত্ররূপেও ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায়:—ঢাকি (বাঁশের)-ম. ঢা. মু. উব, খাদা / খাদি-ম, বেতি-মে, ঠাকা-মে, আগৈল-ঢা. ম. ব. নো, আগুল-ফ. শ্রী, খড়া-চ।

ধারি-ম, ধারা-উব—বাঁশের চেঁচাড়ির ঠাসবোনা মুড়িবাঁধা শক্ত আস্তরণ

বিশেষ। ইহা গরীবের মাদুর, তক্তাপোষ এবং ধান্যাদি রৌদ্রে শুকাইবার
চেটাই ইত্যাদি অনেককিছু। ময়মনসিংহে ইহার 'তলই' নামও শুনা যায়।
('ঘরবাড়ী' দ্র)।

ধুচনি, ধুচুনি—চাল ইত্যাদি ধুইবার সচ্ছিদ্র পাত্র, গোচৈ-ফ. ব।

ধুনচি, ধুনুচি [ইং censer]—ধূপধুনা জ্বালাইবার মাটির বা ধাতুর তৈয়ারী
পাত্র, ধুনাতি / ধূপতি-উব. পূব, ধূপচি-মু।

নাগরি-চ—বিশেষ ধরনের ছোট কলসী; ইহাতে সাধারণতঃ গুড় রাখা
হয় (গুড়ের নাগরি)।

নাদা—তলা গোল বিস্তৃতমুখ মাটির পাত্র। তৎপর্যায়ঃ—মেচলা, চাড়ি
(গামলা দ্র)।

পঞ্চপ্রদীপ—একসঙ্গে পাঁচটি আলো জ্বালাইবার একত্র সংবদ্ধ পাঁচটি খুরি বা
প্রদীপ। সাধারণতঃ দেবতার সম্মুখে দীপারতি করিবার সময় এইরূপ প্রদীপে
তেল-ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালা হয়। অনেকস্থলেই ইহার
গঠননৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়। কখনো মনে হয়, যেন একটি নারীমূর্তি
আরতি করিতেছে; প্রকৃত পক্ষে উহা দীপগাছার কাজ করে।

পতিলা—তামার কলাই করা বৃহৎ রন্ধনপাত্র।

পল—লোহার বড় ফোঁড়না। ছেঁচার বা মূলী বাঁশের বেড়ায় বাখারির উপর
দিয়া দড়ি চালাইবার জন্য ছিদ্র করিবার কাজে ইহার প্রয়োজন হয়।
তৎপর্যায়ঃ—ভড় / চুক্কি-পূব। পল [ফা পহলু]—পার্শ্ব, শির (পলকাটা, পল
তোলা)। দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ।

পরাত-উব. পূব [হিং পরাত]—পিতলের কানাউঁচু বড় থালা; ইহাতে
সাধারণতঃ পরিবেষণার্থে অন্নাদি রাখা হয়।

পলারি—হা. হু—কানাউঁচু ছোট থালা।

পসুরি—পাঁচসের পরিমাণ শস্য; ঐ পরিমাণ শস্যাদি মাপিবার পাত্র।
তৎপর্যায়ঃ—পুসোর-বী, পাসারি-ঢা. টা, পাইয়া / পাইরি-ম, পুরুষা-মে, আড়ি /
আড়ী-ম (আড়ি দ্র)।

পাই-বাঁ—শস্যাদি মাপিবার ছোট পাত্র। পাই-দচ—পান বেচাকেনার ক্ষেত্রে
পানের সংখ্যাজ্ঞাপক একটি কথা: ১২০০ পানে ১ পাই। এইরূপ কয়েক পাই
পান একত্র করিয়া এক একটি মোট বা বাণ্ডিল বাঁধা হয়। পাই-ক—আগেকার
১ পয়সার ⅓ অংশ।

পাখা—হাতপাখা, ব্যজনী। তৎপর্যায়ঃ—পাঙ্খা, বিচুন, বিচনী, বিচুনী, বিচইন, বিয়নী, বিউনী, বেনা।

টানাপাখা—চাল বা ছাদের নীচে ঝোলানো পাখা, দড়ি সংযোগে টানিয়া হাওয়া করিতে হয়।

পাছিয়া / পাইছা-ম—বাঁশের শলা এবং বাখারি খোপ খোপ করিয়া বাঁধিয়া তৈয়ারী অর্ধবৃত্তাকার সুগভীর পাত্র। কাঁসারীদের থালাবাসন, কুমারদের হাঁড়িকুড়ি, ঝাঁকামুটেদের মোট সাধারণতঃ এইরূপ পাত্রেই বহন করে। বাংলার বহু অঞ্চলে এবং বাংলার বাহিরে ইহার ঝাঁকা নামও শুনা যায়। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঝাঁকার গড়ন সর্বত্র একরূপ নহে। যেমন, ২৪ পরগনার ঝাঁকা গভীর নয়, পরাত বা বারকোশের মত সমতল, বৃত্তাকার এবং সামান্য কানাযুক্ত।

পাছিয়া-হিজ—চুবড়ি বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—পেছে-মু. বর্ধ, পেচে-ন, পেছ্যা-বাঁ. বী। নদীয়াতে মাছের চুবড়িকেও 'পেচে' বলা হয়। অঞ্চলভেদে ইহাদের গড়নে পার্থক্য আছে। **পাজা**-মু—ঝুড়ি বিশেষ।

পাজাল-ব—ধুনাতি।

পাটখড়ি-ম. ত্রি. শ্রী. পা.—পাটগাছ পচাইয়া ছাল (অংশু) ছাড়াইয়া লইলে যে-কাঠিগুলি থাকে ; পাটকাঠি / পেঁকাটি-ক, পাটশোলা-পা. পূব।

পাটাপুতা—শিলনোড়া দ্র। **পাতনা, পাদন**—গামলা বিশেষ।

পাতিল-পূব—তিজেল জাতীয় মাটির পাত্র। ইহাতে (গরীবের ঘরে) ডাল ঝোল রাঁধে, চালচিড়া ভাজে (খোলা পাতিল), তুষ ঘুঁটের আগুন রাখে (আগুনের পাতিল), দই পাতে (দই-এর পাতিল), হবিষ্য রাঁধে (হবিষ্যের পাতিল)। পাতিল গৃহস্থালির আরও অনেক প্রয়োজন মেটায়। পূর্ববঙ্গে হাঁড়ি এবং তজ্জাতীয় বিবিধ পাত্র বুঝাইতে 'হাঁড়িপাতিল' কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

পাতিল-ফেলা—মৃতাশৌচে রান্নার পুরাতন মাটির হাঁড়িকুড়ি ফেলিয়া দেওয়া। রান্নাঘরে শিয়ালকুকুর ঢুকিলেও নিষ্ঠাবতীরা অনুরূপ কার্যই করেন।

পাথর—পাথরের থালা। তৎপর্যায় :—পাথরা-বী, পাথুরি-পা, পাথৈর-শ্রী. ত্রি। সাধারণ থালা অর্থেও পাথরা শব্দের ব্যবহার আছে ('মাটির পাথরা'—মাটির থালা)।

পাথি—বিক্রেয় দ্রব্য সাজাইবার ঝুড়ি বিশেষ ('চলে রামা পূর্ণ করি পাথি'—কবিক)। মাছের চুবড়ি ('মহামায়া মায়া কর‍্যা মৎস্য ধরে ক্ষেতে। পাথ্যা ধর‍্যা পশুপতি ফিরে সাথে সাথে'—রারচ)। ঠাসবোনা চুপড়ি বিশেষ ('পাথি কর‍্যা খৈ কলা দধি আন্যাছি'—কেক্ষেমা)। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে পাতার এক ধরনের ডালাকেও পাথি বলা হয়। পাথ্যা / পেথ্যা-মে. বাঁ বী, পেথে-ন হা. হু—পাথির বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ।

পালটা-মৃ—মুড়ির চাল ইত্যাদি নাড়িবার পাত্র, খোলা। উল্টা, বিপরীত (-জবাব)। পালটা দেওয়া (ঢেঁকি দ্র)।

পালি-দচ—শস্যমান ; শস্যাদি (প্রধানতঃ চাল) মাপিবার বেতের পাত্র বিশেষ ; এই অঞ্চলে এক পালি চালের পরিমাণ আড়াইসের। খুলনায় আবার এক পালির পরিমাণ পাঁচসের (কুনিকা দ্র)।

পালি [সং পারী]—দোহনপাত্র, পেলে-মু।

পালি-ম—চুমকিগ্লাস (আপখোরা দ্র)। ভাষা বিশেষ।

পিছা-পূব—ঝাঁটা। নারিকেলের কাঠি বা বাঁশের কাঠির ঝাড়ুকে শলাপিছাও বলা হয় (ঝাঁটা দ্র)।

পিঁড়া / পিঁড়ে—দুই এক ইঞ্চি উঁচু খুরাওয়ালা কাষ্ঠাসন, পিঁড়ি। লুচি বেলিবার কাঠের চাকতি, চাকি। ঘরে উঠিবার দরজা সংলগ্ন মাটির সিঁড়ি। বারান্দা, দাওয়া। ঘরের মেঝে। ঝিঁক।

পিড়াল-ব—মাটির বেদী, যাহার উপর হাঁড়ি কড়া বসানো হয়।

পিলসুজ [আ ফতিল সোজ]—তেল-ঘি-এর প্রদীপ, কেরোসিনের ডিবা (লম্প, কুপি) ইত্যাদি রাখিবার দণ্ডের মত আধার বিশেষ। ইহা কাঠের মাটির বা ধাতুরও হইতে পারে। তৎপর্যায়ঃ—দেরকো-চ. খু. বর্ধ. বী, দেলকো-ন. মু. য, দেউড়কা-ফ. ব. নো, চেরাগদান, গাছা-ম. ঢা. ফ. উব, গাইছা-ত্রি, দীপগাছা [সং দীপবৃক্ষ]।

পুরা-ত্রি. নো—কুনকে জাতীয় পরিমাপ পাত্র। ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও 'পুরা' বিঘা কাঠার ন্যায় জমির পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দ (এক পুরা জমি)। প্রাচীন (পুরা কাহিনী)। পূর্ণ (পুরা তিন রোজ)। পূর্ণ হওয়া (আশাপুরা)। পূর্ণ করা, ভরা।

পুষ্পপাত্র—পূজার পুষ্পদূর্বাদি রাখিবার তামার থালা।

পেটরা—ধাতুর বা বেতের তৈয়ারী বাক্স বিশেষ। সেকালের নববধূরা

(গৃহিণীরাও) বাক্স, পেটরা, ঝাঁপি ইত্যাদিতে তাহাদের যথাসর্বস্ব রাখিয়া দিতেন। এইগুলিতে যেমন থাকিত প্রসাধন-সামগ্রী, কাপড়চোপড়, তেমনি থাকিত গহনাপত্র, টাকামোহর। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ধাতুর (প্রায়ই পিতলের) তৈয়ারী যে জিনিষটিকে পেটরা / পেটেরা বলা হয়, তাহার গড়ন সাধারণ বাক্স তোরঙ্গের মত নহে,—ঢাকনিযুক্ত বেতের ঝাঁপির মত। ইহাতে কব্জার সাহায্যে পৃথক তালাও লাগানো যায়। এই পেটরায় কাপড়চোপড় রাখিবার স্থান নাই ; 'আশীর্বাদী' টাকামোহর, গহনাগাঁটিই ইহাতে থাকে।

পোয়াল-খু—বড় ঝুড়ি বিশেষ। পোয়াল-মু. ন. উব [সং পলাল]—আউশের খড় (পোয়ালের পুঞ্জি-উব)।

প্রদীপ (পিদিম, পিদ্দিম, পিরদিম, পিরতুপ, পরদীপ)—দীপ, আলো। মাটির বা ধাতুর ঠোঁটওয়ালা (প্রায়ই) খুরি যাহাতে তেল ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া আলো জ্বালানো হয়। এইরূপ খুরির বা পাত্রের স্থানভেদে নানা নাম শুনা যায় ঃ ডেলুই-বী, ডিয়ারি-জ. কো. রং, মুছি-পূব, মুচি-পব, মূষা, চেরাগ, চাটা-শ্রী, টাঠি / খুলি-খু, মল্লিকা-ম. ঢা. পা।

বগুনা / বউগনা-পা.ম [হি বরগুনা]—তিজেল ধরনের পিতলের রন্ধনপাত্র (বিধবারাই অধিক ব্যবহার করে)। বোগনো-হু. বর্ধ, বোগনোহাঁড়ি-চ. ন. মে, বোকনা-ফ. ব, বোকন্যা-পা।

বঁটি, বঁটিদা [সং বিণ্টি], পনিক-হিজ—মাছ তরকারি ইত্যাদি কুটিবার অস্ত্র বিশেষ। কুটিবার সময় দা-এর ন্যায় এই অস্ত্রটি হাতে লইতে হয় না, যাহা কুটিতে হইবে তাহাই হাতে লইয়া ইহার মুখে ফেলিতে হয়। লোহার ফলাটি কাঠের পাটার একদিকে হেলানো অবস্থায় বসানো থাকে, সেই পাটায় বসিয়া কাটাকুটা করিতে হয়।

বটুয়া—কাপড়ের ছোট থলি বিশেষ ; ইহা কোমরে গুঁজিয়া রাখা যায়। বট্যায়া বটুয়ার পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ। বট্যিয়া-ব—শস্যাদির মাপ বিশেষ। মাপের পাত্র। কোথাও এক বট্যিয়া ধানের পরিমাণ চৌদ্দসের।

বদনা—গাড়ু বিশেষ। **বাউলি / বাওলি**—(বেড়ি দ্র)।

বাজরা-চ—বাজারে কৃষিপণ্য বহন করিবার বড় ঝুড়ি বিশেষ। বাজরা [সং বজ্রা]—শস্য বিশেষ। বুকের পাশ (বাজরায় ব্যথা)।

বাটা—পানের বাটা, যে-পাত্রে সাজানো পান রাখা হয়। ইহা সাধারণতঃ দুই রকম দেখা যায় ঃ বাটির মত এবং রেকাব বা ছোট থালার মত। প্রথমোক্ত

বাটায় দুইটি বাটি থাকে, কৌটার মত একটি দিয়া আর একটি ঢাকা যায়। পল্লীগ্রামে কানাউঁচু বা সামান্য কানাযুক্ত ছোট থালার আকার বাটারই অধিক প্রচলন। কোথাও (মে) ইহাকে 'পান থাল', কোথাও বা (মু) 'বিরিদান' বলিতে শুনা যায়।

বাটা—ষষ্ঠীর বাটা; ষষ্ঠীব্রতের (জামাই ষষ্ঠী) তত্ত্ব, যাহা জামাতাকে (জামাতার অভাবে পুত্রকে) দেওয়া হয়।

বাটা (বাট্টা)—ন্যায্যমূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া হয়, discount. বাটা —পেষণ করা (মশলা বাটা)।

বাটি—প্রধানতঃ তরল দ্রব্যাদি রাখিবার, দই দুধ টক ইত্যাদি খাইবার বিস্তৃতমুখ গভীর পাত্র। বাঙ্গালীর সংসারে নানা নামের নানারকম বাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, জামবাটি, জামখোরা—কাঁসার বড় বাটি। খাদা, খোরা, পাথুরি—পাথরের বাটি। কাপ, পিয়ালা / পেয়ালা, কাচন, কাতারি, কুটুরি, গীনা, খুরি, খুটি—নানাকাজে ব্যবহৃত নানাধরনের ছোট বাটি। কাঠুরা, কাঠুরি, কেঠো—কাঠের বাটি। এই সকল বাটির আরও পরিচয় বর্ণানুক্রমে দেওয় হইয়াছে।

বাড়ুন / বাড়োন [হি বঢ়নী]—উলুখড়, ঝাউপাতা, খেজুরপাতা ইত্যাদির ঝাড়ু (ঝাঁটা দ্র)।

বাতি [সং বর্তিকা]—বাতি শব্দের মূল অর্থ পলিতা; কিন্তু বাংলায় প্রদীপের আলো, কেরোসিনের আলো, মোমের আলো, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি নানা শ্রেণীর আলো অর্থে বাতি শব্দ বহুপ্রচলিত। সাঁঝবাতি, সন্ধ্যাবাতি—সন্ধ্যায় তুলসীতলে কিংবা গৃহ-দেবতার স্থানে তেল-ঘিতে পলিতা সিক্ত করিয়া মাটির বা ধাতুর খুরিতে যে-আলো জ্বালা হয়। কেরোসিনের বাতি—লণ্ঠনে বা ডিবাতে (লম্প, কুপি) কেরোসিনের যে-আলো জ্বালা হয়। বাতি—কাঠের (প্রায়ই শালের) খুঁটি।

বাদিয়া-মু—কাঁসার মাঝারি বাটি, কাব।

বারকশ / বারকোশ—কাঠের বড় থালা। তৎপর্যায় :—খুঞ্চি-ক, খাঞ্চা-মু. মে, খঞ্চা-ম. ত্রি. শ্রী, পাটা-ন, বাটা-নো। সাধারণতঃ এইরূপ থালায় বৈবাহিক তত্ত্বাদি পাঠানো হয়, ময়রারা ছানা-ময়দা ডলে।

বারা, বারি (ঘট দ্র)।

বালিশ—উপাধান, pillow. মাথা রাখিবার বালিশ—মাথার বালিশ, শিয়রের

বালিশ, শিথান-পূব. উব। পাশে রাখিবার বালিশ—পাশবালিশ, কোলবালিশ-পূব। হেলান দিয়া বসিবার বালিশ—তাকিয়া।

বিচুন—(পাখা দ্র)। বীজ ধান ইত্যাদি।

বিছানা—শয্যা, শেজ (শেজ তুলনি), শেইজ-ফ. ব, শেজা / বিছানি-জ. কো। বিছানা পাতা,-পাড়া,-করা,-তোলা—কথাগুলি বহুপ্রচলিত।

বেড়ি-ক—রান্নার ডেকচি, হাঁড়ি ইত্যাদি বেষ্টন করিয়া ধরিবার যন্ত্র বিশেষ। তৎপর্যায় :—বাউলি / বাওলি-পূব. ত্রি পা, অলতিয়া-রং, বাউনি / চৌটো-জ. কো. ত।

বেলন, বেলনা, বেলুন [সং বেল্লন]—লুচি ইত্যাদি বেলিবার গোলালো কাষ্ঠদণ্ড (বেলুন-চাকি, পিঁড়ে-বেলুন), বেলাইন-ম।

বেলি—কানাউঁচু ছোট থালা (কাঁসি দ্র)। বেলফুল।

বেসালি-য. খু [পো vasilha]—দুধের বড় পাত্র।

ভরক-ম—মনসার ঘট বিশেষ (ঘট দ্র)। ভড়ক—বাহাড়ম্বর।

ভাঁড় [সং ভাণ্ড]—ছোট কলসী ; কলসী জাতীয় মাটির ছোট পাত্র। তৎপর্যায় :—নাগরি-চ (গুড়ের), খুলি-চ, ঠিলি-ন, ডাবরি-দচ, কোঁপা-হিজ। রসের জন্য খেজুর গাছে, তাল গাছে ভাঁড় বাঁধে। গ্লাসের মত আর এক শ্রেণীর ভাঁড়ে আমরা জল খাই, চা খাই, ময়রারা দই পাতে। নাম এক হইলেও তাড়ির ভাঁড়ে এবং দইয়ের ভাঁড়ে আকারগত পার্থক্য আছে।

ভাঁড়—নাপিত যে আধারে করিয়া ক্ষুর কাঁচি ইত্যাদি বহন করে।

ভাঁড়—[সং ভণ্ড] বিদূষক, clown (গোপাল ভাঁড়)।

ভেটুয়া / ভেট্যায়া-ম—মালসাজাতীয় মাটির পাত্র। তৎপর্যায় :—ভাঁড়-হু, ঝুনক্যা-মু. পা, খুটি-য. খু. ঢা। এই সকল পাত্রে রান্নাঘরে মসলাদি রাখা হয়, রাঙ্গামাটি গুলিয়া ঘর নিকানো হয়, দই পাতে এবং এইরূপ আরও অনেক ছোটখাট কাজ চলে।

মটকা, মটকি, মাইট, মাঠী—(জালা দ্র)।

মন্থনী—মন্থনদণ্ড, দধিমন্থন করিবার ফাঁদলমুখ বংশদণ্ড বিশেষ। সাধারণতঃ বাঁশের সরু অগ্রভাগ দিয়া ইহা তৈয়ার করা হয়। মোথুনী মে. মু, মাথানী-বাঁ, মউনী-হু, মথৈন-ঢা. টা, মাথনঘুরা-ম, ময়াকাটি-খু, চড়কি-ব, ঘেট-জ।

মন্থনঘটী—দধি মন্থন করিবার পাত্র (প্রায়ই মাটির)। তৎপর্যায় :—কুর / লালুয়া-ম।

মাজাইর-ত্রি—মাঝারি হাঁড়ি। তৎপর্যায় :—বাটখারা তাই-চ, আনতি-চট্ট।

মাদুর—তৃণপত্রাদি নিমিত আস্তরণ। মসলন্দ / মছলন্দ—সূক্ষ্ম বোনা ও কাজকরা মাদুর বিশেষ; মেদিনীপুর অঞ্চলে উৎকৃষ্ট মছলন্দ তৈয়ারি হয়।

মালসা—অর্ধবৃত্তাকার সাধারণ হাঁড়ি। যেমন, আগুনের মালসা, হবিষ্য রাঁধার মালসা, টক পরিবেশনের মালসা।

মুচি-ক, **মুছি**-পূব. উব [সং মূষা, হি ঘরিয়া, ইং crucible]—টাঠি-মে. খু, মাটির গোলাকার ঈষৎ গভীর ছোটপাত্র। ইহাতে ধাতু গলায়; তেল ঘি ও সলিতা দিয়া আলো জ্বালে; ইহা কলসী ইত্যাদির ঢাকনি রূপে ব্যবহৃত হয়; কৃষকেরা এই ধরনের পাত্রে ঘনীকৃত রস ঢালিয়া 'মুচিগুড়' করে। (প্রদীপ দ্র)।

মেচলা-চ—তলাগোল বিস্তৃতমুখ মাটির বৃহৎপাত্র (গামলা দ্র), তাড়-মে।

মেটে—(জালা দ্র)। মাটির তৈয়ারী (মেটে কলসী)। মাটির মত (মেটে রং)। মেটুলি (পাঁঠার মেটে)।

রামদা / রামদাও-পূব—তরব্বারির মত লম্বা মাথা ঈষৎ গোল বৃহৎ দা বিশেষ। সাধারণতঃ শত্রুকে আক্রমণ করিতে কিংবা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থে এই শ্রেণীর দা ব্যবহৃত হয়।

রেক-চ—শস্যাদি মাপিবার বেতের ছোট পাত্র (কুনিকা দ্র)।

রেকার—[হি রেকাবী / রকেবী / রিকেবী, ইং dish] ধাতুর তৈয়ারি ছোট থালা বিশেষ, কিন্তু ইহাতে ভাত খাওয়া হয় না, সাধারণতঃ ফলমূলাদি খাওয়া এবং পূজার ভোগনৈবেদ্যাদি দেওয়া হয়। রিকার-পূব।

রেচা-পূ—যূপকাষ্ঠ (হাড়িকাঠ দ্র)।

লণ্ঠন [হি. সাঁ লালটেন, ইং lantern]—হাওয়া বাতাস হইতে প্রদীপাদির আলো রক্ষা করিবার কাঁচাবরিত আধার (case) বিশেষ (প্রায়ই চতুষ্কোণ)। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরী লণ্ঠন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঝাড়লণ্ঠন, ঝাড়বাতি—ঝাড়ের আকারে বিন্যস্ত বিশেষ ধরনের লণ্ঠন, যাহাতে একসঙ্গে বহু আলো জ্বালাইয়া আলোর ঝাড় সৃষ্টি করা হয়। সেকালে ধনী জমিদারদের প্রাসাদাদি উৎসব অনুষ্ঠানে বেলোয়ারী ঝাড়ের আলোতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

লম্ফ-চ. ন. মু. বর্ধ. মে. য. খু—পেটমোটা সরুগলা কেরোসিনের ডিবা বা চিমনিহীন ল্যাম্প (lamp) বিশেষ। তৎপর্যায় :—কুপি / কেরোসিনের কুপি-পা. ম. ঢা. ফ. ব. নো. ত্রি. শ্রী, ডিবা / ডিবে, টেমি-চ,।

ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও 'করোসিনের দোয়াইত' (দোয়াত) কথাটিও শুনা যায়।

লাই-নো—বড় ধামা; ইহাতে একমণ ধান ধরে। রাই, সরিষার প্রকারভেদ।

লাফনা-য. খু—খুন্তি, ভাজাকাঠি।

লুছনি-ম—হাঁড়ি কড়াই মোছার পাটের পুঁটুলি, নেচা-জ. কো।

লুড়ি-ম—ঘর লেপিবার পাটের পুঁটুলি, নেচা / নেথানি-জ. কো।

লোয়ারা-ম—লোহার কড়াই।

শরা, সরা [সং শরাব / সরাব]—বিস্তৃতমুখ ঈষৎগভীর মাটির পাত্র, যাহা সাধারণতঃ হাঁড়ি-কলসীর ঢাকনি রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ শরায় যখন দেবতার উদ্দেশে, ফলমূলাদি উপকরণসহ আমান্নের নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তখন তাহাকে বলা হয় '**পূর্ণপাত্র**'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে শরার তলদেশে গোলাকার খুরা থাকে এবং সেগুলি উপুড়-করা ঢাকনিরূপেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

আমশরা / আমাশরা-রাঢ়, আওয়াশরা-পূব—আধাপোড়া বা কাঁচামাটির শরা ('নৃত্য করে সুন্দরী আওয়া সরাতে ভর দিয়া')।

লক্ষ্মীশরা—লক্ষ্মীমূর্ত্যাদি অঙ্কিত বহুখ্যাত শরা। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে এই শরাতে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

শানকি—মাটির থালা, অনেকটা কাঁসির মত।

শিকা / শিকে [সং শিক্য]—দ্রব্যাদিপূর্ণ হাঁড়িপাতিল শিশিবোতল তুলিয়া রাখিবার দড়ির ঝুলন্ত আধার বিশেষ। ইহা ঘরের আড়, আড়া, পাড় ইত্যাদি হইতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কাঁথাশিল্পের ন্যায় শিকাশিল্পও এক সময়ে বঙ্গ পল্লী-রমণীদের শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। ছিকিয়া-জ. কো, ছিকা-পা, ছিক্যা-ম।

শিলনোড়া-ক—মশলাদি পেষিবার পাথরের সরঞ্জাম;—দুইখণ্ড পাথর, একখণ্ড আয়তাকার চেপ্‌টা, একখণ্ড মুষলাকার গোলালো। তৎপর্যায় :—শিলপাটা-ম. ত্রি. জ. কো. দি, পাটাপুতা-পা. ঢা. ফ. ব, পাটাপুতাইল-শ্রী, হাতাহুতা-নো।

গৃহ-সংসারের এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটির 'শিল', 'পাটা' ও 'নোড়া' অংশগুলির সনাক্তকরণে প্রায়ই বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে হাসাহাসির সৃষ্টি হয়। যে-চেপটা পাথরের উপর মশলাদি পেষণ করা হয়, তাহাকে রাঢ় ও গাঙ্গেয় অঞ্চলে 'শিল' এবং যে-গোলালো পাথর দিয়া পেষণ করে, তাহাকে

'নোড়া' বলে। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে এই নোড়াকে বলা হয়—'শিল', কোথাও 'পুতা', কোথাও বা 'পুতাইল' এবং শিলকে বলে 'পাটা'। হিজলিতেও নোড়ার 'পুতা' নাম শুনা যায়।

শোঁদা—দা বিশেষ (দা দ্র)। **সটকা**—আলবলা ইত্যাদির নল।

সরতা-ব [হি সরৌতা, ইং nut cracker]—জাঁতি, ছরতা।

সামটা-জ. কো—নারিকেলের বা বাঁশের শলির ঝাঁটা।

সামাতি-ঢা—বাঁশের ফুঁড়নি-চ, সামাজি-পা, সাপাতি-ম। খড়ো চাল ছাওয়ার সময় বাড়ুই উপরে থাকে এবং যোগানদার নীচে থাকিয়া এই ছুঁচকাঠির সাহায্যে তাহাকে বাঁধনদড়ির যোগান দেয়।

সের-পা. ম. ঢা. ফ. ব. মে—চাল ইত্যাদি মাপিবার বাঁশের বা বেতের ছোট পাত্র বিশেষ ; একসেরী পাত্র। ওজন বিশেষ।

হাঁড়ি [সং হণ্ডী, হণ্ডিকা, হি হঁড়া,]—নানা ধরনের পাকপাত্র। কিন্তু প্রধানতঃ পাকপাত্র হইলেও হাঁড়ি দ্বারা অপর বহুবিধ কার্য নিষ্পন্ন হয়। বিভিন্ন গড়ন ও কার্যক্ষমতা অনুযায়ী হাঁড়ির নামের অন্ত নাই। (বর্ণানুক্রমে তাহাদের কয়েকটির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে)। হাঁড়া, ছুনিহাঁড়ি-চ—বড় হাঁড়ি। প্র. 'ভীম বলে জানবি যখন ভাঙ্গ্যা দিব হাঁড়া'—রারচ। এখানে বাগদিনীর মাছ রাখিবার মাটির বড় হাঁড়িকে 'হাঁড়া' বলা হইয়াছে।

হাড়িকাঠ / হাড়কাঠ-ক—যূপকাষ্ঠ, খাঁজকাটা কাঠের খুঁটি যাহাতে ছাগমহিষাদি বলি দেওয়া হয়। তৎপর্যায় :—হাড়ী-বর্ধ, অড়গড়ি-মে, অর্গলি-হিজ, রেচা-পু, কাতলা-য. পা. টা, কাপি-ম, আড়গড়া-ঢা, কাঠগড়া-ম. ব।

হাতা [সং দর্বী, হি করছুল, ইং ladle]—হাতের মত পাত্র বিশেষ।
হাতা নানা প্রকারের :—তাম্বস্, চামচেহাতা—চামচের গড়ন ছোট হাতা। ডাড়ু—কাঠের হাতা। বেলাইন—শুকনা শামুক বা তালের আঁঠির তৈয়ারি হাতা। ওড়োং—নারিকেলের মালার হাতা। ছানতা, ঝাঁজরি—সচ্ছিদ্র হাতা।

হাতুয়া, হাতন—দোহনপাত্র (কাঁড়িয়া দ্র)।

হারিকেন [ইং hurricane]—লণ্ঠন বিশেষ ; ইহার ভিতরেই কেরোসিনের আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে। হারিকেল-পূব—হারিকেনের উচ্চারণভেদ।

হুঁকা / হুঁকো [আ হুক্কা, ইং hubble-bubble]—তামাক খাইবার নারিকেলের খোল এবং নলিচার তৈয়ারি যন্ত্র (instrument) বিশেষ। হুকা / হুক্কা-পূব, উক্কা-ম, ভরকা-হিজ, ডাবা (বড় খোলের সাধারণ হুঁকা)।

সাধারণ হুঁকায় তামাক খাইবার সময় উহা হাতে উঠাইয়া লইতে হয়। কিন্তু সৌখীন লোকদের ফরসি / ফুরসি, গুড়গুড়ি, গড়গড়া, আলবলা প্রভৃতি নামের বিশেষ ধরনের হুঁকাগুলি হাতে উঠাইতে হয় না, মাটিতে বসানো থাকে। ইহাদের খোলের (প্রায়ই ধাতুনির্মিত) সঙ্গে লম্বা নল ও পাইপ লাগানো হয় ; নল, নইচা, খোল সবই নানারূপ কারুকার্যমণ্ডিত থাকে। কোনো কোনোটির গঠন-নৈপুণ্য এমনই যে, মজলিসে বসিয়া একটি দ্বারাই একসঙ্গে চারপাঁচ জনে ধূমপান করিতে পারে। চা-সিগারেট সর্বগামী হইলেও দূর গ্রামাঞ্চলে এখনো ভদ্রতা রক্ষায়, অতিথি অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নে পান-তামাক পরিবেশিত হয়। হুঁকার সাহায্যে ধূমপান করা—তামাক খাওয়া, হুঁকা খাওয়া। হুঁকা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের একটি ধাঁধা : 'অতটুকু পুষ্কুনিখান কই-এ উর্ উর্ (হুড় হুড়) করে। রাজা আইয়ে বাদশা আইয়ে তুল্যা সেলাম করে ॥' হুঁকা বন্ধ করা—সমাজচ্যুত করা।

হুঁকাবরদার—বড়লোকদের হুঁকাবাহক, তামাক সাজাইবার ভৃত্য। নলিচা/ নলচে-ক, নৈয়চে-বী, নইলচা / নইচা-পূব—হুঁকার খাঁজকাটা নল, যাহার উপর কলিকা বসে।

ছিঁচকা—হুঁকার নলিচা পরিষ্কার করিবার লোহার সরু কাঠি বিশেষ। তৎপর্যায় :—শিক-ম. ঢা. বর্ধ. মে, ছিলুমের কাঁটা / হুঁকার কাঁটা-ব. ফ, গঙ্গ-নো। ছিঁচকা চোর—যে ছিঁচকার ন্যায় অতি সামান্য জিনিষও চুরি করে।

কলিকা (কইলকা-পূব, কলকে-ক, কোলগ্যা-মু. পা, কল্কি-ম), চিলুম-বী, ছিলিম-ন. দি. মা, ছিলুম-ফ. ব. ম [ফা চিলম]—কল্কে ফুলের আকৃতি বিশিষ্ট মাটির পাত্র, যাহা নলিচার মাথায় বসে এবং যাহাতে তামাক টিকা সাজাইয়া দেওয়া হয়। গুল—তামাকপোড়া কয়লা বা ছাই।

কলিকার ছিদ্রপথে মাটির একটি গোল টুকরা বা চাকতি রাখিয়া তাহার উপর তামাক সাজাইতে হয়। এই টুকরা বা চাকতিকে বলা হয়—ঠিকরা, ঠিকরি / ঠিকরে-চ. ন. মু. বধ. বাঁ. বী, গুটি-মে, ত' / তোয়া / টোয়া-পূব।

কাঁই—তামাক খাওয়ার পর হুঁকার নল ও নইচার মুখে কল্কির ভিতরে আঠার মত যে ময়লা জমে।

বৈঠক—হুঁকা রাখিবার আধার। তোবরা-মা—পাতা বুনিয়া তৈয়ারি একরকম পাত্র, যাহাতে করিয়া চাষীরা মাঠে তামাক-টিকা লইয়া যায়। কোথাও বাঁশের চোঙ্গায়, কোথাও বা লাউয়ের খোলায় (লাউয়া) এই কাজ করা হয়, সঙ্গে খড়ের বেণী কিংবা আগুনের মালসাও থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাষ-আবাদ

৩১ চাষাভূষা ও চাষবাসের প্রচলিত প্রথা

আইদারী, আইদোর—ভাগচাষী (বর্গাদার দ্র)।

আগত্রা-মে—বর্গাপ্রথা বিশেষ। এই প্রথানুযায়ী জমির মালিক এক বৎসরের সম্পূর্ণ ফসল দেওয়ার সর্তে চাষীর নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট মূল্য অগ্রিম লইয়া থাকে। আগত্রা—অগ্রিম, advance (আগত্রা টাকা)।

আগোলদার—জমির ফসল আগলানোর কাজে সাময়িকভাবে নিযুক্ত বেতন-ভোগী লোক।

আধহালা-পূব—আধাইল্যা চাষ, আধহাল বা এক বলদের চাষ (ঝাঁটায় চাষ দ্র)।

আধি, আধিবর্গা—উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক জমির মালিকে এবং অর্ধেক ভাগ-চাষীতে পাইবে,— এইরূপ সর্তে চাষ-আবাদের প্রথা। তৎপর্যায় :—**আধাভাগো,** আধিভাগ।

আধিদার, আধিভাগী, আধিয়ার—বর্গাদারের বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম।

উটবন্দী, ওটবন্দী-ন—চাষবাসের জন্য চাষীর সহিত জমির মালিকের মেয়াদী বন্দোবস্ত বিশেষ। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোনও চাষী (ওটবন্দী চাষী) দীর্ঘদিন এক নাগাড়ে কোনও জমি চাষ করিবার অধিকার পায় না। নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে তাহাকে জমি ছাড়িয়া দিতে হয়।

উধারি-ম—নজর-ঢা. ফ. ব। বর্গাদারের শৈথিল্যে ফসলের ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য জোতদার অনেক সময় বর্গাচাষীর নিকট হইতে কিছু টাকা অগ্রিম লয় ; ফসল নষ্ট না করিলে এই টাকা যথাসময়ে ফেরত দেওয়া হয়।

কামলা—পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে চাষে বা অন্য কাজে নিযুক্ত নানা শ্রেণীর শ্রমিক অর্থে কামলা শব্দটি বহুপ্রচলিত ('ঘরবাড়ী' অধ্যায় দ্র)। ক্ষেতকামলা—কৃষি-শ্রমিক, ক্ষেতমজুর।

কামিন-মে—কৃষিকার্যে নিযুক্ত নারী-শ্রমিক। চাকরানী, ঝি।

কিরান-ব—ক্ষেতমজুর। **কিসান**—(কৃষাণ-এর রূপভেদ) চাষী। হিন্দীতেও 'কিসান' বহুপ্রচলিত ('জয় কিসান জয় জোয়ান')।

কৃষক, কৃষাণ—কৃষিজীবী, যে প্রধানতঃ কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তৎপর্যায়ঃ—চাষী, চাষা, হালিয়া-পূব, হাইল্যা-পা, হাইলা-টা. ঢা, হাল্যা-মে ('কোথা হাল্যা কোথা হেল্যা কোথা বা ন্যাঙ্গল'—রারচ॰), হালী, হালুয়া-ম. ঢা. উব ('হাল বাও হালুয়া ভাইরে হাতে সোনার লড়ি।'), হেলুয়া-বাঁ. বী, হেলো-ন, হালুচা-শ্রী, লাঙ্গলিয়া / লাঙ্গল্যে / লাঙ্গুল্যে, cultivator.

কৃষকদের মধ্যে নানারকম শ্রেণীবিভাগ আছেঃ কেহ কেহ একাধারে কৃষক এবং মালিক (owner cultivator) দুই-ই ; ইহাদের অনেকেরই অল্প-বিস্তর জমিজমা আছে, ইহারা নিজেরাই নিজেদের জমিতে লাঙ্গল দেয়, ফসল উৎপাদন করে এবং কৃষির উপস্বত্বই ইহাদের আয়ের প্রধান উৎস। আবার কেহ কেহ কৃষিজমির মালিক হইলেও তাহারা নিজ হাতে ভূমি-কর্ষণ তথা কৃষিকার্য করে না। ইহারা প্রকৃতপক্ষে কৃষক নহে, প্রধানতঃ জোতদার (owner, but not cultivator); ইহারা প্রায়ই ভাগচাষী বা লাগাড়ে মুনিষ (স্থায়ী শ্রমিক) দ্বারা নিজেদের জমি চাষ করায়। কিন্তু নিজ হাতে লাঙ্গল না ধরিলেও যেসকল জোতদার সরেজমিনে থাকিয়া চাষ-আবাদের তদারক করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য জমির আয়ের উপরই বেশী নির্ভর করে, তাহাদিগকে কৃষকশ্রেণী হইতে একেবারে পৃথক করা যায় না। ইহাদিগকে জোতদার কৃষক বা অভিজাত কৃষক বলা যাইতে পারে।

বাংলাদেশে অধিকাংশ কৃষকেরই নিজস্ব চাষের জমি আদৌ নাই, থাকিলেও উহার পরিমাণ অতি সামান্য। ইহাদের কেহ **বর্গাদার,** কেহ বা **ক্ষেতমজুর** হিসাবে অপরের জমিতে চাষবাস করে। যাহারা অপর সম্পন্ন কৃষক বা জোতদারের জমিতে কৃষিকার্য করিয়া উৎপন্ন ফসলের ভাগ পায় বা নেয় তাহাদিগকে বর্গাদার, ভাগচাষী, আধিয়ার প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করা হয়। ক্ষেতমজুরেরাও অপরের ক্ষেতেখামারে কাজ করিয়া ফসলাদি উৎপাদনে সহায়তা করে, কিন্তু বর্গাদারের ন্যায় তাহারা সেই ফসলের কোনও ভাগ পায় না। তাহাদিগকে রোজ, মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়। এই মজুরি টাকায় বা ফসলে, কখনো বা দুই প্রকারেই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে টাকায়) দিতে দেখা যায়।[১৮] বর্গাদার বা ক্ষেতমজুর শ্রেণীর চাষীর আবাদী ভূমির উপর কোনও স্বত্বস্বামিত্ব বর্তায় না। (বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর দ্র)।

ক্ষেতমজুর—(খেতমজুর দ্র)। **খাটুনে**-মু, **খাটুয়া**-য—যে খাটিয়া খায়, শ্রমিক

খেতমজুর, ক্ষেতমজুর—যে মজুরি নিয়া অপরের জমিতে চাষ-আবাদের কাজ করে, কৃষিশ্রমিক (কৃষক দ্র)। ক্ষেতমজুরদের যাহারা ধান দাওয়ার বা কাটার কাজ করে তাহাদিগকে বলা হয়—দাওয়াল-ম, দাওয়ালে-খু, দাওয়াউল-শ্রী, দাঐল-ক. ব। যাহারা ক্ষেতের ঘাস বাছা বা নিড়ানের কাজ করে, তাহারা বাছাউল-ব। যাহারা রোয়া লাগায় তাহারা বইট্যাল-ব। সারা বৎসরের জন্য বাঁধা বেতনে নিযুক্ত ক্ষেতমজুর বা অন্য সাধারণ শ্রমিক—নাগাড়ে, লাগাড়ে মুনিষ-মু, ভাতুয়া-মে., মাইন্দার, মান্দ্যা-রাঢ়, বছরিয়া কামলা-ম। নাগাড়ে মুনিষকে চাষবাস, গোসেবা, হাটবাজার ইত্যাদি প্রায় সব রকম কাজই করিতে হয়। সে বেতন (টাকায় বা ফসলে দেয়) ছাড়াও খোরাক পোষাক (দুইবেলা আহার, জলখাবার, দুই একখানা কাপড়, গামছা) পাইয়া থাকে। যাহারা রোজ হিসাবে বেতন নিয়া চাষে বা অন্যকাজে নিযুক্ত হয়, তাহারা মুনিষ, জন, বদলা, বেরুনিয়া, খাটুনে, খাটুয়া, কামলা, ছুটো, নগদা। প্রধানতঃ কৃষিকার্যে নিযুক্ত নারী শ্রমিক—কামিন-মে। যে শ্রমিক আক্রার সময়ে ধান কর্জ নিয়া ফসলের মরশুমে শ্রম দ্বারা অর্থাৎ মজুরি খাটিয়া তাহা শোধ করে তাহাকে দাদনী বলা হয়। অন্য সাধারণ মুনিষরা যে হারে মজুরি পায়, দাদনীদের মজুরির হার তাহার চেয়ে কম দাঁড়ায়। যেহেতু কর্জ দেওয়া ধানের মূল্যের সহিত তাহার সুদের অঙ্কটাও দাদনীর দায় বলিয়া ধরা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত বেশী।

খেসকামলা-ম—এমন অনেক চাষী বা জোতদার আছে যাহাদের লোকবল নাই, ধনবল আছে। কিন্তু চাষবাসের কাজে অনেক সময় এমন 'বতোর' বা জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও 'জন' পাওয়া যায় না, অথচ অগৌণে কাজটি সম্পন্ন না করিলেই নয়। এমতাবস্থায় সেই চাষী বা জোতদারের অনুরোধক্রমে পাড়াপড়শী এবং আত্মীয়স্বজন কয়েকজন মিলিয়া সময় মত তাঁহাকে শ্রমদানে সাহায্য করে। আত্মীয়কুটুম্ব হইতে আগত এই শ্রমিকগোষ্ঠীকে 'খেসকামলা', 'মাগনী-কামলা', 'উপরিদা লোক', 'ভেট-বেগার' ইত্যাদি বলা হয়। ইহাদিগকে কোন টাকা-পয়সা দেওয়া হয় না, কিন্তু এক বেলা যথেষ্ট সম্মান ও আদরের সহিত ভূরিভোজন করানো হয়। কুটুম্ব অর্থে 'খেস' শব্দটি মুসলমান সমাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

গাছি—বড় বড় গাছ হইতে ফল পাড়িয়া বা গাছ কাটিয়া ছাঁটিয়া যাহারা

পারিশ্রমিক বাবদ ফলের ভাগ বা নগদ (cash) কিছু পায় বা নেয়; গাছুড়ে। গাছি—গাছা, খণ্ড, টা (একগাছি চুল, একগাছি দড়ি)। গাছি—ঘাস (গাছি মারা-মে—ঘাস উৎপাটন করা)।

গাঁতা / গাঁতো-চ. ন. মু. মে, **গাঁতি**-বাঁ. বী—কোনও কার্য সম্পাদনের জন্য বহু জনের মিলন। কৃষিকাজ এবং এইরূপ আরও অনেক কাজ আছে, যাহাতে বহু লোকের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্য লইতে হয়। এজন্য যাহার নিজের খাটিবার লোক কম, অথচ চাকরবাকর রাখিবারও অর্থসংস্থান নাই, সেখানে সে সমযোগ্যতাসম্পন্ন অপর কয়েকজনের সঙ্গে একটি দল গঠন করে। এই দলের সকলে এক সঙ্গে পালাক্রমে এক একদিন এক একজনের কাজ করিয়া দেয়। এইরূপ যৌথ কার্যক্রমকে গাঁতা, গাঁতো বা গাঁতি কাজ বলা হয়। ময়মনসিংহে কৃষিসংক্রান্ত এইরূপ মিলিত কর্ম প্রচেষ্টা সাঙ্গার / হাঙ্গার নামে অভিহিত হয়। গাঁতি-ক—শক্ত মাটি খুঁড়িবার দু-মুখা অস্ত্র, pick।

গিরি-উব—গৃহকর্তা, জমি বা বাড়ীর মালিক। পর্বত। হিমালয় (গিরিজায়া—হিমালয় পত্নী)।

গুলাচাষ / গুলোচাষ-দচ—জমিতে এক বা একাধিক যে পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হউক, কিংবা কিছুমাত্র না হউক, চাষী কর্তৃক জমির মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বুঝাইয়া দিবার সর্তে চাষ-আবাদের প্রথা। এইরূপ চাষে মালিকের কোনও দায়িত্ব নাই; হাল গোরু বীজ সকলই চাষীর; বেশী ফলাইতে পারিলে চাষীরই লাভ, মালিক পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী দাবি করিতে পারে না। বরিশালের কোথাও কোথাও প্রায় অনুরূপ প্রথাকে 'ধানকরালি' বলে। (চুক্তিবর্গা দ্র)।

ঘাসী, ঘাসেড়া—গোরু-ঘোড়ার ঘাস কাটিয়া বা ঘাস ফেরি করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

চাষা, চাষী—কৃষক, কৃষিজীবী, যে চাষ করে। চাষা এবং চাষী একার্থক হইলেও চাষা কথাটি ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় গ্লানি প্রচারেই অধিক প্রযুক্ত হয়। যেমন, লোকটা একেবারে চাষা; চাষার মত ব্যবহার,—এখানে চাষা শব্দের অর্থ মূর্খ বা অশিক্ষিত। কিন্তু 'চাষাভূষা' বলিলে চাষী এবং এই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। চাষা, চাষী—জাতি বিশেষ (সৎচাষীপাড়া)।

চুক্তিবর্গা / সইয়াপত্তন-ম—এই প্রথানুযায়ী জমিতে কম বেশী যে পরিমাণ

ফসলই উৎপন্ন হউক না কেন, জমির মালিক বর্গাদারের নিকট হইতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কিংবা টাকা পায়। ইহাতে উভয়পক্ষেরই লাভলোকসানের সম্ভাবনা থাকে। জমিতে যদি ফসল না-ও হয়, তবু মালিককে চুক্তিমত তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিতে হয়; আবার জমিতে যদি বেশী ফসল হয়, সেই বেশীর অংশ মালিক পায় না। কোনও বৎসর ফসলের দাম বেশী থাকিলে, বর্গাদার সে-বৎসর মালিককে ফসল না দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাই দিয়া থাকে।

ছুটো-চ. মু. ন—যে নগদ টাকায় রোজ হিসাবে (প্রায়ই আট ঘণ্টা) কাজ করে, কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্য আবদ্ধ হয় না। তৎপর্যায়:—নগদা-মে, দিনমজুর, জন, রোজের জন, বদলা-ব. ফ, মুনিষ-রাঢ়. পব।

জন—চাষে বা অন্যকাজে নিযুক্ত সাধারণ শ্রমিক, মুনিষ, মজুর। মনুষ্য, ব্যক্তি (বহুজন-নিন্দিত)। ব্যক্তিসংখ্যার সহচর শব্দ (সাতজন লোক)। জনসাধারণ (জনজীবন, জননায়ক)।

জমা লওয়া—ফলের বাগান, ঘাসের জমি (গোমহিষাদির জন্য), পুকুর (মাছের চাষের জন্য) ইত্যাদি স্বল্পকালের মেয়াদে অগ্রিম কিনিয়া লওয়া। কখনো 'ধরা' কথাটিও শুনা যায় (পুকুর ধরা-মে)।

জোতদার—বিস্তর চাষের জমির মালিক। ইহাদের অনেকেই বর্গাচাষী বা ক্ষেতমজুর দ্বারা নিজ নিজ জমিতে ফসল উৎপাদন করে, নিজহাতে লাঙ্গল ধরে না। আবার অনেকে একাধারে কৃষক এবং মালিক দুই-ই, নিজেরাই নিজেদের জমি চাষ করে। জমিদারী প্রথা বিলোপের পূর্বে ইহারা সরাসরি জমিদারের বা কোনও মধ্যস্বত্বাধিকারীর রায়তশ্রেণীভুক্ত ছিল; বর্তমানে ইহারা রাজ্যসরকারকে খাজনাপত্র বুঝাইয়া দিয়া জমিবাড়ীর নিব্যূঢ় স্বত্ব ভোগ করে (কৃষক দ্র)।

ঠিকা / ঠিকে, ঠিকোর-মু—যে চুক্তি করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয়; কোনও কার্য সম্পাদনের জন্য যে প্রথমেই মোক্তা মজুরি ঠিক করিয়া লয়। এইরূপ কাজকে 'ঠিকা কাজ', 'ফুরনে কাজ', 'চুকে কাজ' ইত্যাদি বলা হয়। ঠিকা—নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করিবার সর্তে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত (ঠিকা ঝি)। নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য দখলপ্রাপ্ত (ঠিকা প্রজা)।

তেভাগা, ত্যাভাগো—বর্গাপ্রথা বিশেষ (বর্গাদার দ্র)।

দাঐল, দাওয়াউল, দাওয়াল, দাওয়ালে—যে মজুর প্রধানতঃ ধান দাওয়ার কাজ করে (খেতমজুর দ্র)।

দাদন—সুদে টাকা খাটানো (লগ্নী ব্যবসা)। শ্রমমূল্যে ধান কর্জ দেওয়া।

দাদন—বায়না ; অগ্রিম-মূল্য (নীলের দাদন)। **দাদনী**-রাঢ়—(খেতমজুর দ্র)।

দায়শোধী-ম—অনেক সময় জমির মালিক চাষীর নিকট হইতে ফসলের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্তে কয়েক বৎসরের জন্য জমির উপস্বত্ব সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দেয় ; মালিককে আর নগদ টাকায় সেই ঋণ শোধ করিতে হয় না। উত্তমর্ণ কৃষক সর্তমত কয়েক বৎসরের সম্পূর্ণ ফসল ভোগ করিয়া মালিককে দায়মুক্ত করে। এই প্রথার অপর নাম 'খাই-খালাসি'।

দোপরে-মু—যে মুনিষ সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে।

নগদা, নগদা মুনিষ—যে রোজ হিসাবে নগদ বেতনে কাজ করে।

নাগাড়ে, লাগাড়ে—যে বৎসরের জন্য কাজে নিযুক্ত হয় (মুনিষ দ্র)।

বদলা-ব. ক—মজুর, মুনিষ। বদলা লওয়া—রোজ হিসাবে মজুর খাটানো।

বদলা কাজ, বদলী কাজ—বৃহৎ দল গঠন না করিয়া (গাঁতা দ্র) অনেক সময় চাষাভূষারা দুই জনেও পরস্পরের শ্রমের বিনিময়ে জরুরী কাজ সম্পন্ন করিয়া লয়। একজনের কায়িক পরিশ্রমের সাহায্যের বদলে তাহাকে অপর জনের অনুরূপ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করার নাম 'বদলা কাজ।'

বর্গাচাষ—উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট ভাগ পাইবার বা নিবার সর্তে অন্য লোকের জমি চাষ করিবার সুপ্রচলিত প্রথা, ভাগচাষ।

বর্গাদার [share-cropper]—যে চাষী অন্য লোকের জমি চাষ করিয়া ফসলের ভাগ পায় বা নেয় (কৃষক দ্র)। তৎপর্যায় :—আইদারী-বাঁ. রং, আইদোর-রা, আধিদার / আধিভাগী-ম, আধিয়ার-দি. মা. রং. কো. জ. ত, ভাগচাষী, ভাগজোতদার, ভাগারো-মু, ভাগীদার-পূব, বরখাদার (কৃষক দ্র)।

জমির মালিক এবং বর্গাদারের মধ্যে উৎপন্ন ফসলের কে কত অংশ পাইবে, তাহা স্থানীয় প্রথা, চুক্তি অথবা সরকারী আইনানুসারে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার বহু অঞ্চলেই উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বর্গাদার পায় এবং অর্ধেক মালিকে নেয়। এই প্রথার কয়েকটি আঞ্চলিক নাম—**আধি, আধিভাগ, আধিবর্গা, আধাভাগো**। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বর্গাদারের, দুই তৃতীয়াংশ মালিকের। —এইরূপ ব্যবস্থাকে **তেভাগা, ত্যাভাগো** বলা হয়। জমি খুব সরস হইলে মালিক তিনভাগ নেয়, বর্গাদার একভাগ পায় ; বরিশালের কোথাও কোথাও এই প্রথার নাম **'চতৈ'**। উৎপন্ন ফসলের ১৬ ভাগ মালিকের, ৮ ভাগ চাষীর ; মুর্শিদাবাদের অঞ্চল বিশেষে এই প্রথাকে **'ষোল-চব্বিশে'** বলিতে শুনা যায়। অবশ্য প্রত্যেকটি প্রথাই নানা সর্তযুক্ত। ভাগের তারতম্য অনুসারে কোথাও

মালিক লাঙ্গল, গোরু, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করে, কোথাও বর্গাদারকে তাহা দিতে হয়। কোথাও ঝাড়াই-মাড়াই ও কাটাই খরচা বর্গাদার ও জোতদার উভয়ের, কোথাও একজনের।

বাগাল-রাঢ়—পশুপালন ও গোসেবার কাজে নিযুক্ত মুনিষ (রাখাল দ্র)। বাগালি—বেতন নিয়া গোসেবার কাজ, রাখালি।

বাছাউল-ব—যে ক্ষেতবাছার অর্থাৎ নিড়ানের কাজ করে (ক্ষেতমজুর দ্র)।

বাঁটায় চাষ-চ. মে—অনেক গরীব চাষী হালের দুইটি ভাল গোরু এক সঙ্গে কিনিতে পারে না, প্রায়ই সেরূপ সংস্থান তাহাদের থাকে না। এরূপস্থলে এক বলদের মালিক যদি অপর এক বলদের মালিকের সহিত যুক্ত হইয়া পরস্পরের গোরুর সাহায্যে চাষ-আবাদ করে, তবে এইরূপ চাষকে বাংলার কোথাও কোথাও 'বাঁটায় চাষ' বলা হয়। এইরূপ কৃষিপ্রথার অপর আঞ্চলিক নাম—আধহালা-পূব, গুপিনাহালা-ম, আঙ্গুরে হাল-ফ। কোথাও কোনো এক বলদের মালিকের চাষের জমি না থাকিলে, সে অপর এক বলদের চাষীকে তাহার বলদটি চাষের মরশুমে ধার দেয় এবং তদ্বাবদ উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট ভাগ পায়।

বাড়ি ধান, ধান বাড়ি দেওয়া / নেওয়া-পব. রাঢ়-মে—পল্লীগ্রামে অভাবগ্রস্ত চাষী অনেক সময় সম্পন্ন জোতদারের নিকট হইতে এই সর্তে ধান কর্জ করে যে, পরবর্তী ফসলের মরশুমে সে এই ধান বৃদ্ধির সহিত (অর্থাৎ যে পরিমাণ ধান সে কর্জ লইতেছে তাহার চেয়ে বেশী) ফিরাইয়া দিবে। কত ধানে কত বৃদ্ধি দিতে হইবে, তাহা চাষী ও জোতদারের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছয় মাসে (সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে কর্জ নিয়া অগ্রহায়ণে শোধ করিতে হয়) এক মণ ধানে দেড় মণ ফিরাইয়া দিতে হয়। বৃদ্ধির সহিত পরিশোধ করিবার সর্তে ধান কর্জ দেওয়া বা নেওয়ার নাম ধান বাড়ি দেওয়া বা নেওয়া। মূল ধানের উপর যে অতিরিক্ত ধান (সুদ স্বরূপ) দিতে হয়, তাহাই বাড়ি ধান ('বৃদ্ধি ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ি'—কবিক)।

বেগার—যে বিনা বেতনে কাজ করে (প্র. বেগার ধরে আনা, তীর্থযাত্রার লোভে বড় লোকের বেগার হওয়া)। বিনা বেতনে কাজ। বেগার খাটা—বিনা বেতনে কাজ করা।

ভাগরাখালি—পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও প্রথম প্রসবের বৎস পাইবার এবং দুধ খাইবার সর্তে দ্বিতীয় প্রসব পর্যন্ত একজনের বকনা বা ছাগী অপরজনে নিজ ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে পালন করিয়া দিবার প্রথা আছে। এঁড়ে বাছুর

চরাইবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে উহার বিক্রয়মূল্যের একটা অংশ রাখাল ব্যক্তি পাইয়া থাকে। এই সকল প্রথার নাম—ভাগরাখালি, **চারানি**। কোথাও ছাগল মুরগীর ক্ষেত্রে শাবকের অর্ধেক বা তাহার মূল্য মালিকে পায়।

ভাগারো, ভাগীদার—(বর্গাদার দ্র)। **মাগনী কামলা**—(খেঁস কামলা দ্র)।

মান্দারি—(রাখাল দ্র)। **মাইন্দার, মান্দ্যা**-রাঢ়—বাঁধা বেতনের মুনিষ।

মুনিষ-ন. মু. য. রাঢ়—চাষে বা অন্যকর্মে নিযুক্ত শ্রমিক (খেতমজুর দ্র)।

রাখাল—যাহারা গো-মহিষাদি চরায়। তৎপর্যায় :—রাখুয়াল/রাখ্যায়াল-পূব, আখুয়াল-রং. কো, আথৈলা-রা, নোথালিয়া-জ. কো, বাগাল-বাঁ. মে. বর্ধ। মান্দারি-রাঢ়—বাঁধা বেতনে গো-সেবার চাকুরি, রাখালি-পূব।

গেঁইটোর পয়সা-মু—অন্যের গোরু চরাইয়া রাখালেরা মাসের শেষে যে টাকা পায়। বাংলার বহু অঞ্চলে এক একজন রাখাল একসঙ্গে বহু গৃহস্থের গোরু চরাইয়া মোটা মাসহারা পাইয়া থাকে।

লাঙ্গলহালা-মু—এই পদ্ধতির বর্গায় জমির মালিক লাঙ্গল গোরু সরবরাহ করে এবং সমস্ত খড় সে পায়, ভাগচাষী শুধু ফসলের অংশ নেয়।

শিউলী, সিউলী—যাহারা খেজুর গাছের মাথা চাঁচিয়া রস বাহির করে ; জাতি বিশেষ। শিউলি—শেফালিকা, ফুল বিশেষ।

শিরালি / হিরালি-ম. শ্রী—শিলারি, মন্ত্রশক্তি দ্বারা শিলা (hail-stone), বজ্র ইত্যাদির আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে, এইরূপ ব্যক্তি। চৈত্র বৈশাখ মাসে বোরো ধান পাকিয়া উঠিবার মুখে শিলা-বৃষ্টিতে উহার প্রভূত ক্ষতি করে। এজন্য মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী বোরো ক্ষেতের অনেক মালিক শস্যরক্ষার্থে যৌথভাবে অল্পকালের জন্য 'শিরালি' নিযুক্ত করে।

ষোল-চব্বিশে—(বর্গাদার দ্র)। **সইয়াপত্তন**—(চুক্তিবর্গা দ্র)।

সাঙ্গার / হাঙ্গার—বহুজনের মিলন (গাঁতা দ্র)।

সামুরে চাষ / হামুরে চাষ—বৃহৎ ভূমিখণ্ড এক হালে চাষ করা কঠিন। তজ্জন্য কয়েকজন চাষী মিলিয়া এক একটি দল গঠন করে এবং পর্যায়ক্রমে এক একদিন এক একজনকে দলবদ্ধভাবে নিজেদের হাল-গোরু দিয়া সাহায্য করে। এইরূপ সমবায়মূলক চাষের নাম সামুরে চাষ।

হাইলা, হাইল্যা, হালিয়া, হাল্যা [সং হালিক]—চাষী (কৃষক দ্র)। হাইল্যা-রা—অয়রা। হেল্যা—হালের বলদ।

হালুয়া, হালুচা—চাষী (কৃষক দ্র)। হালুয়া—সুজি চিনি ও ঘিয়ের তৈয়ারি খাবার বিশেষ, মোহনভোগ। **হেলুয়া, হেলো**—চাষী, (হালুয়ার উচ্চারণ ভেদ)।

২ চাষ ও চাষীর যন্ত্রপাতি

অকশু-য—নিড়ানি বিশেষ। **অলফা**-ত্রি—আঁকুশি।

আইলা-ব—পাটনবাড়ি। আগুনের মালসা।

আউন, আঁওদ—(আঁদদড়ি দ্র)।

আঁকড়া / আঁকড়ো-চ—অঙ্কুশাকার বংশদণ্ড বিশেষ; চাষ করিবার সময় এই দণ্ডের সাহায্যে লাঙ্গলটিকে জোয়ালের সহিত টানিয়া বাঁধা হয়। যে দড়ি দিয়া আঁকড়াটি টানিয়া বাঁধা হয় তাহাকে বলে—আঁকড়াদড়ি-চ. ন, নাঙলাদড়ি-মু, কোড়া-ব।

আঁকড়া—বক্রাগ্র লৌহখণ্ড বা বংশখণ্ড, hook। আঁকশি। আংটা, বলয়াকার হাতল। লাউ কুমড়া বেত ইত্যাদি লতানিয়া গাছের গিঁঠ হইতে বক্রাগ্র যে একপ্রকার লতা বা শুঁড় বাহির হয় (লাউয়ের আঁকড়া, বেতের আঁকড়া)। এক সময়ে গ্রাম্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় বেতের আঁকড়া লগির মাথায় বাঁধিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। অনেক লাঠিয়ালই তখন ঝাঁকড়া চুল রাখিত; সেই চুলে এই অস্ত্র একবার জড়াইতে পারিলে আক্রান্ত বীরের নিগ্রহের সীমা থাকিত না।

আঁকশি, আঁকুশি—ফলাদি পাড়িবার লম্বা দণ্ড বিশেষ। ইহার মাথাটি প্রায়ই অঙ্কুশ, বঁড়শি বা ক-এর মুখের মত বাঁকা থাকে। তৎপর্যায়ঃ—আঁকুড়া-য. খু. উব, আঁকড়ি, আকড়বি (আকর্ষী)-মু. মে, আংশি-ন, আংশো-খু, আংগুড়ি-ম, কোটা-ম. ঢা. য. খু, কৌটকা-ফ. ব, লগা, লগি।

আগড়-চ—বাঁশের বাখারির তৈয়ারি ধান-ঝাড়ার মাচা, চালি (ঘরবাড়ী দ্র)।

আঁচড়া-য. খু—ডাঙ্গা জমির ঘাস ইত্যাদি আঁচড়াইয়া উৎপাটন করিবার চিরুনির মত দাঁতওয়ালা যন্ত্রবিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—বিদা / বিদে-ন. মু, ব্যাধা-জ: কো, বিন্ধা-ম, নাঙইলা-টা, নাঙলা-পা. দি. মা. রং। চার-পাঁচ ফুট লম্বা একটি পুরু কাষ্ঠখণ্ডে (beam) দুই তিন ইঞ্চির ব্যবধানে কতকগুলি গোঁজ সারিবদ্ধ ভাবে বিঁধাইয়া এই যন্ত্রটি তৈয়ার করা হয়। গোঁজগুলি কাষ্ঠখণ্ডের নীচের দিকে চিরুনির দাঁতের মত ছয়-সাত ইঞ্চি বাহির করা থাকে; উহাদের

মুখগুলি চোখা করিয়া দেওয়া হয়। লাঙ্গলের ঈষ এবং মুঠার ন্যায় ইহারও ঈষ এবং মুঠা (হাতল) থাকে। মুঠা ছাড়া শুধু ঈষযুক্ত আঁচড়াও ব্যবহৃত হয় এবং গোরুর পরিবর্তে ছোট জমিতে উহা মানুষে টানে।

আড়চাল-মে. বাঁ. বী. বর্ধ. চ. ন. মু. য. খু—লাঙ্গল-দেহের ছিদ্রপথে ঈষকে আড়ভাবে আটকাইবার খিল বা গোঁজ (peg), পাটাস-জ. কো।

আঁদ / আঁদ-দড়ি-চ. মে—জোয়ালের সহিত ঈষ বাঁধিবার দড়ি। তৎপর্যায় :—আউন-ম. ঢা, আঁওদ-ন. মু. বাঁ. বী, নেংরা-জ. কো. রং।

আমেরা / আমরা-জ. কো. রং—ঈষের মাথার দিকের খাঁজ (যেখানে জোয়াল বাঁধা হয়), ঠনা-ম, পান-মু। **ঈষ**—লাঙ্গলদণ্ড (লাঙ্গল দ্র)।

উকা-কো—পাটকাঠির দৃঢ়বদ্ধ সরু আটি। সাধারণতঃ কৃষকেরা বিড়ি তামাক খাইবার বা মশামাছি তাড়াইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ আটি জ্বালাইয়া দীর্ঘসময় আগুন ধরিয়া রাখে। ময়মনসিংহে ইহাকে 'পাটখড়ির বুন্দা' বলিতেও শুনা যায়। (বোলেন দ্র)।

উকুনবাড়ি, উকুনে, উখুন—উৎক্ষেপণদণ্ড। তৎপর্যায় :—কাঁদাল / কান্দোল-য. ন, কাঁহুলি-খু, কাড়ালি-জ. কো, কাড়াইল-টা. পা, দাড়িয়া / দাইড়্যা-ম, দাউড়া-ঢা। যে-সব অঞ্চলে গোরু দ্বারা ধান্যাদি মাড়াইবার রীতি আছে, সাধারণত: সেইসব অঞ্চলেই এই দণ্ড ব্যবহৃত হয়। একটি বংশদণ্ডের মাথায় বক্রাগ্র একখণ্ড লোহার শিক বা পাত বাঁধিয়া ইহা তৈয়ার করা হয়। কোথাও কোথাও পৃথক্‌ভাবে এইরূপ শিক না বাঁধিয়া দণ্ডটিরই মাথার কিঞ্চিৎ অংশ আঁকড়ির মত বাঁকাইয়া লওয়া হয়। এই বক্রাগ্র দণ্ডটির সাহায্যে মর্দিত ফসলের খড়কুটা অতি সহজেই উৎক্ষেপণ ও পৃথক করা যায়।

কয়ার-রং—লাঙ্গলের মুখ বা মুড়া (লাঙ্গল দ্র)।

কাড়া-ম—মোটা দড়ি (মইয়া কাড়া)। কাড়া—পরিষ্কার করা (গোহাল কাড়া); গোহালকাড়া ঝুড়ি—গোয়ালঘর পরিষ্কার করিবার ঝুড়ি। কাড়া—টানিয়া বাহির করা (খড়ের গাদা হইতে খড় কাড়া)। ছিনাইয়া লওয়া।

কাড়াইল, কাড়ালি, কাঁদাল, কান্দোল—(উকুনবাড়ি দ্র)।

কাস্তে-ক [হি হসিয়া/হসুআ, ইং sickle]—ধান দাওয়া (কাটা) ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা দাঁতওয়ালা অস্ত্র বিশেষ। তৎপর্যায় :—কেঁস্ত্যা-বাঁ, কেঁদে-বী, কেস্তা-মু. পা, কাস্তে দা-মে, কাইছিয়া-হিজ, কাচি-খুব, কাইচা-রং, কাচি দাও-জ. কো।

কুরুস-জ. কো—কর্ষিত ভূমির ডেলা ভাঙ্গিবার লম্বা হাতলওয়ালা মুগুর।

কোঁটা—ফলাদি পাড়িবার লম্বা বাঁশ বা দণ্ড বিশেষ (আঁকশি দ্র)।

কোঁটা / কুটা—টুকরা করা (মাছ কুটা, তরকারি কুটা)। ছেঁচা (হলুদ কোটা)।

কোদাল, কুদাল [সং কুদ্দাল, হি কুদালী, সাঁ কুড়ি, ইং spade]—মাটি কাটার অস্ত্র বিশেষ। হাত কোদালি—এক হাতে কাজ করা যায় এইরূপ ছোট কোদাল। দাঁড়কোদাল—লম্বা বাঁটের কোদাল যাহা দিয়া কাজ করিতে বেশী নীচু হইতে হয় না, ফাউড়া।

কোয়া-পব. রাঢ়. বঁ. ফ [ও কঁয়া]—যেসব কীলক দ্বারা মইয়ের দুইটি (কোথাও তিনটি) লম্বা বাঁশকে সংযুক্ত করা হয় (মই দ্র)। কোয়া—কোষ (কাঁঠালের-, রেশমের-)।

খুরপা / খুরপো, খুরপি [সং খুরপ্র]—খন্তার ফলার আকার নিড়েনি বিশেষ; সমতল ভূমির দূর্বা ঘাস ইত্যাদি ঠেলিয়া উঠাইতে ইহা খুব উপযোগী। তৎপর্যায় :—ডাউকি-জ. কো, ছেনা-ম।

গাদা-মু. খু—লাঙ্গলের মুঠা ও ধড়ের সংযোগস্থল হইতে ঈষ ও ধড়ের সংযোগস্থল পর্যন্ত মোটা অংশকে বলে গাদা। (চাষ-আবাদ ৪ দ্র)।

ঘাস কুরনি-মে—নিড়েনি বিশেষ। **ঘাস্তুড়্যা**-বাঁ—ঘাস কাটার ছোট দা, ঘাস্তুয়া দাও-জ. কো।

চকম, চগো, চঙ্গ, চৌকাম—(মই দ্র)।

চালি-চ—বাঁশের পাটা বিশেষ, ইহার উপর ধান ঝাড়া হয়। চালি-ম—চালা ঘর (এক চালবিশিষ্ট)। চাল, প্রতিমার পিছনের আচ্ছাদন।

ছেনি-ম—নিড়েনি বিশেষ। ছেনি-নো—বড় হাঁসুয়া দা। ছেনি-ক—লোহা ইত্যাদি কাটিবার বাটালি বিশেষ।

ঝাঁকা—(বোলেন দ্র)। ঝাঁকা—ঝাঁকিয়া বসা। ঝাঁকানো—আসর গুলজার করা। ঝাঁকালো—জমকালো (ঝাঁকালো পোষাক)।

জালতি—গোরুর মুখের আবরণ জাল। ফলাদি পাড়িবার দণ্ডসংলগ্ন থলের মত জাল। লোহার জাল বিশেষ, netting.

জোত, জোতদড়ি-ক—যে দড়ি দিয়া জোয়ালের সহিত গো-মহিষাদি জোতা হয়। তৎপর্যায় :—জুতি / জুইত-ম, জুকতি-রং, জুরুন্তি-জ. কো, শোলদড়ি-মে। জোত—জো (কাজের জোত)। চাষের জমি। জোতা—যুক্ত করা (জোয়ালে গোরু জোতা)।

জোমরা—চাষীদের পাতার ছাতা বিশেষ (পেখা দ্র)।

জোয়াল, জুয়াল [হি জুআ, ইং yoke]—লাঙ্গল গাড়ি ইত্যাদি টানিবার সময় যে কাষ্ঠদণ্ড বা বংশদণ্ড গোমহিষাদির কাঁধে জোতা হয়। তৎপর্যায় :—জোল-চ, জোয়াইল-ন জেঁায়াল / জংগাল / জুয়া-জ. কো।

জোয়ালের দুই মাথার গোঁজ বা কাঠি—শোল-চ. বাঁ. বী, শলি-মে.মু, সোঁয়াজ-ন, সোমরাইল-খু, সুলটি-জ. কো, সড়কি-ম।

টিপা-মে—ঘুন্টির মালা বিশেষ। ইহা সাধারণতঃ গোরুর গলায় পরানো হয়।

টোকা-ন. হা. হু. বর্ধ [পো touca]—বাঁশের চেঁচাড়ি, গোলপাতা, তালপাতা ইত্যাদির তৈয়ারি টুপির ধরন ছাতা, ইহার বাঁট থাকে না। বাংলার প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন নামে এই ধরনের ছাতার প্রচলন আছে। পর্যায় শব্দ :—মাথালি, মাথা'ল / মাথোল-মু, পাত্‌লা-ম, মাথলা-ঢা. দি. মা, মাথাল—কো. জ. রং, মাথাইল-টা. পা।

টোনা-ঢা—বলদের মুখের জালতি বিশেষ (পাউড়ি দ্র)। টোনা-ম—কোনো কিছু রাখিবার জন্য আঁচল গুটাইয়া যে-থলের মত করা হয় (মেয়েরা টোনা ভরিয়া বকুল ফুল কুড়ায়)।

ঠনা-ম—ঈষের খাঁজ (notch)। মাটির ছোট বেদী যাহার উপর ভাতের হাঁড়ি রাখিয়া ফেন গালা হয়।

ঠুসি-খু, **ঠোয়া**-ম—বাঁশের তৈয়ারি গোরুর মুখের আবরণ (পাউড়ি দ্র)।

ডলনা-ব—বরিশালে কর্ষিত নাবাল জমি চৌরস করিবার জন্য তক্তার মত এক প্রকার মই ব্যবহার করা হয়, ইহারই স্থানীয় এক নাম ডলনা! ডলনা—যাহা দিয়া ডলা বা মর্দন করা হয়।

ডাউকি-জ. কো—নিড়ানি বিশেষ (খুরপা দ্র)।

ডোঙ্গা—দ্রোণী, জমিতে জল বাহিত করিবার জন্য তাল, খেজুর ইত্যাদির গুঁড়ি (trunk) দিয়া তৈয়ারি নালীর মত পাত্র। ঐরূপ গাছের গুঁড়ি হইতে প্রস্তুত সরু লম্বা নৌকা।

ডোবরা-মা. দি—মাঠে তামাক-টিকা বহন করিবার পাতার ঠোঙ্গা বিশেষ।

থড়কা-মে—ঘুন্টির মালা যাহা সাধারণতঃ গোরুর গলায় পরানো হয় (টিপা দ্র)।

দাউন, দাওন-পূব—মলনদড়ি; গোরু দ্বারা ধান মলাইবার সময় ৫-৭টি গোরু সারিবদ্ধভাবে একসঙ্গে জোতা হয়। এই জোতদড়িকে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে দাউন, দাওন, দাঁওনদড়ি, মলনদড়ি বলা হয়।

দাড়িয়া / দাইড়্যা [সং দণ্ডিকা]—(উকুনবাড়ি দ্র)। ইহাতে আর পৃথকভাবে বক্রাগ্র শিক বা পাত বাঁধা থাকে না, বংশদণ্ডটিরই মাথার কিঞ্চিৎ অংশ বাঁকাইয়া লওয়া হয়।

দুগর-ম—লাঙ্গলের মুখ বা মুড়া যাহার সহিত ফাল আটকানো হয়। পূর্ববঙ্গে এক শ্রেণীর লাঙ্গলের মুখ পৃথক এক খণ্ড কাঠ দিয়া তৈয়ার করা হয়।

দুনি-রাঢ়. পব—জলসেচনীবিশেষ। দুনিবহা-মু—দুনি দিয়া ক্ষেতে জল তোলা। সময়মত সুবৃষ্টি না হইলে চাষীকে ফসলের জমিতে খাল বিল পুকুর ইত্যাদি হইতে জল সেচন করিতে হয়। এই কাজে তাহারা নানা নামের নানা প্রকার সেচনী ব্যবহার করে। যেমন, দুনি, ডোঙ্গা-রাঢ়. পব, ডুঙ্গি-বাঁ, কুন্দ্ / কুন-ম, সেঁওচ/ছেঁওচ-ন.য, সিনি / সিউনি / সেউনি-রাঢ়.পব, সিয়াৎ-বাঁ, সেওৎ/হেওৎ-ম, হেউৎ-নো, বাজাল-নো, হাতঝাল-চ, দোলাঝাল-চ, কেঠুয়া (কাঠের)।

দুপাটিয়া / দুপাইট্যা-ম—দুই পাটিযুক্ত বাঁশের সিঁড়ি বিশেষ ; মই।

দোলাঝাল-চ—জলসেচনী বিশেষ। এই শ্রেণীর সেচনীতে দড়ি সংযোগ করিয়া দুইজন দুইদিকে দাঁড়াইয়া দোলাইয়া দোলাইয়া জল সেচন করে।

নাকথন-জ. কো—গো-মহিষাদির নাকের দড়ি। তৎপর্যায় :—নাকাল-চ.ন, মোনাদ-মে।

নাঙলা, নাঙইলা—জমির ঘাস ইত্যাদি উৎপাটনের যন্ত্রবিশেষ (আঁচড়া দ্র)।

নিজেন-ন.মু—লাঙ্গলের মুঠা বা হাতল, নেজনা-মে। লিজেন—নিজেনের উচ্চারণভেদ (লাঙ্গল দ্র)।

নিড়ানি, নিড়েনি, নিড়েন-পব [weed-hook]—শস্যক্ষেত্র হইতে ঘাস আগাছা ইত্যাদি উৎপাটনের যন্ত্রবিশেষ। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা ধরনের নানা নামের নিড়ানি ব্যবহৃত হয়। যেমন, অকশু-য, পাঁচন-পা, পাছুনি-জ. কো, পাসনি-বাঁ. বী. খু, পাসুন-জ. কো, ঘাসকুরনি-মে, নিড়াইন্যা কাচি-ত্রি, ডাউকি / ছেউটি-জ. কো, ছেন্নি-ম।

পাউড়ি-মু—গো-মহিষাদির মুখের জাল বা আবরণ। চাষ-আবাদের সময় গোরুগুলি যাহাতে এটা ওটায় মুখ দিয়া বিরক্ত না করে, তদুদ্দেশ্যে চাষীরা উহাদের মুখে একরূপ জাল্ বা ঠোঙ্গার ধরন বাঁশের আবরণ পরাইয়া দেয়। অঞ্চলভেদে ইহাদের আরও নানা নাম শুনা যায় :—জালতি-চ. মে, জাল-বাঁ. বী, পাড়া-ন, তুড়ি-ব, টোনা-টা, ঠুসি-খু, ঠোয়া / ঠুয়া-ম।

পাচনবাড়ি, পাচনি [সং প্রাজন]—গো-মহিষাদি তাড়াইবার ছোট লাঠি। তৎপর্যায় :—পইনা-মে, পায়না-মু, আইলা-ব, পেন্টি-জ, শলা / হলা-ম।

পাঁচনি / পাঁচোন-পা—নিড়ানি বিশেষ ; ইহার মাথাটি ৫ বা অর্ধচন্দ্রের মত। পাচন—বিভিন্ন গাছগাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ।

পাটা-পব. রাঢ়—কৃষি সম্বন্ধীয় পাটা বলিতে বুঝায়,—তক্তার ধরন পুরু কাষ্ঠখণ্ড, কৃষকেরা যাহার উপর ধান ঝাড়ে (ধানের আটিগুলি আছড়াইয়া ফসল সংগ্রহ করে) ; ধান বেড়ে পাটা-মু। চব্বিশ পরগনায় শুধু কাঠের এইরূপ মোটা তক্তাকে পাটা এবং বাঁশের বাখারির তৈয়ারি অনুরূপ সামগ্রীকে আগড় বা চালি বলা হয়। পাটা—রাজমিস্ত্রীদের সমতল কাষ্ঠদণ্ড।

পাটা-পূব—পশ্চিমবঙ্গের শিল যাহার উপর মশলাদি পেষণ করা হয়। শিশুদের গলার অলঙ্কার বিশেষ। ধোপার পাটা, যাহার উপর কাপড় কাচে। বুকের পাটা—বুকের বিস্তার (সাহস)। পাটা—পাট্টা (জমির)।

পাটাস-জ. কো—গোঁজ বিশেষ (আড়চাল দ্র)।

পাটি—মইয়ের বাঁশ (মই দ্র)। মাদুর বিশেষ। সারি (দুপাটি দাঁত)। জোড়ার একটি (এক পাটি জুতা)।

পাড়া-ন—গোরুর মুখের জালতি (পাউড়ি দ্র)। পাড়া-ম—ধানের আটির স্তূপ (ধানের পাড়া)। পদচিহ্ন (গোরুর পাড়া)। পল্লী, গ্রাম বা শহরের অংশ (কুমারপাড়া)। উচ্চস্থান হইতে কিছু নামানো (আম পাড়া)। পাতা, বিস্তৃত করা (বিছানা পাড়া)। উচ্চৈঃস্বরে বলা (ডাক পাড়া)।

পাতলা-ম—টুপির ধরন পাতার ছাতা (টোকা দ্র)। হালকা।

পান-মু—খাঁজ, notch (ঈষের পান)। ধাতু জোড়া দিবার ঝাল বিশেষ, solder, পাইন-পূব। তাম্বূল, betel leaf। বাঙ্গালীর **উপাধি** বিশেষ। পান—পান করা।

পায়না-মু—পইনা-মে, পাচনবাড়ি, গো-মহিষাদি তাড়াইবার ছোট লাঠি।

পাশি-মে. মু—দুই মাথা সরু চেপ্‌টা ধরনের পেরেক, পাতাম লোহা। লাঙ্গলের মুখে ফাল আটকানো, দুইটি তক্তায় জোড়া লাগানো প্রভৃতি কাজে ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়।

পাসুনি-বাঁ. বী—আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার ছোট কোদাল বিশেষ, পাসনি-খ, পাঁসুন-জ. কো।

পেখা / পেকে-রাঢ়—তালপাতা ইত্যাদির তৈয়ারি ছাতা, যাহা মাথা হইতে

পিঠের উপর দিয়া কোমরের কিছুটা নীচু পর্যন্ত ঢাকে। ইহা মাথায় দিলে বর্ষীয়সী বাঙ্গালী মহিলাদের আধঘোমটার মত দেখায়। তৎপর্যায়:—সাঁড়শি-চ. মে, ঝাঁপি-জ. কো. রং. দি, জোমরা-ব. নো, পাখিয়া-হিজ।

ফাউড়ি-জ. কো—ধান ইত্যাদির রাশ রৌদ্রে ছড়াইয়া দিবার, কিংবা ছড়ানো ধান ইত্যাদি রাশীকৃত করিবার লম্বা হাতলওয়ালা কাঠের পাটা বিশেষ। তৎপর্যায়:—সাপটা/সাবডা-ম. খু, সারপাট/হারপাট-ম. ঢা, টানা-ম। পশ্চিমবঙ্গে ইহার 'পাটা' নামও শুনা যায়।

ফাল—লাঙ্গলের ফলা, ploughshare (লাঙ্গল দ্র)। লাফ, লম্ফ।

বাঁক—ভারী জিনিষপত্র মাথায় বহন না করিয়া যে-দণ্ডের সাহায্যে কাঁধে ঝুলাইয়া নেওয়া হয়। এই রীতি ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত আছে। বাউক-ম, বাইক-টা, বাকুয়া-কো, বাঁহুক-মু—বাঁকের বিবিধ আঞ্চলিক রূপ। অন্যান্য পর্যায়শব্দ:—ভারবাঁশ-ম. নো, বড়জালা, বাঙ্গি-মে, বেই/বাঙ-শ্রী। বাঙ্গিদার—যে ব্যক্তি বাঁকে (বাঙ্গি দ্বারা) মোট বহন করে। বাঁক—নদীর বাঁক, বক্রতা।

বাগডোর—গো-মহিষাদি বাঁধিবার লাগামের মত দড়ি, মুখোস। ('শিবের সাক্ষাতে দিল বাগডোর ধর‍্যা'—রারচ)।

বাঙ্গি—(বাঁক দ্র)। বাঙ্গি—ফল বিশেষ, ফুটি।

বাজাল—জলসেচনী বিশেষ (ডুনি দ্র)। **বাঁশই / বাঁশো**-খু. ব—মই।

বিড়া / বিড়ে-ক—মাথায় বোঝা বহন করিবার বা জলের কলসী ইত্যাদি বসাইবার খড় দড়ি কাপড় ইত্যাদির গোলাকার বেড় বা চাকতি; বেঁড়ু/বেঁড়ো-রাঢ়, বোঁড়ো-মু। বিড়া-মে—ধানের বড় আটি। -পূব—পানের গোছা বা গোছ।

বঁধা / বিদা, বিন্ধা, ব্যাধা,—(আঁচড়া দ্র)। ব্যাধা দুই প্রকার—হাতব্যাধা ও ধানব্যাধা।

বোলেন-চ—খড় পাকাইয়া বেণীর মত করিয়া তৈয়ারি আধার বিশেষ। ইহাতে দীর্ঘ সময় আগুন ধরিয়া রাখা যায় এবং বিড়ি-তামাক খাইতে ইহা দ্বারা গরীব চাষীদের দেশলাই খরচ কিছুটা বাঁচে, তাহারা মশা-মাছিও তাড়াইতে পারে। তৎপর্যায়:—বেনী-ম. মৈ, বেনা-ব, বেনিয়া/ঝাঁকা-হিজ, মোড়া-ন, সাঁজালি-বর্ধ. হু, ভুতি-জ. কো।

ভারবাঁশ—ভারী জিনিষ বহন করিবার বাঁশ (বাঁক দ্র)।

মই—[সং মদিকা, হি হেঙ্গী, ইং harrow, হি নিসেনী, ইং ladder]—বাংলায়

কর্ষিত ভূমির ডেলা ভাঙ্গিবার বাঁশের যন্ত্র (harrow) এবং বৃক্ষাদিতে উঠিবার সিঁড়ি (ladder),—এই উভয় অর্থেই 'মই' শব্দের প্রয়োগ আছে। তৎপর্যায় :—মইয়া, তুপাটিয়া/তুপাইট্যা, চকম-ত্রি, চৌকাম-শ্রী, চঙ্গ-ম. ব. দি. মা. জ, চগো-পা, বাঁশোই-খু. ব। মুর্শিদাবাদে ডেলা ভাঙ্গিবার মই-এর অপর নাম—'নাঙলা মই'। বরিশালে কর্ষিত জোল জমি চৌরস করিবার জন্য পুরু তক্তার মত একপ্রকার মই ব্যবহার করা হয়, তাহাকে 'তলনা' বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব বাংলার বহু অঞ্চলে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত মই-এ দুইটির পরিবর্তে তিনটি বাঁশ থাকে; কোয়া দিয়া আটকাইরার সময় ধারের বাঁশ দুইটিকে কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া দেওয়া হয়, মাঝখানেরটি থাকে সোজা।

পাটি/মইয়ের পাটি-চ. ন. মু. য. খু, মইতাড়া-মে—মইয়ের লম্বা বাঁশ যাহা কতকগুলি খিল (bolt) দ্বারা যুক্ত করা হয়। মইয়ের খিল :—কোয়া [ও কঁয়া]-বাঁ. বী. মে. চ. ন. মু. য. খু. ব. ফ, খাওয়া-জ. কো।

মাথাইল, মাথাল, মাথালি—টোকা, টুপির ধরন পাতার ছাতি (টোকা দ্র)।

মুঠা, মুঠি, মুঠিয়া—লাঙ্গলের লেজ বা হাতল যাহার মাথায় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চাষীরা লাঙ্গল চালায় (লাঙ্গল দ্র)।

মুড়া, মুয়া—লাঙ্গলের মুণ্ড বা মুখ (লাঙ্গল দ্র)।

মোনাদ-মে—গো-মহিষাদির নাকের দড়ি।

লগি, নগি—আঁকশিরূপে ব্যবহৃত লম্বা সরু বাঁশ। লগ্‌গি—লগির উচ্চারণভেদ। বড় লগি—লগা।

লগি—নৌকা ঠেলিবার লম্বা বাঁশ। তৎপর্যায় :—চইর (চোড়)-পূব. উব ('আগে জলের ছিটা, পাছে চইরের গুতা'—প্রবাদ), বাইস-ম (এক বাইস জল—গভীর জল অর্থে বলা হয়)।

লাঙ্গল [হি হল/হর, সাঁ নাহেল, ইং plough]—সুপ্রসিদ্ধ ভূমিকর্ষণযন্ত্র। নাঙ্গল, নাঙল, নাওল, নাঁগোল—লাঙ্গলের বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ। তৎপর্যায় :—হাল [সং হল]। কিন্তু বাংলায় লাঙ্গল অর্থে হাল শব্দের ব্যবহার থাকিলেও প্রায়ই এই শব্দটি দ্বারা কৃষির সাজ সরঞ্জামের একটি পূর্ণ সংগ্রহ বা সেটকে (set) বুঝায়। যখন বলা হয়, 'মানিক মণ্ডলের পাঁচখানা হাল', তখন বুঝিতে হইবে, তাহার শুধু পাঁচখানা লাঙ্গলই নয়, পাঁচখানা জোয়াল, পাঁচখানা মই, পাঁচ জোড়া বলদ এবং পাঁচজন ক্ষেতমজুরও আছে; শুধু তাহাই নহে,

পাঁচখানা লাঙ্গল চালাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ (কমপক্ষে ৬০ বিঘা) চাষের জমিও আছে। এক লাঙ্গলের চাষ—প্রায় ১৫ বিঘা জমিতে চাষ-আবাদ।

লাঙ্গলের প্রধানতঃ পাঁচটি অংশ :

(১) ধড় বা দেহ—যে-এক বা একাধিক কাষ্ঠখণ্ড দিয়া লাঙ্গল তৈয়ারি হয়, তাহার মধ্যস্থলের বাঁকা মোটা অংশ। এই অংশের নিম্নদিকে থাকে (২) লাঙ্গলের মুখ বা মুণ্ড যাহার আঞ্চলিক নাম : মুড়া/মুড়ো-চ. ন. মু. মে, মুয়া/ঠুগর-ম, কয়ার-রং এবং উপরদিকে থাকে (৩) লেজ বা হাতল যাহার মাথায় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া চাষীরা লাঙ্গল চালায়। উপর দিককার এই অংশটিকে বলা হয় :—নেজনা-মে, নিজেন-ন, লিজেন-মু, মুঠা /মুঠি/মুঠো-চ. মু. খু. য. জ. কো, মুইঠ-বাঁ. বী. মুঠিয়া-রং, বোঁটা, খুঁটি/লাঙ্গলের খুঁটি-ম। ধড়ের বাঁকা মধ্য অংশের এক নাম—গাদা-খু. মু।

ধড়, মুড়া ও মুঠার গঠন ও স্থাপন অনুসারে লাঙ্গল নানা শ্রেণীর হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে ধড় ও মুড়া অখণ্ড (অর্থাৎ একটি অখণ্ড কাঠেই এই দুইটি অংশ তৈয়ারি) এবং মুঠা ধড়ের উপরিভাগে সামনের দিকে খাঁজ কাটিয়া আঁটা,—এইরূপ লাঙ্গলের প্রচলনই বেশী। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে একখণ্ড কাঠের লাঙ্গল (অর্থাৎ ধড়, মুড়া ও মুঠা তিনটি অংশই একটিমাত্র কাঠে তৈয়ারি) এবং মুঠা ও ধড় অখণ্ড, মুড়া স্বতন্ত্রভাবে আঁটা—এই দুই শ্রেণীর লাঙ্গলই বেশী দেখা যায়। পূর্ববঙ্গে প্রথমোক্ত লাঙ্গল সাধারণতঃ শক্ত মাটির এবং শেষোক্ত লাঙ্গল নরম মাটির ও জোল জমির চাষে ব্যবহৃত হয়।

(৪) ফাল [হি ফার, সাঁ পাল, ইং ploughshare]—লাঙ্গলের মুণ্ড বা মুড়া সংলগ্ন লৌহফলক। 'লখিমপুর জেলায় কোন কোন লাঙ্গলের ফাল বাঁশের তৈয়ারী হয়, লোহার নয়।' (ভারতের গ্রামজীবন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৮তম বর্ষ দ্র)। (৫) ঈষ—লাঙ্গলদণ্ড, আড়া-খু।

শোল, স্বুলটি, সোঁয়াজ—জোয়ালের কাঠি (জোয়াল দ্র)।

সিনি, সিয়াৎ, সেঁওচ, সেওৎ—নানা রকম জলসেচনী (দুনি দ্র)।

হাল—(লাঙ্গল দ্র)। হালবহা, হালবাওয়া—জমি চাষ করা। হালধরা-জ—জমি বর্গাচাষে দেওয়া। নৌকার হাল, rudder। গাড়ির চাকার বেষ্টনী; লোহার লম্বা পাটি। অবস্থা। বর্তমান কাল, বর্তমান কালের (হালের খাজনা)

হালখাতা—ব্যবসায়ীদের নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা।

৩ জোতজমি ও মাটির শ্রেণীভেদ

অত্নু-ফ. ব—মাছের খাত; কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষার জল যখন কমিতে থাকে, তখন এই সকল খাতে (যাহা চাষীরা জমিতে পূর্বেই কাটিয়া রাখে) প্রচুর মাছ আটকা পড়ে। নিকটবর্তী কোনও জিনিষ নির্দেশ করিতে পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য লোকের মুখে ঐযে অর্থেও প্রায়ই অত্নু কথাটি শুনা যায়। অবশ্য এই অত্নু এবং মাছের অত্নুর উচ্চারণ-ভঙ্গি এক নহে।

অনাবাদী—অকর্ষিত, পতিত (-জমি), পড়া/পোড়ো, খিল, বাচড়া-ন।

আউওল, আওয়াল, আওল—উর্বরা, যে-জমিতে অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল জন্মে। তৎপর্যায়:—আওলশোল (প্রধানতঃ ধানের জমি)-বাঁ. বী, জোরাল/মেদে-মু, জোরাট-মে, জুরী-চ, লাল-ন. রাঢ ('সরকার হইলা কাল খিল জমি লেখে লাল।'—কবিক), লালী-ফ, সারুক ভুঁই-জ. কো।

আবাদ—চাষ, নূতন চাষ। ফসলের কর্ষিত জমি। ঝাড় জঙ্গল কাটিয়া স্থাপিত জনপদ (সুন্দরবনের আবাদ)। চাষ-আবাদ—কৃষি, কৃষিকার্য (সহচর শব্দ)। আবাদি—কর্ষিত; যে-জমিতে ফসল উৎপাদন করা হয় (অনাবাদী দ্র)।

আশ-ম ফসলের দিগন্তবিস্তৃত মাঠ (কাতিমারায় এবার আশিকে আশি ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে)। তৎপর্যায়:—বন্দ-পূব. চ, থল-ম, কোলা-ব, বাকুড়/কিয়ার-মু। আশি, আশী—৮০ সংখ্যা, অশীতি।

আষাঢ়ী-ম—আউশ কিংবা পাটের চাষ না করিয়া কোনও জমি আমনের চাষের জন্য রাখিয়া দিলে তাহাকে বলা হয়—আষাঢ়ী জমি।

এক খন্দা ভুঁই-জ. কো. দি—এক ফসলের জমি। তৎপর্যায়:—এক ফসলা, এক ফসলী, এক আড়ি-ম।

কুড়/কুর-ম—জলকুণ্ড; ভূমিকম্পাদির ফলে কোনও স্থান বসিয়া গিয়া যে-গভীর জলাধারের সৃষ্টি করে।

কাচি-মু—চাষের ৩-৪ বিঘা পরিমাণ খণ্ডভূমি। কাচি-চ—চালের বরগা। কাচি-পূব—কাস্তে। কাঁচি-ক—কাঞ্চি। কাঁচী—কম ওজনের (কাঁচী সের)।

কান্দা-পূব—ডাঙা, ডাঙ্গা জমি। হাঁড়ি কলসীর কানা। কলা ইত্যাদির ছড়া (কলার কান্দা-ম)। রোদন করা, কাঁদা।

কিত্তা/কিত্তে—চাষের খণ্ডভূমি (এক কিত্তা জমি), কাচি, খোটু।
কিয়ার-মু—চাষের বৃহদায়তন ভূমি (আশি দ্র)।
কোলা-ব—ফসলের মাঠ ('গৃহ-সামগ্রী' দ্র)।
খনভুঁই-জ. কো. দি—যে-জমিতে শীতকালের শাক সবজির চাষ করা হয়।
খলা/খোলা-পূব—ধান্যাদি মাড়াইবার স্থান। ('খেত খলা নাই তার, নাই হালের গরু।'—মৈগী)। তৎপর্যায় :—খৈলান-ব, খলেন-য, খলান-রং, খামার-পব. রাঢ় ('ঘরবাড়ী' ও 'গৃহ-সামগ্রী' দ্র)।
খাত, খাদ—ডোবা বিশেষ ; বড় গর্ত। তৎপর্যায় :—অহু, গাড়, গাড়া, খানা, ঘোগ, চাবা, মান্দা, পগাড়/পাগাড়। খাদ—সোনারূপা জুড়িবার পান, solder.
খামার—ধান্যাদি ঝাড়িবার বা মাড়াইবার স্থান (খামারে সারি সারি ধানের পালুই)। খামার, খাসখামার—প্রজাবিলি বা বর্গাপত্তন না করিয়া যে-জমি জমিদার বা জোতদার নিজ চাষের জন্য রাখিয়া দেয়।
খালজমি-মে—নীচুজমি; জোলজমি (নাবাল দ্র)।
খিল, খিলজমি—পতিত জমি ; যে-জমিতে কোনও ফসল উৎপাদন করা হয় না ; যে-জমি ঝাড়-জঙ্গল জন্মিয়া চাষের অযোগ্য হইয়া আছে। খিলতোলা জমি-পূব—বনজঙ্গল কাটিয়া কোপাইয়া যে-জমি কর্ষণযোগ্য করা হইয়াছে (খিলতোলা জমিতে পাট ভাল জন্মে), জঙ্গল হাসিল করা জমি-চ।
খোটু-জ. কো—চাষের স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ড, কাচি-মু, কিত্তা।
গাড় / গেঁড়্যা-মে—ডোবা, বড় গর্ত ('চিরকাল গাড়ে থাকি বারি হইল চেঙ। ...'কলমীর শাক খায়্যা উজারিল গেঁড়্যা।'—রারচ), গাড়া-বী, গড়্যা-বাঁ।
গোঠ—গোষ্ঠ, গোচারণভূমি ('কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এগোঠ গোকুলে'—শ্রীকৃ)। গোঠ এককালে গ্রামের গোপতিদের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা অবলম্বন করিয়া বাংলা ভাষায় অপূর্ব পদাবলী সাহিত্য, অসংখ্য মেয়েলী সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। গোষ্ঠের রাখালিয়া গানও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার কম সমৃদ্ধ করে নাই।
গোড়েন, গোঁড়েন জমি-মু—নাবাল জমি ; যে-জমিতে গ্রামের উঁচু জমির জল (গোঁঐড়) গড়াইয়া গিয়া পড়ে এবং সঞ্চিত হয়।
গোবাট, গোপাট—লোকালয় হইতে গোচারণ ভূমি পর্যন্ত গো-মহিষাদি চলিবার গ্রাম্যপথ। তৎপর্যায় :—গোরাট, হালট-ফ. ব, ডহর/ডয়র-ন. দি. মা, ভাঁগাড়-চ.

দি. মা। বাংলা দেশে গোসম্পদ এবং গোচরের যখন অভাব ছিল না, তখন গো-মহিষাদির নিত্য চলাচলের ফলে এই সকল পথের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমানে বহু গোবাটই মানুষ চলার পথে রূপান্তরিত হইয়াছে, তবু কাগজপত্রে এবং লোকের মুখে মুখে তাহাদের পূর্ব নামই চলিয়া আসিতেছে।

ঘোগ-মে—খাত, গর্ত। বন্যজন্তু বিশেষ ('বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা')।

চর—নদীর পলি হইতে উৎপন্ন বিস্তীর্ণ ডাঙ্গা জমি। নদী এক প্যাড় ভাঙ্গিয়া অপর পাড়ে এইরূপ চরের সৃষ্টি করে। অনেক সময় নদীগর্ভেও পলি পড়িতে পড়িতে দ্বীপের আকারে চরের সৃষ্টি হয় ('এপাড় গঙ্গা ওপাড় গঙ্গা, মধ্যিখানে চর')। চরজমিতে কাঁঠাল এবং কোনো কোনো রবিশস্য খুব ভাল জন্মে। চরের মানুষ প্রায়ই দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতির হয়; তাহাদিগকে সর্বদা নদীর খেয়ালী প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয়। নূতন নূতন চরের স্বত্বস্বামিত্ব লইয়া এক সময়ে জমিদারে জমিদারে দাঙ্গাহাঙ্গামার ও মামলা মোকদ্দমার শেষ ছিল না।

ছন ভুঁই-জ. কো—অনাবাদী জমি। **ছবা-ভুঁই**-জ. কো—অনুর্বর জমি।

জমি [আ জমীন]—ভূমি, ভূঁই / ভুঁই। তৎপর্যায়:—ক্ষেত / খেত, খেতখলা, খেতখামার, জমিজমা, জমিজিরাৎ, জমিন, জোত, জোতজমা, জোতজমি। সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে চাষযোগ্য খণ্ড ভূমিকে খেত, রাঢ়ে ও পশ্চিমবঙ্গে জমি এবং উত্তরবঙ্গে ভুঁই বলিতে শুনা যায়।

জলপাই-মে—যে-জমিতে জোয়ারের জল উঠে। টকফল বিশেষ।

জলা—জলাভূমি, যে-জমিতে প্রায় বারমাসই জল থাকে। তৎপর্যায়:—কুঁড়, খাড়ি, বাঁওড়, বাদা, বিল, ঝিল, ভেড়ী, হাওর। **জলান, জোল**—নীচু জমি।

টিকর, টোঙ্গর—টিলা ধরনের অনুর্বর জমি, যাহাতে ফসলাদি বিশেষ কিছু হয় না, টিকরি-হিজ।

ডহর/ডয়র-ন. মা. দি—গো-মহিষাদি চলিবার পথ ('কানা গোরুর ভেনো ডয়র'-প্রবাদ)। ডহর—দহ, জলা, খাত। নৌকার খোল।

ডাঙ্গা-পব. উব—উঁচু জমি, আড়া, কান্দা-পূব, দহি-মে (নাবাল বা নাবোর বিপরীত)। বাংলাদেশে ডাঙ্গাযোগে স্থানের নামের অন্ত নাই। যেমন, নারিকেলডাঙ্গা (হয়ত এখানে একসময়ে প্রচুর নারিকেল জন্মিত), ফরাসডাঙ্গা (তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত), বেদেডাঙ্গা (হয়ত এখানে একসময়ে বেদে শ্রেণীর লোক বাস করিত), কবরডাঙ্গা (কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি প্রসিদ্ধ গোরস্থান), নলডাঙ্গা। ডাঙ্গা—মারকুটে (ছেলেটা ভীষণ ডাঙ্গা)।

ডাব-হিজ—নীচুজমি (নাবাল দ্র)। অপক্ক নারিকেল।

থল [< স্থল ?]—দিগন্তবিস্তৃত মাঠ (ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দুধুং-এর থল বিখ্যাত)।

দহি, দহিজমি—উঁচু জমি (ডাঙ্গা দ্র)। হিন্দীতে 'দহী' অর্থ দধি।

দোজমি-পব. রাঢ়—যে-জমিতে বৎসরে অন্ততঃ দুইটি প্রধান ফসল জন্মে। তৎপর্যায় :—দোফসলা, দোফসলী, দো-আড়ি-পূব, দোখন্দা ভুঁই—জ. কো. দি.।

দহলাভুঁই-জ. কো—নাবাল জমি (নাবাল দ্র)।

নাটা/নাডা-ম—অনুর্বর, যে জমি হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াও ভাল ফসল পাওয়া যায় না। তৎপর্যায় :—মরাটে জমি-চ. মু. ন. মে, সুয়ম জমি-বাঁ, পাথারি-জ. কো। নাটা-ব—লাঙ্গলের রেখা। ফল বিশেষ।

নাবাল, নাবো—নীচু জমি ; যে-জমিতে চারিদিক হইতে বৃষ্টির জল গিয়া পড়ে এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় থাকে। এইরূপ জমিতে আমন ধান খুব ভাল জন্মে। তৎপর্যায় :—নামাল-বী, জলান-বাঁ, খালজমি-মে, ডাব-হিজ, জোলজমি-চ. ন. মু. বর্ধ, গোড়েন জমি-মু, দহলাভুঁই-জ. কো, বাইদ-পূব, নামা, লামা, বিলান জমি-ফ।

পড়া, পোড়ো—পতিত জমি ('মাগে হর একান্তর কোচ পাশে পড়া'-রারচ)। যে বাড়ী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে (পোড়ো বাড়ী)। পড়া—পাঠ, পাঠ করা। পঠিত (ইহা আমার পড়া বই)। মন্ত্রপূত (জলপড়া, তেলপড়া, চালপড়া)। পতিত হওয়া (ফল পড়ে)। পোড়ো, পড়ো—পড়ুয়া, ছাত্র।

পাড় খোলা জমি-মু—পুকুরপাড় সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত নীচু জমি, আড়ি-হিজ।

পাথারি-জ. কো—অনুর্বর জমি (নাটা দ্র)।

পালান-পূব—বাস্তুসংলগ্ন উঁচু জমি যাহাতে সাধারণতঃ শাক, সবজি, বেগুন, লঙ্কা ইত্যাদি উৎপাদন করা হয়। তৎপর্যায় :—বাড়ি-রাঢ়. উব, ভাঁট-রং, বিচরা-ম, উয়ারি-ম. ঢা. ন, ধোসা-হিজ। (বাড়ি এবং উয়ারি—প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। পালান—গোরুর স্তন।

ফালি-উব. পূব—লম্বা ধরনের জমি। ফালা (কুমড়ার ফালি)। ফাড়া কাঠ বাঁশ ইত্যাদির লম্বা পাতলা টুকরা (কাঠের ফালি)।

বুন্দ—ফসলের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। বন্দ—ঘর ইত্যাদির পরিমাপ বিশেষ। যেমন, ১২ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রস্থের ঘরকে বলা হয়—'কুড়ি বন্দের ঘর।' বর্তমানে ধর্মঘট বা হরতাল অর্থেও বাংলায় 'বন্দ' শব্দ শুনা যায় (বাংলা বন্দ)।

বাইদ—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ফসলের (বিশেষ করিয়া ধানের) নীচু জমিকে 'বাইদ' বলে।

বাকুড়-মু—এক চৌহদ্দিভুক্ত বৃহদায়তন ভূমি। বাকড়—উদর, পেট।

বাচড়া জমি—অনুর্বর জমি।

বাড়ি—উত্তরবঙ্গে বাগান বা ফসলের জমি অর্থে বাড়ি শব্দের প্রয়োগ খুব বেশী শুনা যায়। যেমন, বাশবাড়ি, কলোবাড়ি, রামবাড়ি (আম), মরুচবাড়ি, ধানবাড়ি, পানবাড়ি, ঘাসবাড়ি...। রাঢ় অঞ্চলেও শাকসবজি, আখ ইত্যাদির বাগান অর্থে 'বাড়ি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, আদাবাড়ি, আখবাড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়ও অনুরূপ অর্থে বাড়ি শব্দ কখনো কখনো প্রযুক্ত হয়।

বাড়ি—লাঠি। ('ঘরবাড়ী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

বাথান, বাতান—গোষ্ঠ, গোচারণ ভূমি। যেখানে গো-মহিষাদি রাখা হয়।

বাদা—বিবিধ জলজ উদ্ভিদ, দল, ঘাস ইত্যাদিতে পূর্ণ জলাভূমি।

বাদাড়—জঙ্গল, জঙ্গুলে স্থান (বন-বাদাড়)।

বিচরা-ম—বসত বাড়ী সংলগ্ন বেগুন, মরিচ, তামাক ইত্যাদি উৎপাদনের খণ্ড-ভূমি (তামুকের বিচরা)।

ভিটাজমি—উঁচু জমি, যাহাতে হয়ত এক-কালে লোকের বাড়ীঘর ছিল, আইট-য।

মাটি—বাংলা দেশের মাটি নানা প্রকার :—(১) এঁটেল, আঁটালো, মাটিয়াল/ মাইট্যাল, চিকনা—শক্তমাটি ; এই মাটিতে বালি এবং পলির পরিমাণ খুব কম, কাদার পরিমাণ বেশী। (২) কাঁকরিয়া (কাঁকুরে-ক, কাঁকর্যা-রাঢ়)—কাঁকরযুক্ত মাটি। (৩) কাদামাটি —পাঁকমাটি, নরম মাটি ; জলের সংস্পর্শে যে মাটি সহজেই গলিয়া যায়। (৪) খড়িমাটি—শাদা রঙের মাটি। (৫) দোআঁশ, দোআঁশলা—ইহাতে বালি এবং কাদার পরিমাণ প্রায় সমান, ইহাতে কোনো কোনো ফসল খুব ভাল জন্মে। (৬) নোনামাটি—যে মাটিতে লবণের ভাগ বেশী। (৭) পলিমাটি—বন্যা ও নদ্যাদির স্রোত বাহিত মাটি, alluvium ; এই মাটিতে ফসল খুব ভাল জন্মে। (৮) পাউস মাটি—জল পড়িলে এই মাটি অল্পক্ষণেই চুনের মত গলিয়া ফুলিয়া উঠে। (৯) বাউস্তমাটি—কালো রঙের মাটি। (১০) বিন্দেমাটি—রাঙ্গামাটি বিশেষ, না-লাল না-শাদা এইরূপ মাটি ; ধারি এবং মেঝে নিকানোর কাজে এই মাটি গৃহিণীদের অতিপ্রিয়। (১১) বেলে মাটি—এই মাটিতে বালির পরিমাণ খুব বেশী ; বেলিয়া-বাঁ, বালুয়া/ বালুয়া-পূব। (১২) রাঙ্গা মাটি—ঈষৎ লাল রঙের মাটি। (১৩) রেতিমাটি—ধুলামাটি ;

সাধারণতঃ নদী মজিয়া এইরূপ মাটির সৃষ্টি হয়। (১৪) হিটেল মাটি—চাষের সময় যে-মাটি হইতে বড় বড় ডেলা উঠে এবং সহজে গুঁড়া হইতে চায় না।

মান্দা-ম—মাছের খাত (সাধারণতঃ এই খাত নাবাল জমিতে করা হয়)।

মেঁদেজমি-মু—উর্বরা জমি (আউওল দ্র)। **লালজমি**-রাঢ়—উর্বরা জমি।

শালিজমি-পব—আমন ধানের জমি, শোলজমি-রাঢ়, নালী জমি-ফ।

হাওর-ম. শ্রী—বৃহৎ জলাভূমি। কোনো কোনোটির আয়তন বহুশত বিঘা। বর্ষাকালে ইহারা সাগরের রূপ ধারণ করে, তাই ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা হাঁওর বলিয়া থাকে। হাওর শব্দটি সাগর/সায়র শব্দের উচ্চারণভেদ। অনেক হাওরেরই মধ্যভাগে প্রায় বার মাস জল থাকে এবং উহাদের চারিদিকের ঢালু জমিতে আমনের চাষ করা হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসেই চষা জমিতে বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়, বর্ষায় জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই শ্রেণীর আমনের স্থানীয় নাম **বাওয়া**। হাওরের অগভীর জলায় বোরো ধানও প্রচুর জন্মে। লোকসংখ্যা যখন এত বাড়ে নাই এবং জমির চাহিদা কম ছিল, তখন কোনো কোনো হাওর অনাবাদী অবস্থায় নলখাগড়ার বনে আচ্ছন্ন থাকিত এবং সেগুলি দস্যুতস্করের থানা হইয়া উঠিত ('জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবন। দিনেকের পথ জুড়ি নলখাগড়ার বন' ॥—মৈগী)।

হালট—(গোবাট দ্র)।

৪ জমি তৈয়ারি, ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহ

অরগা-ফ [ইং scarecrow]—গ্রামে পথ চলিতে প্রায়ই দেখা যায়, ফসলের জমিতে উঁচু বংশদণ্ডের মাথায় খড়ের একটি অত্যদ্ভুত মূর্তি চুনকালি মাখানো হাঁড়ি, ছেঁড়া জামা-জুতা, মুড়া ঝাঁটা ইত্যাদি পরাইয়া বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বলা হয়—(১) সহসা এইরূপ একটি আচাভুয়া মূর্তি দেখিয়া পশুপক্ষী ভীত হইয়া শস্যের ক্ষতি না করিয়া পলাইয়া যাইবে। (২) দ্বিতীয়তঃ এমন অনেক কুদৃষ্টিসম্পন্ন (নজুরে) লোক আছে (দেবতাদের মধ্যে যেমন শনি), যাহাদের দৃষ্টি সোজাসুজি কোনও সুন্দর জিনিষের উপর, বিশেষ করিয়া খন্দ ভুঁইয়ের উপর পড়িলে উহার বিকৃতি ঘটে। কিন্তু ঐ নজুরে লোকের নজর যদি প্রথমেই অন্য কোনও বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার অনিষ্টকারিতা হইতে আসল বস্তু রক্ষা পায়। পশুপক্ষীর ভীতি উৎপাদন এবং নজুরে লোকের 'নজর' প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে স্থাপিত ঐরূপ মূর্তির বাংলার

নানা স্থানে নানা নাম শুনা যায়। যেমন, অরগা-ফ, আচাভুয়া-রং, ভুতি/নজর কাটা-জ. কো, ভুলা-ম, ঠিকুন-মু, কাকতাড়ুয়া-খু, কেউয়াখেদা-বাঁ।

আইড়-রা—খড়। ক্ষেতের আড়ি, আল। মৎস্যবিশেষ।

আইতান / আইত্যান-ম—আশ্বিনের প্রবল ঝড়বৃষ্টি; ইহা অনেক সময় ফসলের ক্ষতি করে। **আইল**—(আলি দ্র)।

আইলচা-ঢা—ধানের ছোট ছোট আটি। **আইসা**-নো, **আউড়**-রা. দি—খড়।

আউড়ি-বা—খড়। -খু.য—ধান্যাধার, গোলা। -পা. দি—জোয়ালের মধ্য ভাগ।

আউয়জ, আওয়জ-পূব—লাঙ্গলের রেখাবেষ্টিত ডিম্বাকার স্থান; চাষ করিবার সময় লাঙ্গলের এক এক পাকে যতটা স্থান বেষ্টিত হয় (এক আওয়জ জমি)। তৎপর্যায়ঃ—আঁতর / আঁতোর-রাঢ়. চ. ন. য. খু. ব. ফ. উব, আঁচোল-মু।

আউশ, আউষ—আশুধান্য, বর্ষাকালের ধান্য; যে ধান অল্প সময়ে বর্ষাকালে উৎপন্ন হয়। ইহাকে উত্তরবঙ্গের কোথাও (রং) 'বিতরী', কোথাও (জ. কো.) 'ভাদোই ধান' বলা হয়। আউশ, আশ—সাধ, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সখ (আউশের জিনিষ; তার কিছুতেই আশ মেটে না)।

আওতা-পা—শস্যরক্ষার্থে মাঠে থাকিবার কুঁড়ে বা ঝোপড়ী বিশেষ। বৃক্ষাদির ছায়া বা ছায়ায় ঢাকা স্থান। আয়ত্ততা (ইহা আমার আওতার বাহিরে)। আবরু বেড়া।

আওরা, আওরাবেড়া-ঢা—কচুরিপানা, জলজ ঘাস ইত্যাদির অনুপ্রবেশ হইতে জোল জমির ধান রক্ষার্থে যে বেড়া দেওয়া হয়।

আঁকড়াভাঙ্গা, আকর / আখর—(উগাল দ্র)।

আগনে পলানো-বী—আগনে 'অঙ্গন'-এর আঞ্চলিক রূপভেদ। ধান কাটিয়া বাড়ী আনিবার পূর্বে গৃহস্থেরা তাহাদের উঠান আঙ্গিনা খামার কোপাইয়া পিটাইয়া গোবরজলে মাজিত করিয়া লয়। এই কাজের নাম 'আগনে পলানো'।

আগবাড়ানি, আগলওয়া-পূব—ব্যাপকভাবে ধানকাটার পালা আরম্ভ করিবার পূর্বে কোনও শুভদিনে শাস্ত্রীয় বা দেশাচারবিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রথম ধান্যচ্ছেদন। চব্বিশপরগনার কোথাও কোথাও এই অনুষ্ঠানকে বলে 'হেলাধরা', উত্তরবঙ্গে রাজবংশীরা বলে 'ধানকাটা পূজা।'

আগলানো (ফসল)—দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ বা পশুপাখী দ্বারা যাহাতে উৎপন্ন শস্যের কোনও ক্ষতি না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা; ফসল রক্ষা করা।

আগোল বাঁধা-বাঁ. বী, **আগোল বাঁধকরা**-মু—জমির ফসল আগলানোর ব্যবস্থা। ঝড়বৃষ্টি, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে পারিয়া না উঠিলেও দুষ্টপ্রকৃতির মানুষ এবং পশুপাখীর অত্যাচার উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য কৃষকেরা নানারূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে ; এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে ফসল পাকিয়া উঠিবার মুখে জমি পাহারার জন্য পয়সা দিয়া লোক নিযুক্ত করা অন্যতম। খণ্ড খণ্ড জমি—**আগোল** এবং যে-ব্যক্তি পারিশ্রমিক নিয়া আগোলের ফসল রক্ষা করে, সে **আগোলদার**।

আঁচড়াপড়া—জমিতে প্রথম লাঙ্গল দেওয়া, জমি ভাঙ্গা (উগাল দ্র)।

আচাভুয়া—অত্যদ্ভুত। অত্যদ্ভুত মূর্তি বিশেষ (অরগা দ্র)।

আঁচোল—আউয়জ দ্র।

আটি, আঁটি—আঁট করিয়া বাঁধা শস্য তৃণ ইত্যাদির গোছা (ধানের আটি, খড়ের আটি, শাকের আটি)। স্থান এবং বস্তুভেদে আটির নানা আঞ্চলিক নাম শুনা যায় :—বিড়া-মে, বিঁড়্যা-বাঁ. বী—জোল জমির ধান জলের উপরে কাটিয়া বড় বড় করিয়া যে আটি বাঁধা হয়। ময়মনসিংহে ধানের ঐরূপ আটিকে (তাহা জোল বা ডাঙ্গা যে জমিরই হউক না কেন) ধানের মুড়ি বলা হয়। নাড়ার আটিকে তদঞ্চলে 'গলা' বলে ; উহা ২৪ পরগনার খড়ের প্রায় ২০ আটির বা ১ তরপার সমান। পানের ছোট আটি—গোছ, বিড়া (গাঙ্গেয় অঞ্চলে ৩২টি এবং মেদিনীপুরে ৫০টি পানে ১ গোছ। পাবনায় ৪০টি পানে ১ বিড়া, কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ১ বিড়া বলিতে বুঝায় ৮০টি পান)। পাটের ছোট বড় নানা রকম আটিরও নানা নাম শুনা যায় :—বিচকা, বুঙ্গা, মোড়া, লাছি, ডুপলি।

আঁটি, আঁঠি—কঠিন খোলাযুক্ত বড় জাতের বীজ (আমের আঁঠি, তালের আঁঠি)।

আড়, আড়ি—ক্ষেতের আল ('আড়ি তুল্যা ধারে ধারে ধরাইল ধান'-রারচ)। অর্থান্তর 'গৃহ-সামগ্রী' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আঁতর/আঁতোর—লাঙ্গলের রেখাবেষ্টিত স্থান (আউয়জ দ্র)

আতাল-ফ—মরিচ, বেগুন ইত্যাদির চারা উৎপাদনের স্থান, আপর-পা। -য—লাউকুমড়ার মাচা। আতাল/আতাইল-পূব—মাছের বাসা; কোনো কোনো মাছ জলের নীচে মাটিতে গর্ত করিয়া বাসা বাঁধে। -ঢা—মুরগী থাকার ঘর।

আমন—হৈমন্তিক ধান, হেঁউত-রং; এই ধানের অধিকাংশই হেমন্তকালে পাকে। আমন ধান বাঙ্গালী কৃষকের সর্বপ্রধান ফসল। এই ফসল নির্বিঘ্নে বাড়ী আসিলে সে মনে করে, লক্ষ্মী গৃহগত হইল। এই ধানের আমান্নই সে দেবতার উদ্দেশে

নিবেদন করে। আমনধান দুই রকমে উৎপন্ন করা হয়:—শুকনার চাষে বীজ ছিটাইয়া এবং কাদানো জমিতে চারা রোপণ করিয়া অর্থাৎ রোয়া লাগাইয়া। যেসব অঞ্চল বর্ষার প্রথমেই জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেসব অঞ্চলেই প্রথমোক্ত প্রণালীর চাষ অধিক দেখা যায়।

আলি, আল, আইল—জমিতে জল আটকাইবার বা জমির সীমানির্দেশক অনুচ্চ বাঁধ। তৎপর্যায়:—আড়, আড়ি-রাঢ়, বাতর-ম ('আইলবাতর' সহচর শব্দ)। আইল ছোলা-ম—চাষ করিবার সময় কোদাল দিয়া আইলের ধারের ঘাস আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। আইল কাটা—সীমানা উল্লঙ্ঘন করা; ইহার জন্য শরিকে শরিকে প্রায়ই মামলা-মোকদ্দমা হয়। আলপথ—গ্রামের মেঠো পথ; আলের উপর দিয়া চাষীদের ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে যে-পথের সৃষ্টি হয়।

ইটা-ম—মাটির ঢেলা। ঢিল। ইটা মারা—ঢিল ছোঁড়া।

উগাল-রাঢ়—এক চাষ বা প্রথম চাষ। তৎপর্যায়:—এগো চাষ-মে, আঁকড় ভাঙ্গা-চ, জমিভাঙ্গা, আঁচড়াপড়া, লাঙ্গলপড়া, আকর / আখর-রা. বং।* সামাল-রাঢ়. ম,—দুই চাষ বা দ্বিতীয় বার চাষ। তৎপর্যায়:—পাখনা-বাঁ, বোরানি-মে, পচানো-চ, দো-আর-ন. য. খু, দোছা-ব. ফ।* তে-চাষ—তিন চাষ বা তৃতীয় বার চাষ। তৎপর্যায়:—তেউড় চাষ-রাঢ়, তে-আর-ন. য. খু, তেছা-ব. ফ, কাদানো-চ. মে। **উগালা**—চাষ করা (উগালা গেলা)।

উরুলি-মু—গোরু মাড়ানো খড় (খড় দ্র)। উরুলি-আসা—হুলুধ্বনি।

উলিয়া-মে—ধানের ছোট আটি।

উলু, উলুখড় [সং উলুপ, উলূক]—শক্ত জাতের তৃণ বিশেষ। পূর্ববঙ্গে ঘর ছাওয়ার কাজে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায়:—উল্যা-পা, জোন-মে, উলুছন / ছন / বন-পূব ('শীতল পাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া। উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহরা॥'—মগী)। নদীয়ার কোথাও কোথাও উলুখড়কে খড় এবং ধানের খড়কে বিচালি বলা হয়। উলু / উলি-পূব—উইপোকা। উলু—স্ত্রীলোকদের হুলুধ্বনি।

কাইতান / কাইত্যান-ম—কার্তিক মাসের প্রবল ঝড়বৃষ্টি। আইতান কাইতান দুই-ই ধানের পক্ষে খুব ক্ষতিকর। ইহাতে ধানগাছগুলি ধানপাকার মুখে জলে কাদায় শুইয়া পড়ে এবং ফসলের সমূহ ক্ষতি হয়।

কাকতাড়ুয়া (অরগা দ্র)। **কাঁড়, কাঁড়ি**—স্তূপ, রাশি, heap (ধানের

কাঁড়ি)। কাঁড়—তীর। কাঁড়ি—তালগাছের সারাংশ,—যাহা সাধারণতঃ ঘরের খুঁটি, আড়া ও পাড় রূপে ব্যবহৃত হয়।

কাড়ান, ধান কাড়ান—ছিটানো আমনের বৃদ্ধির মুখে জোল জমিতে সামান্য চাষ ও মই দিয়া ঘন ধান, ঘাস, দল ইত্যাদি উপড়াইয়া ফেলা ('আষাঢ়ে কাড়ান নামকে, শ্রাবণে কাড়ান ধানকে'—খনার বচন)। পূর্ববঙ্গে আমনের জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পর কাড়ানের বড় প্রয়োজন হয় না ; অতিরিক্ত চাষ এবং মই দিয়া পূর্বাহ্লেই এই কাজটি প্রায় শেষ করিয়া ফেলা হয়। কিন্তু আউশ এবং পাটের জমিতে নিড়ান-কার্য পূর্ণোদ্যমে চলে।

এখানে রাঢ় অঞ্চলের কতগুলি ঘাস, দল, আগাছার নাম দেওয়া গেল :

'আঁঠু পাড়্যা ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান ॥
বারবট্যা বরাট্যা চেঁচুড়্যে ঝাড়া উড়ি।
গুলমুথা পাতি মার্যা পুত্যা খায় নুড়ি ॥
দল দূর্বা সোলা শ্যামা তেশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা থড় উপাড়ে দুর্ দুর্ ॥
থর থর খুঁজিয়া থড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি কুলি কর্যা চলে ধর্যা ধান্য ঝাড় ॥'—রারচ

কাতিমারা—অত্যধিক থরার ফলে শস্যহানি ঘটা। **কাদানো**—(উগাল দ্র)।

কিয়ারি, কেয়ারি [সং কেদার]—গাছের গোড়ায় জল দিবার সুবিধার্থে উহার চারিদিকে মাটির যে বেড় দেওয়া হয়। শাকসবজির আলঘেরা ছোট ছোট জমি। কিয়ারি—চিকিৎসা বিশেষ ('হেল্যার কিয়ারি করি কৃমি কৈল দূর'—রারচ)। কিয়ারি করা—সভ্যভব্য করা।

কিরা-ম—শস্যের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ। কিরা / কিরে—শপথ, দিব্য (আমার মাথার কিরে, যেয়ো না)। কিরা কাটা—শপথ করা।

কুটা-ব. ফ—গোরুমাড়ানো খড় (কুটার মেই—খড়ের গাদা)। কুটা, কোটা—আঁকুশি, বিশেষ।

কুড় [সং কূট]—রাশি, স্তূপ, খড়ের গাদা ('পোয়াল কুড় সমান হনূমান তোলে ঢেলা'—কবিক)। আবর্জনাদি ফেলিবার স্থান (আঁস্তাকুড়, পাঁশকুড়, সারকুড়)। কুষ্ঠ ব্যাধি। গাছ বিশেষ (মূলে ঔষধ হয়)। কুঁড়—বৃহৎ জলকুণ্ড (চাষ-আবাদ ৩ দ্র)।

কুঁয়ে লাগা—পোকায় ধরা। **কুলি**-রাঢ়—সঙ্কীর্ণ পথ ('মৃত্তিকায় মৎস্য ধর

মধ্যে কর কুলি'—রারচ)। বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের একটি অংশের নাম 'কামারকুলি।' কুলি, কুলী—মুটে। কুলি—কুল্লি, কুলকুচা। কুলি, কুইল-ম কোকিলের আঞ্চলিক রূপভেদ।

কুলোদেওয়া-মু. মে—কুলার বাতাসে ধান হইতে কুটা-চিটা পৃথক করা। তৎপর্যায়:—ধানসারানা-বাঁ. বী, হুকদেওয়া-জ. কো. রং, ধানবোলানি-ফ, ধান উড়ানি-ম।

কেইল-পূব—সবজিক্ষেতের সারিবদ্ধ আল (আলুর কেইল, হলদির কেইল)। তৎপর্যায়:—চূড়-মে, দাঁড়া-পব, কান্দি-ব।

খড়—শুষ্ক তৃণ। ফসল পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ ধান গম যব ইত্যাদির গাছ; ধান্যাদির ফসল ছাড়ানো কাঠি বা নাল। বাংলার বহু অঞ্চলে ধানের খড় বলিতে (যাহার প্রাদেশিক উচ্চারণ খেড় / খের / খ্যার) গোরু-মাড়ানো খড়কেই বুঝায় এবং উহা ধানগাছের মাথার দিকের খণ্ডিত শস্যহীন অংশমাত্র। সেসব অঞ্চলে মুণ্ডিত ধানগাছের নিম্নাংশের সাধারণ নাম নাড়া (নাড়া দ্র)। বাংলার অপর বহু অঞ্চলে ধান ঝাড়িয়া লওয়ার পর (ধান ঝাড়াই দ্র) শস্যহীন গোটা ধান গাছগুলিই খড় নামে অভিহিত হয়। গোরুমাড়ানো খড়—খেড় / খের / খ্যার, পল, পোয়াল, কুটা, উরুলি, বিড়িখড়, আইড় / আউড়। ঝাড়াই খড়—খড়, বিচালি, বিচালি খড়। খড়-ন—উলুখড় (উলু দ্র)।

পচা খড়—আইলসা-রা, হজা-মে। গো-মহিষাদির জন্য কুচি কুচি করিয়া কাটা খড়—শানি (শানি কাটা বঁটি)।

খন আবাদ-উব—শীতকালের শাক সবজির চাষ।

খরা—গ্রীষ্মাধিক্য, খরান-ম। দীর্ঘকাল এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে খর রৌদ্রে কোনও অঞ্চলের প্রায় সমুদয় শস্য বিনষ্ট হইলে সেই অঞ্চলকে বলা হয় 'খরা অঞ্চল'। **খেড়**—(খড় দ্র)।

গল্লা-ম—নাড়ার আটি; ইহা চব্বিশ পরগনার প্রায় বিশ আটি বা এক তরপা খড়ের সমান। গল্লা-মু—শস্যাদির আটি। গলদা চিংড়ি।

গহি / গোহি-জ. কো—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলের ফলা জমিতে যে রেখা টানে।

গাইলা, গাইলা লাগা-ম—ধানজমিতে অনেক সময় দেখা যায়, মধ্যে মধ্যে ধান গাছগুলি বাড়িতেছে না, আস্তে আস্তে মরিয়া যাইতেছে। ধানের এই অবস্থাকে বলা হয়—বসে যাওয়া-রাঢ়. পব, গাইলা লাগা-ম। মরাটে ঐ ধান গাছগুলির নাম গাইলা।

গাড়ান / গাড়ানি-দি. মা—রোয়া লাগানো। গাড়া—পোঁতা, প্রোথিত করা। ডোবা, খাত।

গাদা-—রাশি, স্তূপ (খড়ের গাদা-চ. মে)। তৎপর্যায়ঃ— কাঁড়, কাঁড়ি, রাশ, রাশি, টাল-পূব, কুড়। গাদা—মাছের পিঠের দিকের অংশ (মাছের গাদা)। লাঙ্গল কাঠের মধ্য ভাগের মোটা অংশ (লাঙ্গলের গাদা)। গাদা—ঠাসিয়া ভরা (বন্দুকে বারুদ গাদা)। গাদা দেওয়া, গাদি দেওয়া—স্তূপীকৃত করা। গাদি—অপেক্ষাকৃত ছোট স্তূপ (কাপড়ের গাদি)। গাদাগাদি—ঠাসাঠাসি।

গুছি—ছোট গুচ্ছ। (চাষে) কাদানো জমিতে ধানের প্রায়ই দুই-তিনটি করিয়া চারা একসঙ্গে রোপণ করা হয় ; এইরূপ দুই-তিনটি চারার এক একটি গুচ্ছকে গুছি বলা হয়। গুছি দেওয়া-ম—রোয়া লাগানো। (সাজসজ্জায়) চুলের মূল গোছার সঙ্গে ফিতা বা পরচুলার সংযোজন।

গুটা-পূব—ফলাদির (সব ফলের নয়) পাতলা খোসাযুক্ত বিচি, seed (লাউয়ের-, কাঁঠালের-)। গুটা, গুটি—বসন্তের ব্রণ।

গুটি-চ—সদ্যোজাত ফল (আমের গুটি)। তৎপর্যায়ঃ—কুষি-ন. মু. ব. ক, চুনা-মে, কড়া-পা. পূব। ছোট বর্তুলাকার বস্তু। রেশমের গুটি—রেশমের ডিম্বাকার কোষ, cocoon। বসন্তের গুটি—বসন্তের ব্রণ (গুটা দ্র)। গুটি পোকা—নানা জাতের রেশমের গুটিমধ্যস্থ কীট।

গুমা, গুমা দেওয়া-ম—আমন ধানের সাধভক্ষণ বা দোহদদান সংস্কার বিশেষ। ধান গাছের গর্ভে শীষের উদ্গম হইলে আশ্বিনের সংক্রান্তিতে (নল সংক্রান্তি, ডাক সংক্রান্তি) কৃষক গৃহস্থেরা গন্ধাদি দ্বারা ধান্যলক্ষ্মীকে অভিনন্দিত করে। সেদিন তাহারা আমের পাতায় সুগন্ধি মশলা (তৈলপক্ব মেথি ইত্যাদি) মাখাইয়া পাকাটির মাথায় করিয়া ধানের ক্ষেতে ক্ষেতে গুঁজিয়া দিয়া আসে এবং ডাক দিয়া বলে—

আশ্বিন যায় কার্তিক আসে সকল শস্যের গর্ভ বসে,
রামের হাতের 'গুমা' ধান হইস তিন দুনা।
[দ্র 'সোনালী ধান', মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১]

কোথাও 'রামের' স্থলে 'ভীমের' বলা হয়। (নল সংক্রান্তি ও লখীডাক দ্র)।

গোছ-চ. ন. মে--পানের গুচ্ছ, কোথাও (চ. ন) ৩২টি, কোথাও বা (মে) ৫০টি পানে এক গোছ। পায়ের গোছ বা গোছা, ankle ধরন (লোকটা কেবলা গোছের)। গোছগাছ—সাজানো গোছানো।

গোছলা-য—শস্যাদির গোছা। **গোছা**—গুচ্ছ, আটি।

গোড়া কাঠি-হিজ—শস্যবিহীন ধান্যনাল।

গোরুর পালা-জ. কো—গোরুকে খাওয়াইবার জন্য আধিয়ার কর্তৃক গিরিকে দেয় খড়ের অংশ।

ঘুঁটি-চ—জোল জমির সীমানা নির্দেশক জলজ ঘাস ইত্যাদির স্তূপ, টেলিয়া / টেইল্যা-ম। পাশা খেলার ঘুঁটি (ঘুঁটি চালা)।

ঘুরি-ম—লাউ কুমড়া প্রভৃতি লতানিয়া গাছের মাচা, আতাল-য, ঝাঁকা-ব।

চাকা-পূব—মাটির ছোট ডেলা (ইটা দ্র)। চক্রাকার (গায়ে চাকা চাকা দাগ)। চক্রাকার বস্তু (মাছের চাকা, গাড়ির চাকা)।

চাঙ্গড় / চাঙড়—মাটির বড় ডেলা। তৎপর্যায় :—ঢেলা, ঢিমুল-জ. কো, মাটির চাপ-মে, মাটির পাট-মে, হুড়া-হিজ, ইটা / চাইন / চাকা-পূব। জমি কোপাইলে বা চাষ করিলে যে চাঙ্গড় উঠে, মই দিয়া (কখনো বা লম্বা বাঁটের মুগুর দিয়া) তাহা গুঁড়া করা হয়। মাটি মাখিয়া বড় বড় যে পিণ্ড করা হয়, তাহাকে বলে 'মাটির তাল'।

চানা—খড়ের গাদা (উত্তর ময়মনসিংহেই এই কথাটি বেশী শুনা যায়)। চানা—ডাল জাতীয় শস্য, ছোলা।

চালা—(চাষে) শস্যাদির ঘনজাত চারা, জমির ঘাস, আগাছা ইত্যাদি উৎপাটন করা, weeding. উঁচু নীচু মাটি কোদাল মই ইত্যাদি দ্বারা চালিয়া সমান করা ('চারিদণ্ডে সকল চৌরস কৈল চাল্যা'—রারচ)। 'ঘরবাড়ী' ও 'গৃহ-সামগ্রী' দ্র।

চাষান / হালবহা-উব—জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, লাঙ্গল করা, হাল বাওয়া-পূব।

জাওয়ালি-খু—ধানের চারা যাহা বীজতলা হইতে উঠাইয়া কাদানো জমিতে লাগানো হয়। তৎপর্যায় :—জিওলি-য, জালা-ম. ঢা. নো. ত্রি, বিয়ন / বেয়ন-চ, বেন / ব্যান-মে, বীচ-বাঁ. বী, পাত-ব।

জাঙ্গাল [সং জঙ্ঘাল]—আল জাতীয় উচ্চ প্রশস্ত বাঁধ। অনেক ব্রতকথায় 'কড়ির জাঙ্গাল' কথাটি পাওয়া যায়।

জালা-ম. ঢা. নো. ত্রি—ধানের চারা। ('গৃহ-সামগ্রী' দ্র)। **জালাপাট**-ম. ঢা.—ধানের চারা উৎপাদনের স্থান, জালা-বিচনা-নো।

জুরা, জুরি-ম—নালা, পয়ঃপ্রণালী। **ঝাঁকা, ঝাঁকানিয়া**—বাঁশের বহু কঞ্চিযুক্ত আগা। চাষীরা লতানিয়া গাছের গোড়ায় এইরূপ আগা পুঁতিয়া বা উহা দ্বারা মাচা বাঁধিয়া দেয়। **ঝাড়াই**—(ধান ঝাড়া দ্র)।

ঝোপড়ি—ফসল আগলাইবার জন্য মাঠে ঝোপের মত করিয়া তৈয়ারি কুঁড়ে।

টেলিয়া/টেইল্যা—(ঘুঁটি দ্র)। **ডেঙ্গা**-ম—নটে ডাঁটা-চ, ডাঁটা, খাড়া। নাড়া, (নাড়াখড়), নেড়া ধান্যনাল।

ঢিমুল—(চাঙ্গড় দ্র)। **ঢেলা**—মাটির ডেলা। ঢিল। বড় উকুন।

তরপা, তরফা-চ—খড়ের বড় আটি; ধানের খড়ের ছোট ২০ আটিতে এক তরপা, ৯ তরপায় এক পণ, ১৬ পণে এক কাহন (গল্লা দ্র)।

তেউড় চাষ, তেচাষ, তেছা, তেয়ার—তৃতীয়বারের চাষ (উগাল দ্র)।

থানা-বী—শাকসবজির চারা উৎপাদনের স্থান। পুলিস ষ্টেশন। আস্তানা।

দাওনমড়া-চ—পাটায় ধান ঝাড়িবার সময় ধানের যেসব ছোট ভাঙ্গা নাল এদিক ওদিক ছিটকাইয়া পড়ে, সেগুলিকে জড় করিয়া গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ধান পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এই কাজকে 'দাওনমাড়া', কোথাও বা (ন. চ. মু. বী) 'পোলমাড়া' বলা হয়।

দাওয়া-পূব—ধান কাটা। **দাওয়া-মাড়ি**—ধানকাটা এবং আটি আটি ধান খলায় খামারে আনিয়া গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ফসল সংগ্রহের কাজ ('লক্ষ্মী না আগন মাসে বাওয়ার দাওয়ামাড়ি'—মৈগী)।

দাঁড়া—সবজি বাগানের সারিবদ্ধ অনুচ্চ আল, কেইল-ম. ত্রি; আলু বেগুন ইত্যাদি এইরূপ দাঁড়া করিয়া লাগানো হয়। দাঁড়া—শিরদাঁড়া, মেরুদণ্ড।

দানা—বীজ, বিচি, seed (উচ্ছের দানা, পুঁই-এর দানা)। বীজের মত বস্তু (সাগুদানা)। দানা—অন্ন (তিন দিন তার পেটে দানা নাই)। দানাপানি—অন্নজল। দানাদার—মিষ্টি বিশেষ। ঘোড়ার দানা—ছোলা। ঘুগনি দানা—বিবিধ উপকরণমিশ্রিত মটরসিদ্ধ। দানা—দৈত্য; 'দৈত্যদানা' কথাটি পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়।

দোছা, দোআর—দ্বিতীয় বারের চাষ (উগাল দ্র)।

ধান ঝাড়াই-রাঢ়. পব—কাটা ধানগাছ হইতে ধান পৃথক করিয়া লইবার পদ্ধতি বিশেষ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চাষীরা ধানগাছ গোড়ায় কাটিয়া সরু সরু আটি বাঁধিয়া খামারে আনে এবং সেখানে কাঠের কিংবা বাঁশের পাটায় সেগুলি ঝাড়িয়া (আছড়াইয়া) ধান পৃথক করিয়া লয়। পর্যায় শব্দ:—ধান বেড়েন, ধান ঠেঙান।

ধান মাড়াই-পূব. উব. য. খু—কাটা ধানগাছ গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ফসল সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি বিশেষ। এই পদ্ধতি অনুযায়ী চাষীরা ধানগাছ সাধারণতঃ

মাজায় কিংবা মাথার দিকে কাটিয়া বড় বড় আটি বাঁধিয়া খোলায় খামারে আনে ; পরে সেগুলি একটি খুঁটি (মি খুঁটি দ্র) পুঁতিয়া বা বিনা খুঁটিতে বৃত্তাকারে ছড়াইয়া দেয় এবং তাহার উপর দিয়া ৫/৭টি গোরু সারিবদ্ধভাবে ক্রমাগত ঘুরাইতে থাকে। ফলে ধানগাছ হইতে ধান পৃথক হইয়া পড়ে। পর্যায় শব্দ :—মলন, মলন দেওয়া, মলান করা, মাড়া, মাড়া দেওয়া। সমগ্র বাংলার দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক চাষী এই মাড়াই পদ্ধতি অনুসরণ করে।

ধান সারানা—(কুলো দেওয়া দ্র)। **ধোর**—(নালা দ্র)।

নজরকাটা—(অরগা দ্র)।

নবান্ন, নবান, লবান—অগ্রহায়ণে নূতন ধান বাড়ী আসিলে কোনও এক শুভদিনে গৃহস্থ নূতন আলো-চাল, দুধ, ডাব ও মিছরির জল, নারিকেল, নারিকেলের ফোঁপর, গুড়, কলা, কিসমিস ইত্যাদির একটি উপাদেয় মিশ্র (mixture) তৈয়ারি করিয়া দেবতা, পিতৃপুরুষ, গুরু, পুরোহিত, গবাদিপশু, কাক, সকলকে প্রথমে নিবেদন করে এবং পরে নিজে পরিবারস্থ ও নিকটস্থ সকলকে লইয়া তাহা গ্রহণ করে। এই নৈবেদ্য ছাড়াও অনেক পরিবারে এইদিন পায়স-পরমান্ন এবং অন্য বিবিধ চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়র সুব্যবস্থা হয়। কোথাও এই অনুষ্ঠানকে 'নয়া খাওয়া' বলে।

নলসংক্রান্তি-মে. হা—আশ্বিনের সংক্রান্তি ; ইহাকে **ডাকসংক্রান্তি**ও বলা হয়। সেদিন কৃষক-গৃহস্থেরা সুফসল কামনা করিয়া ধানের ক্ষেতে নল পোঁতে এবং ওল, মানকচু, রাইসরিষা, আউশের আলো-চাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপকরণে পূর্ণগর্ভা ধান্য-লক্ষ্মীকে 'সাধ' দেয়, উচ্চৈঃস্বরে নানারূপ ছড়া বলে। ('গুমা' ও 'লখীডাক' দ্র)।

নাটা-ব—লাঙ্গলের রেখা (সীরালি দ্র)। ফলবিশেষ, নাটাকরঞ্জা।

নাড়া-পূব. উব—বাংলার বহু অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে ধানগাছের গোড়ায় না কাটিয়া অনেকখানি উপরে মাথার দিকে কাটা হয় এবং সেগুলি বড় বড় আটি বাঁধিয়া খামারে আনে ও গোরু দ্বারা মাড়াইয়া ধান পৃথক করে। মাথার দিকে কাটা যে নেড়া ধানগাছগুলি ক্ষেতে পড়িয়া থাকে তাহাদেরই নাম নাড়া, কোথাও বা 'ডেঙ্গা'। ঘর ছাওয়ার এবং গোরুর খাওয়ার জন্য ধানগাছের এই নেড়া নিম্নাংশগুলি পরে আবার গোড়ায় কাটিয়া আনা হয়। প্রয়োজন না থাকিলে অনেকেই উহা ক্ষেতে পুড়াইয়া দেয়, জোলজমির নাড়া জলে পচিয়া যায় ; উভয়ক্ষেত্রেই ভাল সার হয় (খড় দ্র)। জোলজমির নাড়া কুড়াইয়া আনিয়া আখের বা খেজুরের রস জ্বাল দিতেও দেখা যায়।

নালা—প্রয়োজনবোধে জমির জল বাহির করিয়া দিবার, কিংবা বাহির হইতে ভিতরে জল আনিবার সরু খাত, পয়ঃপ্রণালী drain. চাষের মুখেই কৃষকেরা জমিতে এইরূপ নালা কাটিয়া রাখে। তৎপর্যায় :—পয়নালা, পয়না-ন, পল্লা-ম, ধোর-রা, নোল-চ, লালা-বাঁ.বী, লালী-মে, জুরা / জুরি-ম (অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত নালা), নালী (সরু খাত)।

পচানো—(উগাল দ্র)। **পয়না, পয়নালা, পল্লা**—(নালা দ্র)।

পল [সং পলাল]—গোরু মাড়ানো খড় (পোয়াল দ্র)। পল-পূব—গাছের অসার অংশ। **পলমাড়া**—(দাওনমাড়া দ্র)।

পাখনা—(উগাল দ্র)। পাখা, ডানা (মাছের পাখনা)।

পাছড়ানি, পাছড়ানো—পাছুড়া, কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। জাপটাইয়া ধরা। পাছড়াপাছড়ি—জাপটাজাপটি।

পাড়া / পারা-ম—সতৃণ ধান্যের স্তূপ, ধানের পাড়া। (চাষ-আবাদ ২ দ্র)।

পালই / পালুই-রাঢ়—ধানসুদ্ধ খড়ের গাদা, ধানের গাদা-রাঢ়.পব, ধানের পালা-পূব, ধানের পাড়া-ম। পালই-ম—ঢেঁকি শাক। একরূপ শক্ত লতা; ইহা চিড়িয়া ডুরির মত করিয়া বাঁধাছাঁদার কাজ করা হয়।

পালা-পূব—খড় বা সতৃণ ধান্যের সুসজ্জিত স্তূপ (খড়ের পালা, ধানের পালা)। —'ঘরবাড়ী' দ্র। পালা দেওয়া—খড় বা ধানের আটি স্তূপ করিয়া সাজাইয়া রাখা। পালা খাওয়ানো—চাষীরা কখনো কখনো গোরু, বিশেষ করিয়া ষাঁড় গোরু রাত্রিতে হিমে ছাড়িয়া বা বাঁধিয়া রাখে, ইহাকে বলা হয় পালা [সং প্রালেয়] খাওয়ানো।

পালো দেওয়া-খু—বেঁশেন-মু। ধান কাটার সময়ে জমির এলোমেলো ধান-গাছগুলি একখণ্ড লম্বা বাঁশ দিয়া চাপিয়া একদিকে হেলাইয়া দেওয়া হয়।

পুঞ্জি, পোয়ালের পুঞ্জি-উব—খড়ের স্তূপ। তৎপর্যায় :—খেড়ের (খেরের) পুঞ্জি / লাছ / চানা-ম, খেড়ের (খ্যারের) পালা-ঢা. টা. ফ. ব. য, কুটার মেই-ব, কুড় / পোয়ালকুড়, পলগাদা, খড়ের গাদা-পব (ছোট স্তূপকে 'গাদি' বলিতেও শুনা যায়), গলাই-জ, পালই / পালুই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গোরুমাড়ানো খড়ের স্তূপ এবং জন দিয়া ঝাড়াইকরা খড়ের স্তূপ দেখিতে ঠিক একরূপ নহে। গোরুমাড়ানো এলোমেলো খড়গুলি একটি শক্ত লম্বা খুঁটির চারদিকে বৃত্তাকারে পাটে পাটে বিছাইয়া দেওয়া হয়; স্তূপটি শেষে একটি বৃহৎ গম্বুজের আকার ধারণ করে। কিন্তু ঝাড়াইকরা খড়ের আটিগুলি প্রায়ই দোচালা বা চৌচালা

ঘরের আকারে সাজাইয়া রাখা হয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের খড়ের গাদা এবং পূর্ববঙ্গের খেড়ের পুঞ্জি বা পালা এক পর্যায়ভুক্ত হইলেও উহাদের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে (খড় দ্র)।

পুঞ্জি—পুঁজি, মূলধন ('পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল'—রারচ)।

পোয়াল—[সং পলাল] খড়, গোরুমাড়ানো খড়। তৎপর্যায় : পল / পোল -পব. মে. ঢা, খেড় / খ্যার-পূব, কুটা-ব।

ফুলোন-রাঢ়—ধানের ফুল বাহির হওয়ার অবস্থা। **বতোর**—(বাত দ্রং)।

বসে যাওয়া-চ—(গাইলা দ্র)। **বাইচাষ**-উব—গভীর চাষ।

বাওয়া-ম. শ্রী—জোল জমির আমন ধান যাহা বীজ ছিটাইয়া উৎপাদন করা হয়।

বাত—জো, উপযুক্ত সময় (চাষের বাত, নিড়ানোর বাত), বতোর। রোগ বিশেষ। **বাতাই**-জ—বোনা, শস্য বপন।

বাহান—ডালপালা, যাহা বাহিয়া লতানিয়া গাছ উপর দিকে উঠে।

বিচালি / বিচিলি / বিচুলি—ধানের খড়, শস্যহীন ধান্যনাল ('বিচালি ঘাটা' কলিকাতার উপকণ্ঠে খড়ের একটি প্রধান গঞ্জ)। নদীয়ায় এই খড় অর্থে বিচালি শব্দেরই প্রয়োগ বেশী শুনা যায় এবং সেখানে খড় বলিতে সাধারণতঃ উলুখড়কেই বুঝায়। আবার কোথাও কোথাও বিচালি বলা হয়— ধানসুদ্ধ ধানগাছকে, যখন সেগুলি গোড়ায় কাটিবার পর কিছু সময় জমিতে বিছানো থাকে। সেই সব অঞ্চলে ধানের খড়কে প্রায়ই বিচালিখড় বা শুধু খড় বলিতে শুনা যায়।

বিচি, বীচি—বীজ, seed তৎপর্যায় :—গুটা, দানা, হালি, আঁঠি।

বিয়ন, বেয়ন, বেন / ব্যান—শস্যাদির (বিশেষ করিয়া ধানের) চারা যাহা সাধারণতঃ বীজতলা হইতে উঠাইয়া নিয়া অন্যত্র লাগানো হয়। (জাওয়ালি দ্র)।

বিয়নডাঙ্গা-চ—বীজতলা হইতে চারা উৎপাটন। দক্ষিণ চব্বিশপরগনায় 'বাউচে রেখে বিয়নভাঙ্গা' কথাটি বেশ শুনা যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, বীজতলা হইতে সমস্ত চারা উৎপাটন না করিয়া ৫।৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর এক একটি 'বীচ' বা চারা রাখিয়া দেওয়া। ইহাতে বীজতলায় আর পৃথকভাবে রোয়া লাগাইবার আবশ্যক হয় না।

বীচ—বীজের আঞ্চলিক উচ্চারণভেদ। ধানের চারা (বীচ মারা—চারা উৎপাটন)

বীচন / বীচোন, বেচন—যথা সময়ে শস্যাদি উৎপাদনের জন্য সযত্নে রক্ষিত ভাল বীজ ('মা মোরে পাঠালে কিঞ্চিৎ বীচনের কারণ'—রারচ। ধানের বেচন)। পূর্ববঙ্গে প্রায়ই বিছুন, বেছন শুনা যায়।

বীজ—যাহা বপন বা রোপণের ফলে উদ্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদ ভেদে বীজ নানা প্রকার। যেমন, ধানের বীজ ধান, শশার বীজ শশার বীচি, আমের বীজ আমের আঁটি বা কলম, পটোলের বীজ পটোলের মূল, আখের বীজ চোখশুদ্ধ আখের ডগা বা টুকরা, কলার বীজ কলার চারা।

বীজধান—ধানের ফসল উৎপাদনের জন্য সযত্নে রক্ষিত সুপক্ক ধান। তৎপর্যায়ঃ—ধানের বেচন / -বেছন, বিছুন ধান / হালি ধান-ম, বেনধান / ব্যান ধান-মে।

বীজতলা (বীচতলা)—অনেক ফল শস্য ইত্যাদির বীজ সরাসরি নির্দিষ্ট জমিতে না লাগাইয়া প্রথমে অন্য কোনও ছোট জমিতে ফেলিয়া চারা বা অঙ্কুর উৎপাদন করা হয়। পরে সেই চারা উঠাইয়া নিয়া যথাস্থানে বসানো হয়। এই পদ্ধতির চাষে যে জমিতে চারা উৎপাদন করা হয়, তাহাকে বলে বীজতলা-ক, বীজখোলা-ন. য. ব, বীজ আড়া-মু, বীচন বাড়ি-উব, তলা পেড়ে-দচ, তলা ক্ষেত / ব্যানতলা-মে, তলা। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও ধানের চারা উৎপাদনের খণ্ডভূমিকে বলা হয় জালাপাট / জালাবিচরা-ম, জালাবিচনা-নো। কাঁকরি-তলা-মে—শুকনার বা ধূলো মাটির তলা ; পাঁচকাতলা-মে—কাদানো তলা।

বীজ মারা (বীচ মারা)—বীজতলা হইতে অন্য জমিতে লাগাইবার উদ্দেশ্যে চারা উৎপাটন। তৎপর্যায় ঃ—বিয়ন ভাঙ্গা-চ, জালা ভাঙ্গা-ম।

বেছন, বিছুন—(বীচন দ্র)। **বেন, বেয়ন** (বিয়ন দ্র)।

বেরন-ব—কাটাই খরচা (ধানের)। **বেরুন**-বাঁ—মজুরি ; বেরুনিয়া—মজুর।

বেঁশেন—(পালো দেওয়া দ্র)। **বৈশালী আবাদ**-জ. কো—বর্ষার ফসলের আবাদ। **বোরো**—গ্রীষ্মকালের ধান, শাইল-ম. শ্রী।

বোরানি-মে—দ্বিতীয় বারের চাষ। প্রথম বারের চাষ—এগো চাষ। তৃতীয় বারের চাষ—কাদা চাষ (উগাল দ্র)। **ভাটি দেওয়া**-চ—আখ বেগুন ইত্যাদির গোড়ায় মাটি উঁচু করিয়া দেওয়া। হাঁড়িতে কাপড় সিদ্ধ করা।

ভাদোই ধান-উব—আউষ ধান। **ভুতা**-জ. কো—খাইখরচ, খোরাকি।

ভুতিয়া / ভুইত্যা-ম—খড়ের মূর্তি। বড় রকমের কিছু (ভুইত্যাকলা—বড়জাতের বীচিকলা)।

ভুর / ভুড়-ম—কলার ভুরার (ভেলা) আকারে সজ্জিত পাটগাছের আটি সমূহ।

জলে ডুবাইয়া পচানোর জন্য এইরূপ করা হয় (নাইল্যার ভুড় / ভুর)। স্তূপ অর্থে 'ধানের ভুঁড়', 'খড়ের ভুঁড়' কথাও শুনা যায়।

মলন—মর্দন (তামাক মলা)। ধান ইত্যাদি মাড়াই, গোরু দ্বারা সতৃণ ধান্যাদি মাড়াইয়া ফসল পৃথক করিবার কাজ (ধান মাড়াই দ্র)।

মাড়া—(ধান মাড়াই দ্র)।

মাদা—ঝিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, উচ্ছে, কাঁকুড় ইত্যাদি তরকারিফলের বিচি পুঁতিবার জাম বাটির মত গর্ত বিশেষ।

মিখুঁটি, মিই, মেই—ধান মাড়াইয়ের পূর্বে কোথাও কোথাও (য. খু. ফ. ব,) মাড়াই-স্থানে দুগ্ধাদি ঢালিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে একটি খুঁটি পোতা হয়; ইহারই নাম মিখুঁটি (মিই, মেই)।

মিখুঁটিকে কেন্দ্র করিয়া ধানের আটিগুলি বৃত্তাকারে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ৫/৭টি গোরু এক সারিতে জুড়িয়া তাহার (ছড়ানো ধানের আটিসমূহের) উপর দিয়া ক্রমাগত ঘুরানো হয়। কোথাও কোথাও (ম. ঢা. ত্রি. শ্রী) মিই খুঁটি পোতা হয় না। সেসব অঞ্চলে সারিবদ্ধ গোরুগুলির যেটি বৃত্ত-স্থানের কেন্দ্রে থাকে, তাহারই পিছনের বাঁ পা সর্বদা প্রায় একই স্থানে থাকিয়া খুঁটির কাজ করে। এই গোরুটিকে 'মেই বলদ', 'মেইয়ার বলদ' বলিতে শুনা যায়।

মুড়ি-ম—ধানের বড় আটি (আটি দ্র)। বাঙ্গালীর প্রিয় জলখাবার। মুড়া, মুণ্ড (মুড়িঘণ্ট, চ্যাংমুড়ি কানী—মনসা)। কিনারা (মুড়ি সেলাই)। লেপ-মুড়ি—লেপ দিয়া গা ঢাকা।

রাশ, রাশি—কোনও বস্তুর স্তূপ, গাদা (ধানের রাশ, ধান্যরাশি)।

রাশ—লাগাম, rein. বাংলায় রাশ শব্দ বিভিন্ন শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে: রাশনাম—জন্মরাশি অনুসারে নাম। রাশধান—ভালমন্দ মিশ্রিত ধান। রাশদই—মাঝারি রকমের দই। রাশভারী—গম্ভীর প্রকৃতির লোক। রাশপাতলা—লঘুপ্রকৃতির লোক। রাশদন—ঠিক মাপের দন (উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম ওজনপাত্র)।

র‍্যা-মৃ—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলকৃত রেখা (সীরেল দ্র)। র‍্যাধরা—চাষ করিবার সময় লাঙ্গলের রেখা সোজা করিয়া নেওয়া। র‍্যাকানা—লাঙ্গলের রেখা আঁকাবাঁকা হইলে চাষীরা বলে, 'র‍্যাকানা হয়েছে।'

রোয়া, রোয়াধান - আমনধান বিশেষ। এই শ্রেণীর আমনের চাষে বীজ না ছিটাইয়া কাদানো জমিতে চারা রোপণ করা হয় (আমন দ্র)। বোরো এবং

শীঘ্র (তিন মাসে) ফলনশীল তাই চুন ধানেরও চারা রোপণ করিতে হয়। কিন্তু রোয়া ধান বলিতে প্রধানতঃ আমন ধানকেই বুঝায়।

লখীডাক, ডাক দেওয়া-উব—আশ্বিন সংক্রান্তির সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা নিজ নিজ ধানবাড়িতে যায় এবং 'লখীড়াক' বা 'ডাক দেওয়া' নামে একটি প্রথা পালন করে। তাহারা পাটকাঠির গোছা (উকা) জ্বালাইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরায় এবং ধানের অধিক ফলন কামনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলেঃ 'সোরহা! সোগারে ধান টোনামোনা, মোর ধান পাকা সোনা। সোরহা!' বিভিন্ন অঞ্চলের ছড়া বিভিন্ন হইলেও ভাবটি প্রায় এক ঃ অপরের ধান তেমন ভাল না হইলেও, আমার ধান যেন ভাল হয়, প্রচুর জন্মে। (The Rajbansis of North Bengal দ্র)।

লাছ-ম. শ্রী—খড়ের গাদা। লাছ (লাস)—মৃতদেহ।

লালা, লালী—নালা ও নালীর উচ্চারণভেদ (নালা দ্র)। **শানি**—(খড় দ্র)।

সামাল—তুই চাষ, দ্বিতীয়বার চাষ (উগাল দ্র)। যোগাড়যন্ত্র ('হালের সামাল কিসে হবে সুন্দরি'—রাঁরচ)। সংবরণ (লোকটা বেসামাল—নিজকে সংবরণ করিতে অক্ষম)। সামাল দেওয়া—সামলানো, সংযত করা। সামাল সামাল—সাবধানতাসূচক উক্তি। সামাল'—সামলাও (তোমার ছেলেকে সাবধান কর)।

স্থাওচাষ—অগভীর চাষ ; বাইচাষ—গভীর চাষ।

সীরালি, স্রীরানি—(সং সীতা, হি হরাঙ্গ, ইং furrow)—লাঙ্গলপদ্ধতি, লাঙ্গলকৃত রেখা ('সীরানিতে সুন্দর সাগর হব ক্ষেতে'—রারচ)। তৎপর্যায় ঃ—সীরেল-চ. ন. য. খু, সীললে-ন, র‍্যা-মু, রেখ / রেগ-ম. ত্রি, পালট-শ্রী, নাটা-ব, গহি / গোহি-জ. কো।

সোনাবাদা-বাঁ—রবিশস্যের ভুঁই। **হজা**—পচাখড়।

হাজাশুখা—অতি বৃষ্টিতে এবং বৃষ্টির অভাবে শস্য নষ্ট হইলে বলা হয় 'হাজাশুখা'র বছর।

হালধরা-জ—বর্গাচাষে জমি দেওয়া, বর্গাপত্তন।

হালা—মুষ্টি পরিমাণ ('চারি হালা খড়ে ছাইল চারি পাট'—কবিক) তৎপর্যায় ঃ—হাতা, গোছলা, গোছা। **হালি**—বীজশস্য (হালিধান)।

চতুর্থ অধ্যায়

উদ্ভিদ

আইরি-ন.বর্ধ [সং আঢ়কী, হি রহড়]—ডালশস্য বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ অড়হর, অড়র-পূব, অড়ল-দচ. খু ('ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি খেতের আড়ে'। য. মো. বাগচী)।

আখ, আক [সং ইক্ষু, হি ঈখ / ঊখ, ইং sugar cane]—খাগড়ার মত তৃণ বিশেষ, যাহার রস হইতে গুড় চিনি ইত্যাদি তৈয়ার হয়। তৎপর্যায়ঃ—আউখ-ঢা. ফ: ব. ত্রি, উখ-ম. ত্রি. শ্রী, কুশিয়ার / কুশাইর / কুশাইল-জ. কো. রং. ঢা. খু. ফ, কুশোর-পা. রা. মু. ম। আখ নানা প্রকারঃ কাজলা, কুইয়ারি, কেজা, গেণ্ডারি, ধলসিন্দুর, বোম্বাই, ভারং, মাদ্রাজী, লম্বরি, লালী ইত্যাদি।

আঁজির—(পেয়ারা দ্র)।

আতা-ক [পো ata, হি শরীফা / সীতাফল, ইং custard apple]—ফল বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—মান্দা'র-বাঁ, সীতাফল-উব, নোনা-ম. শ্রী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কলিকাতা অঞ্চলে যে-ফলটিকে (যাহার বহিরাবরণ গুটি গুটি) 'আতা' বলা হয়, পূর্ব বাংলা ও শ্রীহট্টের বহু অঞ্চলে তাহা 'নোনা' বা শরীফা নামে পরিচিত। আবার সেই সকল অঞ্চলে যাহাকে (যাহার বহিরাবরণ গুটি শূন্য) আতা বলে, কলিকাতা অঞ্চলে তাহাই নোনা [পো anona] নামে কথিত হয়।

আদা [সং আর্দ্রক, হি আদরখ, ইং ginger]—মশলা জাতীয় বহু গেঁড় যুক্ত মূল বিশেষ।

আনাজ [সং অন্নাদ্য, হি অনাজ, ইং vegetables]—খাদ্যরূপে ব্যবহার্য কাঁচা শাকসব্জি ইত্যাদি, আনাইজ-পূব।

আনারস [পো ananas, ইং pine-apple]—অম্লমধুর ফল বিশেষ।

আপেল [হি সেও, ইং apple]—সুপ্রসিদ্ধ ফল।

আম, আঁব [সং অম্র / আম্র, হি আম, ইং mango]—সুপ্রসিদ্ধ ফল; আমের জাতি এবং নাম অনেক। যেমন, লেংড়া, ফজলি, বোম্বাই, গোলাপখাস, গোপালভোগ, ক্ষীরাপাতি, হিমসাগর, কিষণভোগ ইত্যাদি। স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, আকার ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালী তাহার এই প্রিয় ফলটির বহুশত নাম রাখিয়াছে।

আমের মুকুল—আমের মোল-রাঢ়, আমের বোল-ন, আমের বউল-পূব। সদ্যোজাত আম—আমের গুটি-ক, আমের কুষি-ন. ফ. বর্ধ, আমের চুনা-মে, আমের কড়া-পা. ম. ঢা. ফ. ব. ত্রি। আম্র পল্লব—আমসরৎ-ফ. ব।

দরকচা-ম. ফ, দড়কাঁচা-ক—ভিতরে কোথাও নরম কোথাও শক্ত এইরূপ ফল। ডাঁসা, ডাঁটো-ব, রাঁয়া-মে, ডাকরিয়া-ম—পাকিবার পূর্বাবস্থায় উপনীত (ডাঁসা আম, ডাঁসা পেয়ারা ; কিন্তু ডাকরিয়া শুধু আমের বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়)। ডোমক-দচ—আধপাকা। আমসি [সং আম্রপেষী]—ছালছাড়ানো কাঁচা আমের শুষ্ক ফালি। তৎপর্যায় :—আমচুর-ক, ফলসি-পা. ম. ঢা. ফ. ব। আমসত্ত্ব—পাকা আমের ঘনীকৃত শুষ্ক রস, আমোট-বী। কাসন্দি / কাসুন্দি [সং কাসমর্দ]—কাঁচা আম, হলুদ, সরিষা ইত্যাদি সমবায়ে প্রস্তুত আচার-জাতীয় খাদ্য বিশেষ। জনশ্রুতি এই যে, বংশের 'রীত' না থাকিলে কেহ এই জিনিষ তৈয়ার করে না। 'রীত' থাকিলে বিশেষ দিনে (সাধারণতঃ অক্ষয় তৃতীয়াতে) আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজে হাত দেওয়া হয়। কাসুন্দি 'আঁমকাসুন্দি' নামেও অভিহিত হয়। আচার (আমের)—তৈলমশলাদি সহযোগে রক্ষিত ডাঁটো আম। সাধারণতঃ আম, কুল, নেবু ইত্যাদি টকফলের আচারই বেশী করা হয়।

আমের বড়া-ম. ঢা—আমের আঁঠি-ক ('জ্যৈষ্ঠমাসে আমের বড়া ছুইজনে লাগাইল।'—মৈগী)।

আমআদা—আদার মত বহু গেঁড়যুক্ত আম্রগন্ধি মূল বিশেষ।

আমড়া [সং আম্রাতক, ইং hogplum]—টক ফল বিশেষ। আমড়া প্রধানতঃ দ্বিবিধ :—বিলাতী ও দেশী।

আম্বরুল—[সং অম্ললোনী]—টক জাতীয় শাক বিশেষ।

আমলা [সং আমলকী]—বর্তুলাকার ফল বিশেষ। [আ]- কর্মচারী।

আমলি [সং আম্লিকা]—(তেঁতুল দ্র)। **আমসোঁপরে**—পেয়ারা দ্র।

আলু (গোল আলু) [সং আলুক, হি আলূ, ইং potato]—মূল বা কন্দজাতীয় তরকারি বিশেষ। প্রকারভেদে গোল আলুর নানা নাম শুনা যায়। যেমন, দেশী, নৈনীতাল, মাদ্রাজী, রংপুরিয়া, ঠিকরি / ঠিকরে, বোম্বাই, কাটোয়া।

আলু, (রাঙা আলু) [হি শকরকন্দ, ইং sweet potato]—মিষ্টস্বাদযুক্ত লম্বাধরনের আলু যাহা সাধারণতঃ ফল হিসাবে কাঁচা, কিংবা সিদ্ধ করিয়া বা পুড়াইয়া খাওয়া হয় ; বাংলার গৃহিণীরা ইহা দ্বারা অতি উপাদেয় পিঠা

(আলুর পুলি) তৈয়ার করে। তৎপর্যায়ঃ—লাল আলু, বিলাতী আলু-জ. কো, রাঙা আলু, মিষ্টি আলু, শকরকন্দ-উব। চুমআলু/গুড়মালু-মে—সাদা রঙের আলু যাহা সাধারণতঃ কাঁচা খাওয়া হয়।

আঁশফল-চ [ইং longan]—লিচু জাতীয় ফল বিশেষ। পিসফল-ফ, মেওয়া-ম। চব্বিশ পরগনার বেহালা অঞ্চলে ইহা প্রচুর জন্মে। পূর্ববঙ্গে এই ফলটি খুব কম দেখা যায়।

আসকেল / আসশেওড়া-চ,—বন্য গাছ বিশেষ; ইহার ডাল সাধারণতঃ দাঁতন রূপে ব্যবহৃত হয়। মঠখিলা-ম, আইডালিয়া / আটকিরা ঢা. ব. ফ: ত্রি।

ইঁচড় / এঁচড়-ক—অপুষ্ট কাঁচা কাঁঠাল যাহা সাধারণতঃ তরকারি রূপে খাওয়া হয়। বাংলায় 'ইঁচড়ে পাকা' কথাটি খুব প্রচলিত; জ্যেঠা বা ডেঁপো ছেলেদের সম্বন্ধে প্রায়ই এই কথাটি বলা হয়।

উচ্ছা / উচ্ছে-ক—তিক্ত ফল বিশেষ (তরকারি)। তৎপর্যায়ঃ—উস্তে-পা. য, উইস্তা-ব. ফ, উত্থইয়া-শ্রী. ত্রি, বনকরলা-নো, তিতাগুটা-ম (করলা দ্র)।

এলাচি / এলাচ-ক, **এলাইচ**-পূব [হি ইলায়চী, ইং cardamom] মশলা বিশেষ। এলাচ দুই রকম; ছোট এলাচ ও বড় এলাচ।

কচড়া-মে—মেদিনীপুরে মহুয়ার ফলকে কচড়া এবং ফুলকে **মহুল** বলা হয়।

কচু—মূল বা কন্দ জাতীয় আনাজ বিশেষ, arum. ইহার মূল, কাণ্ড, ডাঁটা, পাতা সকলই খাওয়া যায়। কচুর নাম ও জাতি অনেক: (১) এক শ্রেণীর কচু আদাড়ে প্যাদাড়ে বিনা যত্নে আপনিই জন্মে; তাহাকে বলা হয়—বুনো কচু-ক, আদাড়ে কচু-রাঢ়, আন্না কচু-ম, গুঁড়ি কচু-ব. য। ইহাদের গোড়া শক্ত বা মোটা হয় না। (২) আর এক শ্রেণীর কচুর গোড়া মূলার ন্যায় মাটির উপরে ও নীচে কাণ্ডাকারে (trunk) বাড়িয়া যায় এবং যত্ন করিলে ও সার দিলে ২।৩ ফুটও লম্বা হয়; তাহাকে বলে, শোলা কচু-ক, মরমা কচু-দচ, আনাজী কচু, জল কচু, পানি কচু-ফ. ব, জাইত্ (জাতি) কচু-ম. ত্রি. শ্রী, আল্‌তি কচু-হিজ। (৩) কচু জাতীয় আর একটি কন্দ আছে, যাহার ডাঁটা কিংবা পাতা কাটিলে বা উহাতে আঘাত করিলে তাহা হইতে দুধের মত শাদা জলীয় পদার্থ বাহির হয়; এই কচুতে গাল পুড়ে না। কলিকাতার বাজারে ইহা চিনিমান (কেহ কেহ 'চীনামান'ও বলিয়া থাকে), বরিশালে দুধমান, ঢাকায় ধলকচু, ময়মনসিংহে দস্তর এবং খুলনায় দস্তাকচু নামে পরিচিত। (৪) গুটিকচু, গুঁড়িকচু, মুখিকচু, গাঁটি বা গাড়িকচু-ব. ফ—আদা হলুদের মত এই কচুর

শুধু গেঁড় (tuber) হয়। কচু, ওল ইত্যাদির গেঁড় বা ফেঁকড়াকেও মুখি বলা হয়। কচুর লতি-ক—কচুগাছের গোড়া হইতে বহির্গত লতানিয়া শিকড়। তৎপর্যায়:—ল কচু-মে, কচুর লতা-ম., কচুর বই-ব. ফ. ('সরিষা বাটা দিয়া রান্ধে পানিকচুর বৈ'।—বিগুপ্ত), কচুর বেই-বগু. খু, চুমরি। (৫) মান, মানকচু [সং মানক, হি মানকন্দ]—এক শ্রেণীর খুব বড় কচু। ইহার পাতাও খুব বড় হয়, বৃষ্টির দিনে কখনো কেহ মাথায় দিয়া চলাফেরা করে ('বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর বাইরে কেন ভিজ। ঘরের পাছে মানের পাতা কাইটা মাথায় ধর॥'—পূগী)। পর্যায়শব্দ:—বড়কচু-ঢা. টা, ফেনকচু-ম, ফান-শ্রী, মানাক্রোচু-জ. কো।

হাটে বাজারে আরও নানা নামের নানা প্রকার কচু দেখা যায়:—পঞ্চমুখি, পেঁচা, গারো (হয়ত গারো পাহাড় হইতে প্রথম আমদানী হইয়াছিল)।

কড়া-পূব—সদ্যোজাত ফল। তৎপর্যায়:—কুষি, গুটি, চুনা (আম দ্র)।

কৎবেল, কয়েৎবেল [সং কপিত্থবিল্ব, হি কৈথ, সাঁ কচ্‌বেল, ইং wood-apple]—বেলের আকার শক্ত আবরণবিশিষ্ট টক ফল বিশেষ।

কদিমা-দি. মা. বী—(মিষ্টি কুমড়া দ্র)। **কদু**—লাউ দ্র।

কপি [পো. couve]—তরকারি বিশেষ। সবজিজাতীয় তিন রকম কপির সঙ্গে আমরা অধিক পরিচিত:—ফুলকপি [হি ফুলগোভী, ইং cauliflower], বাঁধাকপি [হি বন্দগোভী, ইং cabbage], ওলকপি [ইং kohlrabi]। ফুলকপি—তরকারিরূপে ব্যবহৃত ফুল বিশেষ; বাঁধাকপি—শাক বিশেষ; ওলকপি—কন্দ বিশেষ।

কমলা, কমলালেবু [হি নারংঙ্গী, ইং orange]—সুন্দর সুমিষ্ট ফল বিশেষ, কমলানেবু।

করম্‌চা [সং করমর্দ, করঞ্জ, হি করৌন্দা]—টকফল বিশেষ। করঞ্চা করঞ্জা / করম্‌জা-পূব, করজা-ফ।

করলা / করেলা। [সং কারবেল্ল, হি করেলা, ইং bitter gourd]—তরকারি জাতীয় তিক্ত ফল বিশেষ। কাল্লা-বাঁ. বী, কেল্লা-হিজ, কইল্যা-পা, কোল্লা-কো. জ, কইর্‌লা-টা. ঢা।

কলা [সং কদলী হি কেলা সাঁ কায়রা, ইং plantain]—রম্ভা, সর্বজন-পরিচিত ফল, ক্যালা-দচ, কলো / ক্যালা-জ. কো। কাঁচকলা-ক—তরকারিরূপে ব্যবহৃত কলা। তৎপর্যায়:—আনাজী কলা, রিষ্যা (ঋষিয়া) কলা-ম, দখিনা

কলো / শাক খোয়া কলো-জ. কো। পাকা কলা একটি অতি উপাদেয় ফল; ইহার মধ্যে কতকগুলি বীচিপ্রধান, কতকগুলি স্বল্পবীচিযুক্ত এবং কতকগুলি বীচিশূন্য। (১) কয়েক প্রকার বীচি-প্রধান কলার আঞ্চলিক নাম :—ডেমরি কলা-চ, দয়া-খু, আঠা-বগু, আঠিয়া-জ. কো, আইঠা / আইঠ্যা-পূব, বাইশা, ভুইত্যা-ম, ভীম আইঠ্যা, রামকলা-শ্রী, তুলা-পাইজ। (২) কয়েকপ্রকার স্বল্প-বীচিযুক্ত কলা :—কাঁটালি-ক, ডিঙ্গা-ম, জাইত্ (জাতি) কলা-পূব, মানিক-জ. কো, মদনা-ঢা. পা, গুমা-ম, কালীভোগ-ক, জিন- খু, রম্বি-ক, গেড়াডুম্বুর-ম। (৩) বীচিহীন কলার মধ্যে মর্তমান-ক সর্বোৎকৃষ্ট; পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ইহাকে সবরীকলা এবং উত্তরবঙ্গে মধুয়া কলো বলা হয় ('শালি ধানের চিড়া দিয়াম আরও সবরীকলা।'—মৈগী)। বীচিশূন্য আরও কয়েকটি উপাদেয় কলার নাম :—অনুপম, মালভোগ, অগ্নিসাগর, দুধসাগর-ঢা, চাটিম, সিঙ্গাপুরী, জাহাজী, কাবুলী, ঘিউ মর্তমান, চাঁপা (চিনিচাম্পা-ম, ছগরচিনি-জ. কো)। জনশ্রুতি এই যে, চাঁপা বা চিনিচাম্পা কলা বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি; অনেকে ইহা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহার করে না।

কদলী ও কদলীবৃক্ষ সংক্রান্ত অপর কয়েকটি শব্দ :—কাঁদি / কলার কাঁদি-ক [সং স্কন্ধ]—একটি কলাগাছে যতগুলি ফল জন্মে তাহাদের সম্পূর্ণ গুচ্ছটিকে বলা হয় 'কলার কাঁদি। পূর্ববঙ্গের কোথাও ইহার নাম 'কলার ছড়ি', কোথাও 'কলার ছড়া', কোথাও বা 'কলার কাঁইদ'।

ছড়া, কলার ছড়া-ক—১০-১২টি কলার এক একটি ছোট গুচ্ছ। তৎপর্যায় :—কলার কান্দা / কান্দি-ম, কলার কানা / কানি-ব, ফেনা-মে, কলার ফানা-ঢা. য. ব. ত্রি. ফ, ঝুকি-জ. কো। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে যাহা কলার ছড়া, ময়মনসিংহ এবং ত্রিপুরার কোনো কোনো অঞ্চলে তাহা কলার কান্দা বা কান্দি বা ফানা। আবার পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও যাহা কলার ছড়া বা ছড়ি, পশ্চিমবঙ্গে তাহা কলার কাঁদি। মোচা-ক—কলার মঞ্জরী। তৎপর্যায় :—পীর-জ. কো, থোড় / থৌড়া-ম, ভোঁড়া-মে। থোড়-ক—ফল হইয়াছে বা হইবার উপক্রম হইয়াছে, এইরূপ কলাগাছের ভিতরের শক্ত অংশ। তৎপর্যায় :—ভেরাইল / ভারাইল-পূব, ভাদাল-পা. রা, আইটা-চট্ট, মাজা-মে।

কলার খোল / খোলা—কলাগাছের বাকল, ডোঙ্গাকৃতি আবরণ ('কার শ্রাদ্ধ কে করে খোলা কেটে বামুন মরে'—প্রবাদ)।

ডোঙ্গা-পূব—কলার খোলের ডোঙ্গাকৃতি পাত্র যাহা সাধারণতঃ পূজায়

শ্রাদ্ধাদিতে ভোজ্যপাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। তৎপর্যায়ঃ—খালি ('লাছিয়া খোলের খালি আতপ তণ্ডুল ঢালি' ।—বিগুপ্ত)।

'চাটখোলা—কলার খোলের আয়তাকার ভোজনপাত্র বিশেষ। মহোৎসবাদিতে পশ্চিমবঙ্গে এবং রাঢ়ে যেমন শালপাতার প্রচলন, পূর্ববঙ্গে (ম. ত্রি. শ্রী) তেমনই চাটখোলার।

কলার ছেটুল-ম, ছুতা-ফ. ব [সূত্র] —কলাগাছের খোলার প্রান্তভাগ যাহা সাধারণতঃ শাক-সবজির ছোট ছোট আটি, পানের গোছ, ফুলদূর্বার ঠোঙ্গা ইত্যাদি বাঁধিবার কাজে লাগে। বাস্না-চ.ন—কলার শুকনা পাতা। ফাতরা-ঢা. ফ. ব—কলার শুকনা ডাঁটা। বেল্লে, বালদো, বাগুড়ি—কলাগাছের গোটা কাঁচাপাতা ('কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর'—কবিক)। তৎপর্যায়ঃ—কলার ডেগ / ডেগো-চ, ডাউগ / ডাউগ্যা / ডাইগ / ডাইগ্যা-পূব। কলার তেউড়-চ—কলার চারা। তৎপর্যায়ঃ— কলার বোগ-ন. ঢা. ফ, পোল-ত্রি, কলার বুগি-ম, ডেম-ব, পুআ-বাঁ. মে. পা. টা। কলার ভেলা—কলাগাছের ডিঙ্গা বিশেষ। পর্যায়শব্দঃ—ভুড়া / ভুরা / ভেরুয়া-পূব. শ্রী, ভোর-ব, মাঞ্জুষ, মান্দাস ('বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে'—কেক্ষেমা)। কয়েকটি কলাগাছ সরিবদ্ধভাবে একত্রে বাঁধিয়া পল্লীগ্রামে অনেক সময় ছোট নৌকার কাজ চালানো হয়। সহসা কোনও অঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হইলে পল্লীবাসীদের তখন এইরূপ ভেলাই পরম আশ্রয় হইয়া উঠে।

কলাই—[সংকলায়, ইং pulses]—ডাল শস্যের সাধারণ নাম কলাই। যেমন মুগকলাই, বিরিকলাই, মাষকলাই, মসুরিকলাই, খেসারিকলাই। কড়াই, কালাই, কলই—কলাই-এর রূপভেদ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অঞ্চলভেদে 'কলাই' বলিতে বিশেষ বিশেষ ডালশস্যকেও বুঝায়। যেমন, বর্ধমানে মাষজাতীয় একপ্রকার ডালকে কলাইর ডাল বলা হয়। আবার বরিশালে খেসারির ডালকলই বা কলাইর ডাইল ('সুক্তাপাতা দিয়া রান্ধে কলাইর ডাইল')-বিগুপ্ত নিসিন্দাপাতা দিয়া খেসারির সুক্তা পূর্ববঙ্গের অনেক সামাজিক ভোজেও পরিবেশিত হয়। কলিকাতার বাজারে কিন্তু কলাইশুঁটি / কড়াইশুঁটি বলিতে মাত্র মটর শুঁটিকেই বুঝায়।

ডাল, দাল [সং দালি, হি দাল, সাঁ ডাল, ইং pulses]— দলিত বা ভুষি ছাড়ানো কলাই। 'ডাইল' ডাল-এর পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ। শুঁটি-ক, ছই / ছইল-ম—মটর, খেসারি ইত্যাদির বীজকোষ, pod।

কাঁকরোল [সং কর্কোটক / কর্কোটকী]—তরকারি ফল বিশেষ, গায়ে নরম কাঁটা।

কাঁকড়ি [সং কর্কটী, হি ককড়ী, ইং cucumber]—শসা জাতীয় লম্বা ধরনের ফল।

কাঁকুড়—ফুট জাতীয় ফল বিশেষ ; কাঁচা অবস্থায় তরকারি রূপেও খাওয়া হয়।

কঁাটাল, কঁাঠাল [সং কণ্টকাল, হি কটহল, সাঁ কানঠাড়, ইং jackfruit]—পনস, গায়ে কাঁটা কাঁটা সুবৃহৎ ফল, কাঠল-পূব, কঠোয়াল-জ. কো। খাজা-কাঁঠাল—যে কাঁঠালের কোয়া শক্ত। রসখাজা—যে কাঁঠালের কোয়া শক্তও না নরমও না। গলা, ঘোলা, লেটা-ম—যে কাঁঠালের কোয়া খুব নরম ও রসাল। কাঁঠালের মঞ্জরী বা সদ্যোজাত কাঁঠাল—মূচি-ন. মে. চ, মুছি-ত্রি. ফ. ব, মুজি-ম ; কাহারো মুখে 'বুজি' কথাটিও শুনা যায়। অপুষ্ট কাঁচা কাঁঠাল—ইঁচড় দ্র। ভুতি, ভুতুড়ি [সং বৃন্ত]—কাঁঠালের কোষ বা কোয়া ছাড়াইয়া লইলে যে অখাদ্য অংশ থাকে। তৎপর্যায় ঃ—কাঁঠালের ভতুয়া / ভত্যুয়া-ম, ভোতা-ব, ভুচ্‌রা-ফ. ব, ভথা-ত্রি। মূলী / মূইল্যা-ম—ফলের ভিতরের মুষলাকার শক্ত অংশ যাহার চারদিকে কোয়া থাকে। চাপিলা-ম—বীচিশূন্য চেপটা কোয়া।

কাঁদি, কানা, কানি, কান্দা, কান্দি—কলা দ্র।

কামরাঙ্গা [সং কর্মরঙ্গ, ইং chinese gooseberry]—পলকাটা অম্লফল বিশেষ। কারেঙ্গা-জ. কো, কারভাঙ্গা-মে।

কুঁড়ি-মে—তরকারি বিশেষ। কোরক, মুকুল।

কুমড়া / কুমড়ো—কুমড়া বলিতে প্রধানতঃ দুই রকম তরকারি ফলকে বুঝায় ঃ চালকুমড়া ও মিষ্টিকুমড়া। (১) চালকুমড়া [সং কুষ্মাণ্ড, হি ভুট্টুয়া, সাঁ কোহণ্ডা, ও পানি কখারু] - এই শ্রেণীর কচি কুমড়ার গায় শুঁয়া থাকে এবং পাকা কুমড়া চুনের রং ধারণ করে। তৎপর্যায় ঃ—কুমড়া / কুমড়-পূব, বলিকুমড়া, দেশী কুমড়া, ছাচি কুমড়া-বর্ধ. বী, পানি কুমড়া-জ. কো, চুনিয়া কুমড়া-দি. মা, গিমি কুমড়া (আকার অনেকটা গোল)। বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে শাদা পাকা কুমড়াকে 'পাঁড়ু কুমড়া' বলা হইয়াছে।

(২) মিষ্টিকুমড়া—ইহা মিষ্টস্বাদযুক্ত। তৎপর্যায় ঃ—বিলাতি কুমড়া-বর্ধ, বিলাতি লাউ-ম. পা. বগু, মিঠালাউ-ম. ত্রি, বিলাতি / কদিমা-দি. মা, কদিমা-বী, বিটকুমড়া-জ. কো, মগলাউ, বৈতাল / বৈতালু-মে.বর্ধ, ডিংলা- বাঁ. বী। নদীয়া জিলায় বৎসরে তিনবার তিন রকম মিষ্টিকুমড়ার চাষ হয় ঃ—আষাঢ়ী কুমড়া (উৎপাদন সময় বৈশাখ-আষাঢ়), জেড়ো কুমড়া (ভাদ্র-অগ্রহায়ণ), তেতো কুমড়া (কার্তিক-চৈত্র)। (৩) ভূঁই কুমড়া—কন্দফল বিশেষ ; ইহা

সাধারণতঃ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আনাজী কুমড়ার সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে চালকুমড়া দিয়াও ঔষধ (কুষ্মাণ্ড খণ্ড) তৈয়ারি হয়।

কুল [সং কোল]—ফল বিশেষ, বদরী। টোপা কুল—দেশী বড় কুল, পাকিলে যাহা খুব নরম হইয়া যায়। নারিকেলী বা নারকেলী কুল—নারিকেল ধরনের কুল। (বরই দ্র)। কুল—বংশ। জাতি। সমাজ। সমূহ।

কুশাইর, কুশোর—(আখ-দ্র)। **কোঁড়**-ক—বাঁশ ইত্যাদির অঙ্কুর বা নূতন চারা। তৎপর্যায় :—করুল-পা, কেরুল-ম, করালি-ফ. ব।

কোষ্টা—পাট, jute. **ক্ষীরা**—(শশা-দ্র)।

খাড়া—ডাঁটা (তরকারি)। সজিনাকেও 'খাড়া' বা 'সজনে খাড়া' বলিতে শুনা যায়। খাড়া—সোজা (লাঠিটা খাড়া করে রাখ); যে বা যাহা দাঁড়াইয়া আছে (এত ঝড়েও ভাঙ্গা ঘরটা খাড়া আছে)। জরুরী (খাড়া হুকুম, খাড়া তলপ)। পুরা (খাড়া চার ঘণ্টা)।

খেজুর [সং খর্জুর, হি খজূর, dates]—খাজুর-পুব। খেজুর মাথি—খেজুর গাছের মাথার কোমল শাঁস। খেজুর রস—খেজুর গাছের কাঁধ চাঁচিয়া যে রস বাহির করা হয়। খেজুরে গুড়—খেজুরের রস হইতে প্রস্তুত গুড়; নলেন গুড়—নূতন খেজুরে গুড়; পাটালি—ঘনীকৃত রস শরায় ঢালিয়া শরার আকারে কিংবা পাটিতে ঢালিয়া চতুষ্কোণ তক্তির আকারে তৈয়ারি গুড় (তাল-রস হইতেও পাটালি তৈয়ার করা হয়)। মুচিগুড়—ঘনীকৃত রস মাটির মুচিতে (মুষা বা ছোট সরা) ঢালিয়া মুচির আকারে প্রস্তুত গুড়। শিউলী / সিউলী-ব. চ. ব. ক-যাহারা খেজুর গাছ কাটে অর্থাৎ উহার কাঁধ চাঁচিয়া রস বাহির করে। জাতিবিশেষ।

খেঁড়ো-বর্ধ. বী—তরমুজ জাতীয় ফল, বীচি কালো, কাঁচা অবস্থায় তরকারিরূপে খাওয়া যায়।

গাজর [সং গর্জর, হি গাজর, ইং carrot]—মূলাজাতীয় কন্দবিশেষ।

গাঁধাল, গাঁদাল [সং গন্ধালী, হি গন্ধালি]—তীব্র গন্ধযুক্ত একপ্রকার লতা (ঔষধ)। তৎপর্যায় :—গাঁধালী, গন্ধভাদুলিয়া-পা, গন্ধভোদালিয়া-ম. ক. ব. ত্রি, গন্ধভাদালী।

গাব—গাছ, ফল। ইহার কষায়রস অনেক প্রয়োজন মিটায়।

গিমা / গিমে—[সং গ্রীষ্মসুন্দরক]—একপ্রকার তিক্ত শাক।

গিলা / গিলে—একপ্রকার বন্য ফল; একফুট / দেড়ফুট লম্বা এক একটি কোষে

চেপটা ধরনের চার পাঁচটি বড় বীজ থাকে। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বরকন্যাকে হলুদ ও গিলাবাটা মাখাইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হয়। গিলা কাপড় জামা কোঁচাইবার কাজেও লাগে (গিলে করা পাঞ্জাবী)।

গুটি—সদ্যোজাত ফল (আম দেখ)। রেশমের কোষ। ব্রণবিশেষ (বসন্তের গুটি)। গুলি (ডাংগুটি)। বটিকা। গুটি গুটি—আস্তে আস্তে (গুটি গুটি পা ফেলা)।

গুয়া-পূব [সং গুবাক্, হি সুপারী সাঁ গুয়া, ইং betel-nut]—সুপারি।

গৈয়ব, গৈয়া, গয়ে, গয়ম —পেয়ারা (পেয়ারা দ্র)।

গোলাপজাম [হি গুলাবজামুন, ইং roseberry]—গোলাপী রঙের একপ্রকার ফল, গোলজাম-পা।

ঘেঁটু—বন্যফুল বা ফুলের গাছ বিশেষ। তৎপর্যায় ঃ –ভাঁট, ভাঁইট-পূব। কথিত হয়, এই ফুল শিবের অতি প্রিয়। ঘেঁটু (ঘন্টাকর্ণ)—চর্মরোগের দেবতা বিশেষ।

চই [সং চবি]—লতা বিশেষ (শাক)। চই—চই পিঠা-পূব, চুষি পিঠা-পব।

চাউল, চাইল, চাল—[সং তণ্ডুল, হি চাওল, সাঁ চাউলে]। আলো-চাল—আতপ চাল (তণ্ডুল), ধান সিদ্ধ না করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া যে চাল প্রস্তুত করা হয়, আমান্ন। সিদ্ধ-চাল—ধান সিদ্ধ করিয়া যে চাল তৈয়ার করা হয়, সিজা চাল।

চাকন্দ, চাকন্দিয়া, চাকুন্দে—[সং চক্রমর্দ, হি এড়গজ]—একশ্রেণীর ছোট গাছ, মুগকলাইর ছড়ার মত ছড়া হয়, ফুল হল্‌দে। ময়মনসিংহে এই গাছটিকে 'এরাইঞ্জ' বলে।

চাকি, চাকী—পদ্মফুল মজিয়া চাকতির মত যে ফল জন্মে তাহাকে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে 'পদ্মের চাকি', উত্তরবঙ্গে 'পদ্মের চাকা', বর্ধমানে পদ্মের টাট বলিয়া থাকে ; এক একটি চাকিতে আতার বীজের মত বহু বীজ থাকে, সেই বীজগুলি ছেলে-পিলেরা খাইতে খুব ভালবাসে। ('গৃহ-সামগ্রী' দ্র)

চালিতা / চালতা / চালতে—টকফল বিশেষ, পাঁচকোল-জ. কো।

চিচিঙ্গা / চিচিঙ্গে[সং চিচিণ্ড]—গায়ে বহু শাদা রেখা বিশিষ্ট তরকারি ফল বিশেষ ; কৃষকেরা ইহার আগায় মাটির ডেলা বা ইটের টুক্‌রা বাঁধিয়া রাখে, ইহাতে ফলটি খুব লম্বা হয়। তৎপর্যায়ঃ —হুঁপা-বর্ধ. বী. বাঁ, দুধকুশি-জ. কো।

চিনিমান, চীনামান—(কচু দ্র)। **চিনিচাম্পা**—(কলা দ্র)।

চুকাপ্টা-ম,—অম্লফল বিশেষ (ভুবি দ্র)

চুবড়ি আলু-ক—[হি রতালূ, ইং yam] ওল জাতীয় বৃহৎ কন্দ বিশেষ,

কিন্তু গাল পুড়ে না। তৎপর্যায়ঃ—মচা আলু, মাছ আলু-ম. জ. কো, মেটে আলু-য. খু, থামী আলু-মে, মাটিয়া আলু-ব. ফ।

চোরকাঁটা-ক—ভাঁটুই-দুচ, লেংরা-ম।

ছড়া—গুচ্ছ (কলার ছড়া, ধানছড়া)। ছড়া—[সং ছট।] ছিটাছড়া (সেকালে হিন্দু গৃহিণীরা ঘুম হইতে উঠিয়াই উঠানে, আনাচে কানাচে গোবর ছড়া দিতেন)। ছড়া—কবিতা বিশেষ (ছড়া কাটা, ব্রতের ছড়া)।

ছড়ি, কলার ছড়ি—কলার কাঁদি (কলা দ্র)। ছড়ি—সরু লাঠি।

ছাল [সং ছল্লি]—বল্কল, বাকল, বাক্‌লা (গাছের—); ছিলকা (বাঁশের—)। খাল, চামড়া (হরিণের—)।

ছিম, ছিমা, ছিমুর—শিম-এর রূপভেদ।

ছুতা—(কলা দ্র)। ছুতা—ছল, pretext. পূর্ববঙ্গে মিথ্যা অজুহাতে বা নগণ্য দোষত্রুটি অর্থে ছুতানাতা কথাটি খুব প্রচলিত।

ছৈ, ছই—কলাই ইত্যাদির ছড়া (কলাই দেখ)। ছই—[সং ছদি]—নৌকা, গোরুর গাড়ি ইত্যাদির অর্ধবৃত্তাকার ছাদ।

ছোলঙ্গ, ছোলম—বাতাবি লেবু (জাম্বুরা দ্র)।

ছোলা—[সং চণক, হি চানা ইং gram]—ডালশস্য বিশেষ, বুট-পূব, চানা।

জাম—[সং জম্বু, হি জামুন]—বর্ষার ফল বিশেষ। দুই শ্রেণীর জাম দেখিতে পাওয়া যায়ঃ কালজাম (blackberry) এবং গোলাপ জাম (roseberry)।

জামির—[সং জম্বীর / জম্বির, সাঁ জাম্বীর, ইং lemon]—বিশেষ এক শ্রেণীর নেবু, গোঁড়া নেবু-পব। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে নেবুর (যে কোনও জাতের) সাধারণ নাম 'জামির'। (নেবু দ্র)।

জাম্বুরা, জম্বুরা-পূব. ত্রি. খু. দি. মা [ইং shaddock, pomelo]—বড় রকমের অম্লফল বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—বাতাবি নেবু-পব, বাদামি-পা, বাতাপি -বগু, ঝাদি-জ. কো, ছোলঙ্গ-য, ছোলম্-ফ।

জিউলি-চ.ন—এই গাছ দীর্ঘদিন বাঁচে, প্রায়ই সীমানায় পোঁতা হয়। তাৎপর্যায়ঃ —জিওল, জিগা-ম, কাপিলা-ব, কাশীমোল্লা-রাঢ়।

জীরা / জীরে—[সং জীর / জীরক, হি জীরা, ইং cumin]—মশলা বিশেষ।

ঝিঙা / ঝিঙ্গে—তরকারি ফল বিশেষ। পালা ঝিঙা—যে ঝিঙা ডালপালা আশ্রয় করিয়া ঝুলিয়া থাকে এবং লম্বা হয়। ভূঁয়ে ঝিঙা—এই শ্রেণীর

ঝিঙ্গাগাছ মাটির উপর দিয়া লতাইয়া যায় এবং ইহার ফল মাটির উপরেই শায়িত অবস্থায় বৃদ্ধি পায়। বারপাতা ঝিঙ্গা—এই শ্রেণীর ঝিঙ্গাগাছে বারটি পাতা হইলেই ফল ধরে।

টম্যাটো [ইং tomato, হি টমাটর / বিলায়তী বায়গন]— বিলাতী বেগুন-বর্ধ. বাঁ. বী. পূব, টক বেগুন-ন। কোথাও কোথাও (মে) ইহাকে 'গুটবেগুন' বলিতেও শুনা যায়।

টিউরি-ব—বিরিকলাই (কলাই দ্র)।

ঠাকুরি, ঠাকরি, ঠিকরি-ম—হরিদ্রাভ ডালশস্য বিশেষ।

ডাঁটা—শাকসবজি জাতীয় দুর্বল মাজার গাছ। কাটোয়ার ডাঁটা—মিষ্ট স্বাদযুক্ত শাদা রঙের একপ্রকার ডাঁটা, লম্বায় বাড়ে না, কিন্তু বেশ ঝাড় হয়। ডেঙ্গো ডাঁটা-ক, ডেঙ্গা-ম, ডাউঙ্গা-ব. ক. ত্রি—এই ডাঁটা বেশ লম্বা ও মোটা হয়, ডালপালা বেশী থাকে না। নটে, নটেডাঁটা—শাক জাতীয় ছোট ডাঁটা। নটে নানা প্রকারের—চাঁপা নটে, পদ্মনটে, কন্‌কানটে, কাঁটানটে। কাঁটানটের অপর আঞ্চলিক নাম—খুঁড়ে ডাঁটা, খুঁড়িয়া-উব, কাঁটা খুইড়্যা-ম। লাল শাক —গাঢ় লাল রঙের এক প্রকার শাক (ডাঁটা জাতীয়)। ঢোলা—ভিতরফাঁপা এক প্রকার ছোট ডাঁটা। ডাঁরি-মু. দি. মা, খাড়া, গুঁড়্যাখাড়া-বাঁ. বী—নানা নামের নানা প্রকার ডাঁটা। আমাদের অনেক শাকসবজি 'ডাঁটা' প্রত্যয়ান্ত। যেমন, পুঁই ডাঁটা, কুমড়ো ডাঁটা, সজনে ডাঁটা, নজনে ডাঁটা, ডেঙ্গো ডাঁটা।

ডালিম, দাড়িম—[সং দাড়িম্ব, হি অনার, ইং pomegranate]— বেদানা জাতীয় ফল বিশেষ। ডালুম-পূব।

ডিংলা / ডিংলে—মিষ্টি কুমড়া (কুমড়া দ্র)

ডুমুর—[সং উডুম্বর, হি অঞ্জীর, সাঁ লওয়া, ইং fig]—ছোট জাতের কষা (astringent) ফল বিশেষ; ডুমুর গাছের পাতা খসখসে এবং বটপাতার মত বড়। ময়মনসিংহে ইহাকে কুটুরা (কুডুরা), জলপাইগুড়িতে খোকসা, এবং বরিশালে বুহই বলিয়া থাকে।

ডেফল-পূব—টকফল বিশেষ (গাঙ্গেয় অঞ্চলে এই ফলটি দেখা যায় না)। চব্বিশ পরগনায় যে ফলটিকে ডেফর / ডেফল বলা হয়, তাহার উপরিভাগ গুটি গুটি, বন্ধুর, ইহা টকস্বাদবিশিষ্টও নহে; ইহাকে অন্যত্র ডউয়া-ক, ডেউয়া-ম, ডেঁউচ-মে. মাদার-ন.চ বলা হয়।

ডোঙ্গা— কলার খোলের পাত্র বিশেষ। ছোট নৌকা। দ্রোণী বিশেষ; সাধারণতঃ তালগাছ ইত্যাদি কুঁদিয়া লম্বা ধরনের এই ডোঙ্গা তৈয়ার করা হয়।

ঢেঁকিশাক-ক. পা. ফ. ব—ডগা কোঁকড়ানো শক্ত এক রকম বুনো শাক। পূর্ববঙ্গের কোথাও ইহাকে 'পালই শাক', কোথাও বা 'ঢেকুর শাক' বলা হয়।

ঢেঁড়স / ঢ্যাঁড়স—[হি ভিণ্ডী / রামতরোঈ, ইং lady's finger]—তরকারি ফল বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—রামপটোল-মু, রামঝিঙ্গা-বাঁ. বী, ভেঁড়ি / ভেঁড়ু-মে ধেড়ি-পূব, ভিণ্ডি-উব, রামতরই।

ঢোলমানকন—(থানকুনি দ্র)। **তরই** – ঝিঙ্গা জাতীয় ফল, তরি / তরাই-মে।

তরকারি—(vegetables) কাঁচা ফলমূলাদি (রাঁধিবার যোগ্য)। ব্যঞ্জন (curry) অর্থেও তরকারি শব্দের প্রয়োগ শুনা যায়। যেমন, 'মাছের তরকারি'।

তরমুজ, তরবুজ [সং তরম্বুজ, হি তরবুজ, ইং water-melon]—মিষ্ট কুমড়ার ধরন রসাল ফল বিশেষ।

তামাক [সং তাম্রকূট, হি তমাখু, সাঁ থামাকুর, পো tabaco, ইং tobacco] —তামুক-ম, তামকু / হামকু / তানকু-জ. কো—তামাকের রূপভেদ। বাংলা দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। তামাকের জাত অনেক। যেমন, মতিহারী / বিলাতী, জাতি বা দেশী। আয়তনদার / আইটানদার-কো. জ. রং —তামাকের গ্রেডিং বা শ্রেণীবিন্যাস করিবার জন্য নিযুক্ত লোক। তামাক পাতা হইতে নানা ভাবে নানা রকম মাদক দ্রব্য তৈয়ারি হয়। যেমন, তামাক বা গুড়ুক (গুড় মিশ্রিত শুকনা তামাক পাতা যাহা ঢেঁকি ইত্যাদি দ্বারা কুটিয়া হুঁকা-কলিকাতে সাজিয়া খাওয়া হয়), খামিরা / খাম্বিরা [আ. খমীর] (সুগন্ধি মশলা যুক্ত তামাক), চুরুট / সিগার, সিগারেট, বিড়ি, জরদা, দোক্তা, সুর্তি, নস্য।

তিত্‌কঙ্গা-চ—নিমের মত তিতো সবুজ ফুল বিশেষ, গুচ্ছের আকারে এক বোঁটাতে ৩০।৪০টি হয়; অনেকে ভাজিয়া খায়। তৎপর্যায়ঃ—যুক্তি ফুল, তিত্‌ ফুল।

তুলসী—বিষ্ণুর প্রিয় অতি পূজ্য বৃক্ষ। বাংলাদেশে এমন হিন্দুবাড়ী খুব কমই আছে যে-বাড়ীতে তুলসীগাছ নাই বা তুলসীতলায় সন্ধ্যাবাতি দেওয়া হয় না। ('ঘরবাড়ী' অধ্যায়ে 'তুলসীমঞ্চ' দ্র)। হিন্দুর প্রায় সমস্ত দেবকার্যে, পিতৃকার্যে এবং অপর অশেষবিধ অনুষ্ঠানে তুলসীপাতার প্রয়োজন হয়। ইহার রস অনেক রোগের ঔষধ এবং অনুপানও বটে। ('তুলসী', কল্যাণী, ১৩৬৫ দ্র)।

তেউড়—(কলা দ্র)। তেউড়-ম—বাঁশের সরু লম্বা কাঠি যাহা দ্বারা ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ার করে।

তেজপাত, তেজপাতা—তেজপত্র, এক প্রকার গাছের পাতা যাহা মশলারূপে ব্যবহৃত হয়, ঝালপাত-মু।

তেঁতুল—[সং তিন্তিড়ী / তিন্তিলী, হি ইমলী, ইং tamarind]—অম্লফল বিশেষ। তেতেলি-জ. কো, তেঁতই-চট্ট, আমলি-পূব. বীঁ. মে।

কাঁইবিচি—তেঁতুলের বীচি।

তেলাকুচা—[সং বিম্ব, বিম্বিকা]—পটোলের মত ফল বিশেষ। তেলাকুইচ্যা, তেলাকুইচালা-পূব।

থানকুনি / থালকুনি—শাক বিশেষ (সাধারণতঃ ঔষধ বা ঔষধের অনুপান-রূপে ব্যবহৃত হয়)। তৎপর্যায়—থালকুঁড়ি-মে. বাঁ. বী, ঢোলমানকন-ম, ঢোলমামুদ-বগু।

থোড়—(কলা দ্র)। **দস্তর, দস্তাকচু**—(কচু দ্র)।

দারচিনি— [হি দালচীনী, ইং cinnamon] দারুচিনি, দালচিনি-উব, একরূপ গাছের মিষ্টস্বাদযুক্ত ছাল (মশলা)।

দাল, দাইল—ডাল, ডাইল (কলাই দ্র)। **দুধমান**—(কচু দ্র)

ধনিয়া [সং ধন্যা, হি ধনিয়াঁ, ইং coriander]—স্বনামধন্য মশলা বিশেষ ; ইহার পাতাও ঝোলে ঝালে খাওয়া হয়। তৎপর্যায় :—ধনে-ক, ধুনিয়া-বাঁ. বী, ধইন্যা/ ধইনা-পূব।

ধান [সং ধান্য, হি ধান, ইং paddy]—বাঙ্গালীর এবং পৃথিবীর অপর বহু জাতির সর্বপ্রধান খাদ্যশস্য। বাংলা দেশে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয় : আউশ বা আউষ (বর্ষাকালের), আমন (হেমন্তের), বোরো (গ্রীষ্মের)। বর্তমানে তাইচুন নামে আর একটি ধানের আবাদ হইতেছে ; তিনমাসের মধ্যেই ইহার ফসল পাওয়া যায়। বোরো ধানের মত এই ধানের গোড়ায়ও সর্বদা কিছুটা জল রাখিতে হয়।

ধানের প্রকার এবং নামের অন্ত নাই ; তদুপরি একই ধানের এক এক অঞ্চলে এক এক নাম,—নামেরও নানা প্রতিরূপ। শ্রীসন্তোষকুমার শেঠ 'বঙ্গে চালতত্ত্ব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ভারতে এক 'আন্তর্জাতিক কৃষি প্রদর্শনী'তে দশ হাজার রকম ধানের নাম পাওয়া গিয়াছিল এবং চার হাজার রকম' ধানের নমুনা প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। নিম্নে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ধান চালের

কয়েকটি নাম বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল। এই নাম রাখার ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর শিল্পী-মনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :—

অঞ্জনলক্ষ্মী, অমৃতশালি।
আকাশমণি, আগালি, আজান, আঁধারকালি, আমফক্ড়া, আশ্রমশাল।
উড়াশাল, উড়ি, উড়িশাল, উত্তমশালি।
ওড়কচু।
কদম্মা, কনকচুর, কপিলভোগ, কয়া, কর্পূরকাটি, কর্পূরশালি, কলমকাটি।
কলমা :—কার্তিক কলমা, কাল আচিল কলমা, কালভূত কলমা, জটা কলমা, দুধ কলমা, নয়ান কলমা, ভূত কলমা, মানিক কলমা। কলামোচা, কাকুয়া, কাজলা, কাটারিভোগ, কাঁটারাঙ্গি, কামদ (কাঁওদ), কামিনী, কার্তিকা, কালজিরা, কালমানিক, কালিন্দী, কাশফুল, কিয়াপাতা, কুমারভোগ, কুসুমশালি, কৃষ্ণশালি, কেওয়া, কৌতুকমণি।
খয়েরচুর, খয়েরশালি, খাসকামানি, খিলই, খেজুরছড়ি, খেজুরথুপী।
গঙ্গাজল, গজমুক্ত, গড়ইপলা, গন্ধতুলসী, গন্ধমাধব, গন্ধমালতী, গন্ধরাজ, গন্ধেশ্বরী, গয়াবালি, গানজিয়া, গুজুরা, গুয়াশালি, গৃহিণীপাগলা, গোপালভোগ, গোবিন্দভোগ, গৌতম (গোতম), গৌরাঙ্গশাল, গৌরী, গৌরীকাজল।
ঘিশালি, ঘোড়াশাল।
চন্দনকাঠি, চন্দনচূড়া, চন্দনশালি, চন্দ্রমণি, চরণজী, চামরমণি, চামরশালি, চিনিসাগর, চেঙ্গা।
ছত্রশালি, ছাঁচিমউল, ছায়াচুর।
জগন্নাথশালি, জটাশালি, জনকরায়, জামাইনাড়ু, জামাইভোগ, জোড়মাধব।
ঝর ঝিঙ্গাশাল।
তিলসাগরী, তুলসী, তুলসীমালা, তুলসীহস্তা, তুলাপাঞ্জি, তুলাশালি।
দলকচু (দলকচুয়া), দাদখানি, দারাশালি, দুধকমল, দুধরাজ, দুধসর (দুদ্সর), দুর্গাভোগ।
নন্দনশালি, নাইওর, নাগরা, নানা, নারিকেল ফুল, নিমাই, নীলকণ্ঠী, নেনিয়া, নেয়ালি।
পক্ষীরাজ, পদ্মকেশরী, পদ্মরাজ, পাটশালি, পাটেশ্বর, পাত্রা, পাতসাভোগ, পানাতি, পায়রাউড়ি, পায়রারস, পারিজাত, পিঁপড়াবাক, পিঁপড়াশারি।

বংশীরাজ, বঙ্গেশ্বর, বরণ, বলাইভোগ, বাঁকই, বাঁকচুর, বাঁকতুলসী, বাঁকশালি, বাগড়ি, বাইগনবীচি, বাঘানেপ্পা, বাদরাঙ্গি, বাদশাপছন্দ, বাদশাভোগ, বামনভোগ, বালাম, বাঁশগজা, বাঁশগজাল, বাঁশফুল, বাসমতি, বিন্ধ্যশালি, বিন্নাফুলি, বিরই, বিষ্ণুভোগ, বুঁচি, বুড়ামাতা (বুড়ামাত্তা), বেতো, বেনাফুল, বোয়ালি।

ভবানীভোগ, ভাদ্রমুখী (ভাদ্দমুখী), ভাসামানিক, ভোগজিরা, ভোগরাজ।

মতিহার, মধুমালতী, ময়ূরলতা, মরিচশালি, মহারাজা মহিষনাদ, মহীপাল, মাকু, মাধবলতা, মানিকশোভা, মুক্তাঝুরি, মুক্তাশালি, মুক্তাহার, মেই আপছিয়া, মেটে, মৌকলস, মৌলতা।

যাত্রামুকুট।

রক্তশালি, রণজয়, রাইমণি, রাঙ্গামাইট্যা, রাঙ্গি, রাঙ্গিশাল, রাজকিশোর, রাজদল, রাজভোগ, রাজমহল, রাঁধুনীপাগলা, রাণীপাগলা, রামশালি, রায়গড়, রূপনারায়ণ, রূপশাল।

লক্ষ্মীকাজল, লক্ষ্মীদীঘা, লতামৌ, লাউফলা, লাউশালি, লালকামিনী, লালবন্দ, লীলাবতী, লোয়াগড়া, লোয়াডাং, লোহাজাং।

শঙ্করচিনা, শঙ্করজটা, শঙ্করমুখী, শঙ্খনাদ, শণফুলি, শ্যামলী, শিবজটা, শিয়াল-রাজা, শীতলজিরা, শুঁয়াশালি, শোলপোনা।

সজনী, সন্ধ্যামণি, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবালি. সরচাঁপা, সাচি, সিন্দূরকৌটা, সিন্দূরমুখী, সীতালক্ষ্মী, সীতাশাল, সীতাহার, সুধাভোগ, সুন্দরী, সুবর্ণখড়্গ, সুলতানচাঁপা, সূর্যভোগ, সূর্যমণি, সোনাখড়কে, সোনাগাজি, সোনাদীঘা সোনামুখী।

হনুমানজটা, হরকালী, হরগৌরী, হরিকালী, হরিকুলি, হরিভোগ, হরিরাজ, হরিশঙ্কর, হলদিয়া বারুক, হলুদগুঁড়া, হাতীকান, হাতীদাঁত, হাতীনাদ, হাতীপাঞ্জর, হাতীশাল, হিঙ্কি, হীরাশাল।

ধানি লঙ্কা—ধানের মত ছোট এক প্রকার লঙ্কা বা মরিচ ; কিন্তু ছোট হইলেও ইহার ঝাঁঝ খুব বেশী। ক্ষুদে লঙ্কা-ন।

ধুতুরা / ধুত্‌রো—[সং ধুস্তূর | ধুস্তর | ধত্তূর, হি ধতূরা, ইং datura] এক প্রকার কণ্টকী ফল বা ফলের গাছ। ধুত্‌রা-ম, ধুঁতরা-মে—ধুতুরার রূপভেদ। ধুতুরা ফুল ও ফল শিবের অতি প্রিয় বলিয়া কথিত হয়।

ধুন্দুল / ধুধুল—[হি ঘিয়া তরাই]—ঝিঙ্গা জাতীয় তরকারি বিশেষ। তৎপর্যায় :—ধুন্দল / পুরল / পোরল-পূব, পুরুল-মে, পল্লা-পা।

ধেড়ি—ঢেঁড়স। **নজনা**-চ. ন—সজিনা জাতীয় ফল বিশেষ (তরকারি), নাইজনা-ব. ক। **নটে**—ছোট জাতের ডাঁটা।

নালিতা / নালতে, নালিয়া / নাইল্যা—পাটগাছ (পাট দ্র)।

নারিকেল [হি নারিয়ল, সাঁ নারকও, ইং cocoanut]—সুপ্রসিদ্ধ ফল বা বৃক্ষ বিশেষ, নালকেল (কেরালা), নেরোল-দচ, নারকল, নারকেল, নাইরকল-পূব। ইহাকে কেহ কেহ 'ঋষিফল' এবং 'ঋষিবৃক্ষ' বলিয়া থাকে। জনশ্রুতি এই যে, 'নারিকেল' বিশ্বামিত্র ঋষির তপস্যালব্ধ ফল।

ডাব—অপক্ব নারিকেল। কচি ডাব—যে নারিকেলে শাঁস হয় নাই, শুধু জল। নেওয়াপাতি-ক, লেওয়াপাতি-পূব, শাখাপাতি-হিজ—খুব নরম সামান্য শাঁসযুক্ত ডাব। কচি ডাবকে 'মুচি-ডাব'-ন. মে. বলিতেও শুনা যায়। দোমেলা-মে—পাকার পূর্বাবস্থা। ইন্দ্রজেলা-মে, ভুয়ো-চ, আওয়া-ম—যে নারিকেলের ভিতরে জল বা শাঁস কিছুই নাই। ঝুনা নারিকেল—পাকা নারিকেল, যাহার শাঁস শক্ত হইয়াছে এবং জল নড়ে।

গোটা নারিকেল পাতা—বাগুড়ি, বাগড়া / বাগড়ো-য, বাগলা / বাগলো-ন. মে, বাইল-ফ. ব, বালদো।

কাতা-ক—নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি। ছোবড়া-ক—ছোবা-পূব। মালা-ক, মালই-ঢা. পা. ম—নারিকেলের খোলার অর্ধভাগ, আরচি-ম, আচচি-পা, আচি-ব. ফ, আইচা-ঢা. ক. ত্রি, আচা-খু—ইহা দ্বারা সাধারণতঃ ওড়োং তৈয়ার করা হয়।

নারিকেল সন্দেশ-ক, তক্তি-পূব—কোরানো নারিকেল চিনি সহযোগে জ্বাল দিয়া সন্দেশের মত যে খাবার তৈয়ার করা হয়, ধাওয়া-ন।

নেবু, লেবু [সং নিম্বূ, নিম্বুক, হি নীবূ, সাঁ জাম্বীর, ইং lemon]—সুগন্ধি অম্লফল বিশেষ। লেম্বু, লেমু-পূব। নানা প্রকারের লেবু :—পাতি, কাগজি, গন্ধরাজ, গোঁড়া-ক / গৌড়া-ম, জামীর, টাবা। 'কমলা'কেও 'কমলা-লেবু' বা শুধু 'লেবু' বলা হয়।

নোড়-চ, **নাকড়ি / নাকুড়**-বাঁ. বী – গায়ে পলকাটা ছোট টকফল বিশেষ ; শাখায় ও কাণ্ডে থোকা থোকা হয়। তৎপর্যায় :—রোয়াইল-ঢা. ফ, হরবরই-ম, হরবরি-ত্রি, নৈল-ব।

নোনা—নাওয়া-জ. কো (আতা দ্র)।

পটোল-ক.—[সং পটোল, হি পল্ভল্]—প্রসিদ্ধ তরকারি ফল বিশেষ।

পাট [সং পট্ট, হি পটুআ, ইং jute]—বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পাটের স্থান সকলের উপরে। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ব বাংলায় পাটের চাষ বেশী হইত এবং সেখানকার পাটই সারা বিশ্বের চাহিদা মিটাইত। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় পাটের চাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আউশ ও পাটের চাষ একই সময়ে হয় এবং ফসলও একই সময়ে (বর্ষাকালে) কাটা পড়ে। দোআঁশ মাটিতে পাট ভাল জন্মে, শুকনার চাষে ইহার বীজ ছিটাইয়া দেওয়া হয়, রোয়াধানের ন্যায় চারা রোপণ করা হয় না।

পাটগাছের আঞ্চলিক নাম : নালিতা / নালতে, নালিয়া / নাইল্যা। পূর্ববঙ্গের বারমাসী-ছড়ার একটি অংশ : 'চৈত্রে গিমা তিতা, বৈশাখে ঘিরূত নালিতা।' এখানে চৈত্র বৈশাখে খরার সময়ে গিমা, নালিতা প্রভৃতি তিক্তশাক খাইবার কথা বলা হইয়াছে।

পাটের নানা জাত আছে : দেশাল / দেশী, সাতনলা, তুষা, শ্যামপুরী, মেস্তা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের 'তুষা' জাতীয় পাট সর্বোৎকৃষ্ট, ফসল ভাল হইলে ৮।১০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বর্ষাকালে পুষ্ট পাটগাছ গোড়ায় কাটিয়া ছোট ছোট আটি বাঁধিয়া জলে পচানো হয় এবং যথাসময়ে জল হইতে উঠাইয়া উহার ছাল ছাড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। আঁশযুক্ত এই ছালই পাট বা কোষ্টা, jute.

জাঁক দেওয়া, জাঁত দেওয়া, ভূঁড় দেওয়া, চাক দেওয়া-জ. কো,—আটিগুলি সারিবদ্ধভাবে জলে ফেলিয়া তাহাদের উপর মাটির চাপ, জলজ ঘাস ইত্যাদি ভার চাপাইয়া জলে ডুবাইয়া রাখা।

- ছালছাড়ানো পাটগাছ বা পাটের কাঠিগুলিকে বলা হয় : পাঁকাটি / পেঁকাটি-ক, পাটকাটি, পাতকাটি-মু, পাটশোলা-পূব, পাটখড়ি-ম. ত্রি. শ্রী। পূর্ববঙ্গে এই পাঁকাটির অধিকাংশই জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয় ; গরীবদের ইহা ঘরের চাল ছাওয়া এবং বেড়ার কাজেও লাগে। উল্কাদান এবং আরও দুই-একটি লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানে পাঁকাটির প্রয়োজন হয়।

পাট শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা ধরনের নানা ওজনের আটি বাঁধা হয়। যেমন, হাতা, বিচ্‌কা, মোড়া, বুঙ্গা, লাছি, ডুপলি, গাঁট / গাঁইট। পাটের ছোটখাট ব্যাপারী—পাটুয়া / পাট্যায়া। যাহারা ওজন করে—কয়াল।

পাট হইতে সরু মোটা নানা রকম দড়ি প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ মোটা দড়িকে বলা হয় : কাছি, কচ্‌ড়া-য, কাড়া-ম, দড়া, রশা, অশা-রং। মাঝারি

ও সরু দড়িঃ দড়ি, রশি, অশি-রং, ডোর, ডুরি, সুত্‌লি-ম, তাইতা / তাত্তুয়া -ম. ঢা, গুণ (নৌকা টানে)।

চট—পাটের সুতার কাপড় বিশেষ, gunny ; পাটের পাছড়া (যাহা এককালে গরীবেরা পরিত), ধোকড়া-জ. কো।

চট ইত্যাদির থলে ঃ বস্তা, ছালা-পূব (শুধু চটের থলে), বোরা, ধোকড়-মু, ধুকড়ি-মে, থলে। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে থলে অর্থে 'পাট' শব্দেরও ব্যবহার পাওয়া যায়ঃ 'পাট পাট ভেসে গেল পোদ্দারের কড়ি।' – মানিক গাঙ্গুলী।

পান [সং পর্ণ, ইং betel]—তাম্বূল, এক প্রকার লতানিয়া গাছ বা তাহার পাতা। সুপারি, চুন, খয়ের প্রভৃতি সহযোগে পান (পাতা) চর্বণ করিবার রীতি শুধু বাংলা দেশে নয়, বাংলার বাহিরে আসামে, ওড়িশায়, বিহারে, মালয়ে এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপে বহুপ্রচলিত। এই সকল স্থানে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে, আদর আপ্যায়নে পান একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। মিঠা পান, মিষ্টি পান—মিষ্ট স্বাদযুক্ত পান। বাংলা পান, ঝাল পান—ঝাল স্বাদযুক্ত পান। মাটি ও ফলনের গুণে পান ঝাল ও মিষ্টি হয়। সাঁচি পান—এক প্রকার সুগন্ধি পান।

খিলি, পানের খিলি—সাজা পান ; পানের খিলিকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও 'পানের ঢোক' বলা হয়। সাদা পান—দোক্তা, গুণ্ডি ইত্যাদি ছাড়া শুধু সুপারি চুন ও খয়ের দিয়া সাজা পান।

বরোজ-ক—পান ক্ষেত, বোরুই-বী, পানের বর-ম। বরজগুলি চালাঘরের মত দেখায়। উহাদের চারিদিকে খড়িগাছ, পাঁকাটি ইত্যাদির বেড়া থাকে এবং উপর দিকে উলুখড় ইত্যাদি বিছাইয়া পানগাছে ছায়া করিয়া দেওয়া হয়। কথায় বলে, 'রোদে ধান, ছায়ায় পান'। গাছ পান—বহু অঞ্চলে সুপারি গাছ এবং এইরূপ লম্বা ধরনের গাছে পান গাছ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

বারুই-ক, বারই-পূব—বারুজীবী, যাহারা পানের চাষ করে।

পান বেচা-কেনার হিসাব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ঃ পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা ও নদীয়াতে ৩২টি পানে এক গোছ এবং ৯৬টি পানে এক শ' (শত) এবং এইরূপ ১২ শ' পানে এক পাই (৯৬ × ১২) ; কয়েক পাই পান দিয়া এক একটি 'মোট' বা বাণ্ডিল করা হয়।

মেদিনীপুরে ৫০টি পানে এক গোছ এবং ১০ হাজার পানে এক 'মোট'।

পূর্ববঙ্গে গোছ নাই, 'বিড়া' আছে; সেখানে ২০ গণ্ডায় বা ৮০টি পানে ১ বিড়া বা ১ পণ; এইরূপ ১৬ পণে ১ কাহন।

জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ২০ গণ্ডায় বা ৮০টি পানে ১ শ' এবং ৪৪ শতে ১ বিশ (৪৪×৮০=৩৫২০)। আবার ঐ জেলারই অন্যত্র ২১ শতে বা ১৬৮০টি পানে ১ বিশ। পাবনায় ৪০টিতে ১ বিড়া, ২ বিড়া বা ৮০টিতে ১শ' এবং ৪০শ'তে ১ কুড়ি বা ১ বিশ।

যশোহরে ৮০টি পানে ১ পণ, ৬৪ পণে ১ কুড়ি। ফরিদপুরে ২১ গণ্ডায় ১ পণ, ৪০ পণে ১ কুড়ি।

পানিফল / পানফল-ক. দি. মা [সং শৃঙ্গাটক, হি সিঙ্গেড়া]—জলজ কণ্টকী ফল বিশেষ। তৎপর্যায় ঃ—শিংড়া / শিঙ্গাড়া-পূব, নিহুর-ঢা. পা. ফ।

পালই-ম—ঢেঁকি শাক। (চাষ-আবাদ দ্র)।

পালঙ / পালং [সং পালঙ্ক, হি পালক, ইং spinach]—শাক বিশেষ। পালং প্রধানত: তিন প্রকার—টক বা চুকা পালং, ঝাড় পালং এবং শীষ পালং।

পিঠালি—ফল বিশেষ। চাল বাটা। **পিড়িংশাক**-মে। **পুয়া**-রাঢ়—চারা গাছ।

পেঁপে-ক [পো papaya, হি পপীতা, সাঁ অমৃৎ]—পিঁপিয়া-মু, পিঁফা-বাঁ. বী. মে, পাউপা-ঢা, পাইপ্যা-ম, পম্ফা-ক, পোম্বা-ব, পপীতা-দি. মা, কয়ফল-শ্রী।

পেঁয়াজ [সং পলাণ্ডু, ফা পিয়াজ, হি প্যাজ, সাঁ পিয়ার, ইং onion]—মশলা জাতীয় কন্দ বিশেষ। পিয়াজ / পিয়াইজ-পূব। পিয়াজকলি / পিয়াজ কালি—কলিসহ উদ্গত পিয়াজের ডাঁটা বা পাতা, পিয়াজের শীষ। পিয়াজী / পেঁয়াজী—বেসন মাখানো পিয়াজের বড়া; কিন্তু জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে পিয়াজি বলিতে পেঁয়াজকেই বুঝায়।

পেয়ারা—[পো pera, হি অমরুদ, ইং guava] বালক বালিকাদের অতিপ্রিয় ফল। তৎপর্যায়ঃ—আঞ্জির-দচ, আঁজির-রাঢ়, সবরী-পূব, সবরীআম-ম. ঢা, আম সবরী-য. পা, গৈয়ব-ম, গৈয়া-ঢা. ব. ফ, গ'য়ে-য. খু, গয়ম-নো, টাম সুপারি -জ. কো।

ফুটি-ক—কাঁকুড় জাতীয় ফল বিশেষ, পাকিলে সর্বাঙ্গে চিড় খায়। ফুইট-ব, বাঙ্গি-পূব. শ্রী. ন. য. পা। ফুটিফাটা-ক, বাঙ্গি কাটা-পূব—পাকা ফুটি বা বাঙ্গির মত ফাটা; প্রখর খরায় মাঠ ফুটিফাটা হইয়া গিয়াছে।

ব—বটের ঝুড়ি, বটের কাণ্ড বা ডাল হইতে নির্গত শিকড়, বয়া।

বই, বেই—(কচু দ্র)। বই—বহি, পুস্তক। বই—ছাড়া, ব্যতীত (তোমা বই জানি না)।

বঁইচ, বঁইচি, বেঁইচি, বোঁচ, বুঁচ—এক প্রকার টকমিষ্টি ফল।

বউল—মুকুল। **বট**—পূজ্য বৃক্ষ, বহু লৌকিক দেবতার প্রতীক।

বরই-পূব. খু. ম [সং বদরী, হি বের, সাঁ জানুম, ইং plum]—ফল বিশেষ। তৎপর্যায় :—কুল-ক, বরুই-পা, বয়ের কুল-মে, (নারকলি), বইর-দি. মা, বরি'-ত্রি, বো'র-বগু, বোগারি-জ. রং (কুল দ্র)।

বরবটি—শিম জাতীয় লম্বা ধরনের ফল বিশেষ। ইহার বীজ মাষকলাই ধরনের, কিন্তু উহার চেয়ে অনেক বড়, ডাল করিয়াও খাওয়া যায়। তৎপর্যায় :—নালসা / লুবিলা / মুগ ছিমুর-ম, কালাই-বগু, বড়কলই-জ. কো।

বাইগন, বাইঙ্গন, বাগুন—(বেগুন দ্র)।

বাগুড়ি, বাগড়ো, বাগলো—কলা নারিকেল এবং তজ্জাতীয় গাছের শাখা ('কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে কলেবর'—কবিক), ডাউগ্যা-পূব, বাইল-ক. ব।

বাঙ্গি-ন. পূব. শ্রী. উব—ফুটি জাতীয় ফল বিশেষ। **বাতাবি**—নেবু বিশেষ (জাম্বুরা দ্র)।

বাথুয়া / বেথুয়া, বেথো [সং বাস্তুক]—শাক বিশেষ। বাথুয়া-ম, বথুয়া-রং, বেথৈল-ক. ঢা।

বিউলি-ক, **বরি কলাই**-বাঁ. বী. বর্ধ—মাষ জাতীয় ডালশস্য,—হরিদ্রাভ। তৎপর্যায় :—টিউরি-রং, ঠাকুরি / ঠাউক্রি / ঠাকরি-ম. ঢা, ঠিকরি-ব।

বিলাতি বেগুন—টম্যাটো দ্র। **বিলাতি লাউ**—মিষ্টি কুমড়া (কুমড়া দ্র)।

বুগি, বোগ—কলার তেউড় (কলা দ্র)। **বুট**—ছোলা দ্র।

বেগুন [সং বাতিঙ্গন, হি বায়গন, সাঁ বেংগাড়, ইং brinjal]—ফল বিশেষ (তরকারি)। বাইঙ্গন, বাইগন, ব্যারগন, বাইগুন, বাইগোন, বাগুন - বেগুনের পূর্ব ও উত্তর বঙ্গীয় বিভিন্ন রূপভেদ। লাফা বাইগন-ম, তাল বাগুন-ক. ব—বড় গোল বেগুন। মাকড়া বেগুন-চ—ডোরাকাটা বেগুন। **বেগুনী**—বেসন দিয়া ভাজা বেগুনের ফালি। বেগুনী—রং বিশেষ।

বেত -বেত্র, cane. দীর্ঘ একরূপ জঙ্গুলে কণ্টকী লতা। নানাভাবে ইহা ব্যবহৃত হয়। বেতের লাঠি, বেতের ছাতির বাঁট, বেত্রাঘাত, বেতের চেয়ার, বেতের মোড়া—এইগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। আবার মুক্তাগাছের যে পাতলা ত্বকে পাটি, শীতল-পাটি তৈয়ার হয় তাহাও বেত, মুক্তার বেত। বাঁশের

পাতলা চেঁচাড়ি যাহা দ্বারা কুলা, ডালা, চাটাই, দরমা ইত্যাদি তৈয়ার হয় পূর্ববঙ্গে তাহাও বেত, বেতি। সুন্দিবেত—খুব লম্বা ধরনের বেত। (পাহাড়ে জন্মে)।

বেল [সং বিল্ব, হি শ্রীফল, সাঁ সিজো, ইং Bengal quince]—সুপ্রসিদ্ধ ফল। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বহু অঞ্চলে ইহার অপর নাম শ্রীফল / ছেরফল।

বৈতাল / বৈতালু—(কুমড়া দ্র)।

ভাং, ভাঙ [সং ভঙ্গা]—সিদ্ধির গাছ বা পাতা (মাদক)। ভাঙ্গড়—সিদ্ধি-খোর ; লৌকিক শিব।

ভঁাট, ভঁাইট—(ঘেঁটু দ্র)। **ভুট্টা** [হি ভুট্টা, মকঈ, ইং maize]—মকাই / মাকাই, মাক্কাজোড়া-ম।

ভুবি-ম. শ্রী—আঙ্গুরের আকার এক প্রকার বন্য টক ফল, আঙ্গুরের ন্যায়ই গুচ্ছাকারে এক বোঁটাতে অনেকগুলি হয়। ইহার পাতা চাঁপা ফুল কি শ্বেত বাকসের পাতার মত। তৎপর্যায় :—লটকা / লটকন-টা. ঢা. ত্রি, নট্‌কনা-বগু. পা. ফ, লটকনা-ব, লটকো / নটকো, চুকা-গুটা-ম।

ভেঁট-ম. পা. বগু. বর্ধ—শালুক ফল (শালুকের ফুল হইতে যে ফল জন্মে)। তৎপর্যায় : শালুক-ব, ডেঁপ-ন. ফ, ভেঁইট-বী। এই ফলে সরিষার মত অসংখ্য বীচি হয় ; ছেলেপিলেরা এই বীচি কাঁচাই খায়, অনেক সময় গরীবেরা ভাজিয়া খই করিয়াও খায়।

ভেট—উপঢৌকন। ভেট—সাক্ষাৎ (ভেট করা)। **ভেঁাড়া**—মোচা (কলা দ্র)।

মগলাউ-ম.—কালো রঙের এক প্রকার মিষ্টি কুমড়া ; মগেরা নাকি এই জাতের মিষ্টি কুমড়া এদেশে প্রথম আমদানী করে।

মচা আলু—চুবড়ি আলু দ্র। **মনসা, মনসা গাছ**—(সিজ দ্র)।

মরিচ-পূব [হি মিরচা / মির্চ, সাঁ মারিচ, ইং. chilli, red pepper] —লঙ্কা / লঙ্কা মরিচ-পব, শোঁপরে-বী, সুঁপর‍্যা-বাঁ, মরুচ / মোরচি-জ. কো, মৈচ, ঝাল-দি. মা. ন। পশ্চিমবঙ্গে মরিচ বা মরীচ অর্থ—গোলমরিচ, যাহাকে হিন্দীতে বলে কালীমির্চ এবং ইংরাজীতে black pepper. কিন্তু পূর্ববঙ্গে মরিচ বলিতে পশ্চিমবঙ্গের লঙ্কা বা লঙ্কা মরিচকে বুঝায়। তদঞ্চলে সংস্কৃতের মরিচ / মরীচকে বলে গোলমরিচ। মশলারূপে কাঁচা এবং পাকা দুই রকম লঙ্কাই ব্যবহৃত হয়।

মসুরি [সং মসূর, হি মসুর, ইং lentil]—মুসুরি, ডালশস্য বিশেষ।

মহুয়া—(কচড়া দ্র)। আদিবাসী সমাজে ইহা খাদ্য ও পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা দ্বারা তাহাদের আর্থিক সংস্থানও হয়।

মাক্কাজোড়া—মকাই, ভুট্টা। **মান্দা'র-বা**—আতা দ্র।
মালা—মালিকা, ফুলের মালা। নারিকেলের খোলের (shell) অর্ধভাগ। সমূহ (পর্বতমালা)।
মূলা / মূলো—[সং মূলক, হি মূলী, ইং radish] প্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ, মূলাই-জ. কো। মূলা নানা প্রকারের। যেমন, আউশে সাদা ও লাল (বর্ষাকালে হয়), বোম্বাই লাল, হিংলি, চীনা।
মেঁওয়া—আঁশফল দ্র। **মেথি**-মে—তাল, নারিকেল, খেজুর ইত্যাদির মাথার নরম অংশ। মশলা বিশেষ।
মেস্তা—একশ্রেণীর পাট (পাট দ্র)। **মোচা**—কলা দ্র ।
মৌরি [সং মধুরী / মধুরিকা, ইং aniseed]—মশলা বিশেষ। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও ইহাকে 'গুয়ামুরি' বলা হয়।
রসুন [সং রসুন / রসোন / লশুন, হি লতুসুন, সাঁ রাঁশুন, ইং garlic]—তীব্রগন্ধযুক্ত কন্দ বিশেষ (মশলা এবং ঔষধ)। অসুন / অসুনি-জ. কো. রং।
রামঝিঙ্গা, রামতরই, রামপটোল—(ঢেঁড়স দ্র)।
রাঁয়া—ডাঁশা (-আম, -পেয়ারা)। আম দ্র।
রুই-ম - শিমুল তুলা, মাদার তুলা-পা. ফ, বালিশের তুলা। রোহিত মৎস্য। উইপোকাকেও পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও 'রুইপোকা' বলা হয়।
রোয়াইল—নোড় দ্র। **লঙ্কা**—(মরিচ দ্র)। রামায়ণোক্ত রাবণ রাজ্য। অনেকের মতে বর্তমান সিংহল দ্বীপ।
লটকা, লটকনা—(ভুবি দ্র)।
লাউ, নাউ [সং অলাবু, হি কদ্দু / লাউকী, ইং pumpkin]—তরকারি ফল বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ দেশী লাউ, শীত লাউ, কদু। বাওয়স-ম—যে লাউ-এর খোলা পাকিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছে। লাউ, লাউয়া—পাকা লাউয়ের খোলা (shell) দিয়া তৈয়ারি বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষাপাত্র। এইরূপ বাদ্যযন্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র সাধারণতঃ বাউল বৈরাগীদের হাতেই দেখা যায়। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে লাউয়ের খোলার পাত্রকে টোকা / তারকা বলা হয়।
লালসা, লুবিলা—বরবটি দ্র। **লেবু**—নেবু। **লোচা**—তরল গুড় বিশেষ।
শটী—হরিদ্রাজাতীয় কন্দ বিশেষ; ইহা হইতে পুষ্টিকর শিশুখাদ্য (পালো) তৈয়ারি হয়; ইহা ক্রিমিনাশকও বটে। তৎপর্যায়ঃ -শুঁইট-পূব; কিন্তু সংস্কৃতে 'শুণ্ঠী' শব্দের অর্থ শুকনা আদা।

শসা [সং ক্ষীরিকা, হিং খীরা, ইং cucumber]—ফল বিশেষ। তৎপর্যায় : শোয়াস-বগু, মাঁরবা-বী, ক্ষীরা / খীরা। কলিকাতার বাজারে শসা এবং ক্ষীরা একার্থক। কিন্তু বাংলার বহু অঞ্চলে শসা এবং ক্ষীরা প্রায় সমগুণসম্পন্ন হইলেও দুইটি স্বতন্ত্র ফল। ক্ষীরা কমলালেবুর মত অনেকটা গোল, কিন্তু শসা লম্বাটে।

ক্ষীরা-ম. ত্রি. উব, ক্ষীর্য্যা-মৃ. পা, ক্ষীরেই-য, ক্ষীরই / ক্ষীরাই-ঢা. ফ. ব—শব্দগুলি একার্থক, ভুঁয়ে শসা-ন।

শাক, শাগ [হি সাগ, ইং greens]—বৃক্ষলতা ও গুল্মাদির পত্র ও বৃন্ত যাহা খাদ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। যেমন, পুঁই শাক, পালং শাক, নটে শাক। কিন্তু সংস্কৃতে শাক বলিতে পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ সব কিছুকেই বুঝায়। কাজেই সেকালের আর্যঋষিদের 'শাকান্ন' আর বর্তমান যুগের বাঙ্গালী পল্লীবধূদের 'শাকভাত' ঠিক এক জিনিষ নয়।

শালুক-ক—কুমুদ ফুল। ইহার অপর আঞ্চলিক নাম—নাইল / নল ফুল-রা. ন, মুঁদি (বেগুনী রঙের), শাপলা-ম. ফ. ব. দচ, কৈলাড়ি-হিজ। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে শালুক বলিতে কিন্তু কুমুদ বা শাপলার মূলকে বুঝায়, ফুলকে নয়। সংস্কৃতেও শালুক—কুমুদাদির মূল। এই মূল পূর্ববঙ্গের গার্শীব্রতের একটি প্রধান উপকরণ; গরীবেরা ইহা সিদ্ধ করিয়াও খায়। আবার উত্তরবঙ্গে কুমুদফুলে (শালুক-পব.) মনসার ঘট ও মনসার মূর্তি সাজাইয়া দেওয়া হয়।

শিংড়া, শিঙ্গাড়া—পানিফল দ্র।

শিম [সং শিম্ব, হি সেম, ইং bean]—আনাজজাতীয় ফল বিশেষ। তৎপর্যায় :—ছিম-খু, ছিমা-জ. কো, ছিমরা-ঢা. ঝ. ব, ছিমুর-ম, ছৈঁ-নো, উরি-শ্রী, উস্‌সি, ঘিদল-ন।

শোঁপরে—মরিচ দ্র। **শ্রীফল**—বেল দ্র।

সজ-পূব,—ধনে, মৌরি, জীরা, শলুকা ইত্যাদি নানাপ্রকার মশলার সাধারণ নাম সজ। যেমন, পূববঙ্গের বহু অঞ্চলে ধনিয়া সজ, মৌরি সজ, শলুকা সজ বলে।

সজিনা, [সং শোভাঞ্জন]—আঙ্গুলের মত সরু লম্বা তরকারি ফল বিশেষ। সজনে-ক, সজনা-পূর্ব—সজিনার রূপভেদ। তৎপর্যায় :—খাড়া, সজিনা খাড়া।

সবরী আম—পেয়ারা। **সবরী কলা**—মর্তমান কলা (কলা দ্র)।

সরিষা / সরষে [সং সর্ষপ, হি সরসোঁ, ইং mustard]—এক প্রকার তৈল বীজ বা তাহার গাছ; মশলা বিশেষ। রাই [সং রাজিকা]—সরিষার প্রকারভেদ। সরিষ্যা, সইরষা, সরু, হরু—সরিষার পূর্ববঙ্গীয় রূপভেদ।

খইল / খোল [সং খলি, ইং oilcake]—তৈল-নিষ্কাষিত তিল সরিষা ইত্যাদির ছিবড়া যাহা প্রধানতঃ জমিতে সাররূপে এবং জাবনাতে গোরুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়।

সাল, শাল—সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ (শালবন)। তৎপর্যায় :—গজারি-ঢা. ম।

সিজ [সং স্নুহি, হি সিজ]—মনসা গাছ, সিজ মনসা। অনেক হিন্দুর, বিশেষ করিয়া কোনো কোনো আদিবাসীর বাড়ীতে মনসামঞ্চ দেখা যায়। মনসাসিজকে মনসাদেবীর প্রতীক মনে করা হয়। মনসাপূজায় ঘট এবং মূর্তির সঙ্গেও মনসার একটি ডাল দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে সিজমনসা শীতলার প্রতীক হিসাবেও পূজিত হয়। যে বৃক্ষের গোড়ায় পূজা হয় সেই বৃক্ষকে দেববিগ্রহের ন্যায়ই মান্য করা হয় ; অপবিত্র দেহে কেহ তাহা স্পর্শ করিতেও ভয় পায়। প্রতি বৎসর বারোয়ারি পূজা উপলক্ষে পুরোহিত যখন পূজায় বসেন, তখন গ্রামের মেয়েরা শীতলাখোলায় বসিয়া দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

সিদ্ধিগাছ– ভাং বা ভঙ্গা গাছ।

সীতাফল—আতা, নাওয়া-জ. কো (আতা দ্র)।

সুপারি—গুয়া দ্র। পানের সহিত বা পৃথকভাবে সুপারি খাইবার রীতি শুধু ভারতে নয়, তিব্বত, চীন, ইন্দোচীন, মালয় প্রভৃতি বহু দেশে প্রচলিত আছে।

সুষনি / সুষুনি [সং সুনিষণ্ণক]—জলজ শাক বিশেষ। প্র. 'সুষনি কলমী ল-ল করে, রাজার বেটা পক্ষী মারে।'—যমপুকুর ব্রতের ছড়া।

সেহড়া / সেওড়া—সাওড়া গাছ-মে। পূর্ববঙ্গে ইহার গোড়ায় অনেক লৌকিক দেবতার পূজা হয়। কোথাও (ম) ইহা বনদুর্গার প্রতীকরূপেও পূজিত হয়। সেওড়া গাছ ভূতপ্রেতের বাসস্থান বলিয়াও জনশ্রুতি আছে।

হলুদ (সং হরিদ্রা / হি হলদী, ইং turmeric)—সুপ্রসিদ্ধ কন্দ বিশেষ। হলদি -পূব. ন. বাঁ. বী ('কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ।'-শ্রীকৃ)। গায়ে হলুদ-পব, হলুদ কোটা-পূব—নানারূপ বৈবাহিক অনুষ্ঠান।

হেলঞ্চ, হেলেঞ্চা (সং হিলমোচিকা)—জলজ তিক্তশাক বিশেষ। হিঞ্চা, হিঞ্চে, ইনচা, ইন্‌চে, এলেঞ্চা, হ্যালোম্‌চা-ফ—হেলেঞ্চার রূপভেদ।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবজন্তু

১ (ক) মাছ

আইটা-মু—বড় চিংড়ি। **আইড়** (সং আড়ি)—আড়মাছ, টেংরা ধরনের আঁশবিহীন বৃহৎ মৎস্য। **আখলা**—বাটা বিশেষ। **আজলা**-রা—ভেটকি জাতীয় মাছ।

আতাইকুলা-পা। **আমেরিকান কই**—তেলাপিয়া, নেধস ধরনের এক শ্রেণীর মাছ, অতি দ্রুত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়। ইদানীং কলিকাতার বাজারে ইহার খুব আমদানি দেখা যায়।

ইংলা—আঁশবিহীন এক প্রকার ছোট মাছ। **ইচলা, ইচা, ইচ্যা** [সাঁ ইচা] —চিংড়ি দ্র।

ইলিশ [সং ইল্লিশ]—বাঙ্গালীর অতি প্রিয় মৎস্য ; ইহা খুব তৈলাক্ত, কিন্তু সুস্বাদু এবং সুন্দরও বটে। ভারতের বহু নদীতে ইলিশ পাওয়া গেলেও পদ্মা ও গঙ্গার ইলিশ বিখ্যাত। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমীর দিন, নতুবা মাঘের কোনও দিন জোড়া বেগুনসহ জোড়া ইলিশ ঘরে আনিবার রীতি আছে। হিন্দু গৃহিণীরা সেদিন দুইটি মাছ চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সিন্দুরাদি উপকরণে বরণ করিয়া ঘরে তোলেন, না ভাজিয়া রাঁধেন, আঁশগুলি মধ্যম খামের গোড়ায় পুঁতিয়া রাখেন। বিজয়ার পর এই অনুষ্ঠান হইতেই বৎসরের ইলিশ খাওয়া আরম্ভ হয়।

উকল—(লেটা দ্র)। **উটকাল**—(চেং দ্র)। **উড়াল / উড়োল**-মু—জলের উপর ভাসিয়া থাকে। **উলকা / উলকো**—(চেং দ্র)।

এলং-ম. ঢা. বগু [সং এলঙ্গ]—এলেঙ্গা-খু।

কই [সং কবয়ী]—প্রসিদ্ধ মাছ, বেশ শক্ত, ডাঙ্গায়ও অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ইহাদের পিঠের উপরে এবং পেটের নীচে লম্বা একটানা ছুঁচালো পাখনা থাকে। কই টুরিয়া / টুইর‍্যা-ম—কই মাছের বাচ্চা, ছোট কই।

কটকটিয়া / কটকইট্যা-ম—বেলে মাছ। **কলকে মাছ**-য—তপসে ধরনের একপ্রকার মাছ। **কবতী**—(খয়রা দ্র)।

কাঁকাড় / কাঁকিলা—লম্বা ঠোঁটওয়ালা একশ্রেণীর মাছ, জলের উপরে ভাসিয়া

বেড়ায়। তৎপর্যায়:—কাঁকিল্যা-মু, কাইকলা-ঢ. ফ. ব. পা, কখলা-বগু, কাকলে-খু, খাকুল-রং, কাগাল, কাইক্যা-ম, খুড়ে, খুরকিন-ব, গোঙ্গা-মে, গাংদাড়া-হু: হা. বর্ধ. মে, বকঠুঁটো মাছ / বগো মাছ-চ. ন।

কাচকি, কাজরি, কাজলি—ছোট জাতের সুস্বাদু মাছ।

কাতল / কাতোল, কাতলা [সং কাতল]—পোনামাছ বিশেষ, রোহিত পর্যায়ের মাথাবড় মাছ।

কানপনা-ম—চুনো মাছ বিশেষ; ইহার মাথায় একটি শাদা দাগ থাকে, অনেকেই খায় না। **কানলা**—(ফলি দ্র)। **কালবোস**-ক—পোনা মাছের ধরন মাথাছোট মাছ, কালবাউস, কালীবাউস-পূব. বগু; কাইল্যা বাগরি-ম। চন্দনী বাউস-বগু—এই শ্রেণীর মাছের রং শ্বেত চন্দনের মত কিছুটা শাদা।

কুচা / কুচো—নানা জাতের ছোট মাছকে বলা হয় 'কুচো মাছ'। তৎপর্যায়:—চূনা / চুনো-ক, চুঁচড়ো-বগু, খরচা-মু, গুঁড়া মাছ / গুরা মাছ-ম।

কুঁচিয়া / কুঁচে [সং কুচিক]—সাপের মত লম্বা সরুমুখ মাছ। কুইচ্যা-ম, কুইচা-ঢা. ফ, বামরুল-মে।

কেচকি, কাচকি-ঢা. ম. ত্রি. ফ—দেখিতে অনেকটা ছোট মৌরলা মাছের মত। তৎপর্যায়:—কেচা, তাজি-ম, সুবর্ণ খড়িকা।

কোড়াল-পূব—ভেটকি জাতীয় মাছ।

খয়রা-ক—ইলিশের ধরন শাদা রঙের একপ্রকার ছোট মাছ। তৎপর্যায়:—খোরি-মু, গাং খঁয়রা, গাং খলশে-খু, ফুকা, কবৃতা-বগু, চাপিলা / চাইপলা-ম. ঢা. ফ, চাপলি / চাবলি-ব। **খরচা**—(কুচা দ্র)।

খরশল্লা—খরশুল্লা-খু, খরিশলা-ঢা. পা. বগু, খুরশি, ভাঙ্গড়-চ।

খলিশা / খলশে [সং খলিশ / খলেশ]—খলশা-রং, খইলশা / খইলা-ম. ঢা. ফ ('কার্তিকে ওল অঘ্রানে খলিশার ঝোল'—বারমাস্যা ছড়া)।

খাঁদি—(নেধস দ্র)। **খুড়ে**—(কাঁকাল দ্র)। **খুরশি**—(খরশল্লা দ্র)।

খোরি—(খয়রা দ্র)। **গচি**-বী—বাইন মাছ বিশেষ।

গজার-পূব [সং গর্জক]—গজাল-খু. ব. ফ. শালমাছ-ক। শকুল জাতীয় মাছ, গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকে।

গড়ই, গড়াই—(লেটা দ্র)। **গল্‌দা, গল্লা**—চিংড়ির প্রকারভেদ।

গাংদাড়া—(কাঁকাল দ্র)। **গাগর**-বগু [সং গর্গর]—বড় জাতের টেংরা, গাগলা।

গুজি / গুজি আইড়-পূব—আড় মাছের ধরন, কিন্তু উহার চেয়ে ছোট; ইহারা

জলের তলায় বাটির মত গর্ত করিয়া ডিম পাড়ে। গুজে-বগু, রিঠে টেংরা-খু।
গুতুম-ম—গুতে-য. চ. ন, গুথ্যা-মু. পা।
গুলশা, গলশা-ম. ব—টেংরা জাতীয় মাছ। তৎপর্যায়ঃ– ঘুংগিয়া, ঘুনে-বগু।
গুলে-চ—চেউয়া-ঢা। **গোটকুন**-মু—লেটা পর্যায়ের মাছ।
ঘনিয়া / ঘইন্যা-পূব—কুরচি বাটা-চ, কাইটকা-ঢা, পোরসা-দি. মা।
ঘাগড় [সং ঘর্ঘট]—ঘোড়্যা-মু. পা, ঘাড়ো-য. বগু, ঘাড়ুয়া / ঘাড়্যুয়া-ম। আড় মাছের ধরন, কিন্তু ইহার ঘাড় খুব মোটা, অনেকেই খায় না।
ঘুংগিয়া, ঘুনে—টেংরা জাতীয় মাছ (গুলশা দ্র)।
চন্দনা ইলিশ—দেখিতে অনেকটা ইলিশের মত, কিন্তু তত সুস্বাদু নয়।
চাঁদকুড়ো-বী—নানা জাতের ছোট মাছ। **চাঁদা**-ক—চান্দা-পূব।
চাপিলা / চাইপলা, চাপলি / চাবলি—খয়রা-ক।
চারা মাছ-চ—পোনা, রুই কাত্‌লা ইত্যাদির বাচ্চা।
চিংড়ি [সং চিঙ্গট, চিঙ্গটী, চিঙ্গড়]—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে চিংড়িকে 'ইচা' বলা হয়; ইহার অপর আঞ্চলিক নাম ইচ্যা-পা, ইচ্‌লা-রং, জালমাছ-দি. মা. মু, চিঙ্গেড়-ব। চিংড়ির জাত অনেকঃ কুচো চিংড়ি, ঘুষো চিংড়ি—ছোট চিংড়ি, shrimp. গলদা চিংড়ি—ইহার মাথাটি খুব বড় এবং মাথায় সামনের দিকে লম্বমান করাতের মত একটি দাড়া (antenna) আছে; দুইটি পা খুব লম্বা এবং কাঁটা কাঁটা। তৎপর্যায়ঃ—গল্লা-চ, শলা-চিংড়ি-ব, আইটা-মু, কাউঠা ইচা-বগু, lobster. বাগদা—মাঝারি রকমের একশ্রেণীর চিংড়ি (প্রীতিভোজে ইহার আদর খুব বেশী)। তৎপর্যায়ঃ—মোচা চিংড়ি, ভদই চিংড়ি-মে, prawn.
চিকরা—(পাকাল দ্র)। **চিতল**—চিথোল-মু। ছোট চিতলকে বলা হয়—কাড়ে-বগু, চিতলফাড়িয়া-ম। **চুঁচড়ো, চুনা / চুনো**—(কুচা দ্র)।
চেউয়া—(গুলে দ্র)।
চেং / চ্যাং, চেঙ্গ—লেটা জাতীয় মাছ, মাথাটা অনেকটা সাপের মাথার মত চেপটা; শুকনায় পড়িলে সাপের মতই শরীর বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া দ্রুত চলে। অনেকেই এই মাছ খায় না। তৎপর্যায়ঃ—চেঙ্গো, চেংটাকি-ঢা, উলকো-চ, উটকাল / লাউয়াটাকি-ব. ফ. রাবা / রাউয়া-ম।

মনসামঙ্গলে দেখিতে পাই, চাঁদসদাগর মনসাকে **'চেঙ্গমুড়ি কানী'** বলিয়া গালি দিতেন। মনসা সর্পদেবী অনেক বিষধর সর্পের মুণ্ডের সহিত চেঙ্গ-মুণ্ডের তথা

চেঙ্গ-মুড়ির একটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মুণ্ড অর্থে বাংলায় 'মুড়া' 'মুড়ি' শব্দ বহুপ্রচলিত। মাছের 'মুড়িঘণ্ট' বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় খাদ্য।

চেলা—বাঁশপাতা মাছ-ম. ঝা. পু, শাদা রঙের এক রকম চেপ্টা ছোট মাছ।

জাওলা মাছ-চ—কই মাগুর শিঙ্গি প্রভৃতি মাছ, যাহা দীর্ঘদিন জিয়াইয়া রাখা যায়। তৎপর্যায়ঃ —জিওল মাছ / জিয়ল মাছ-দি. মা. পূব (শিঙ্গি দ্র)।

টাকি—লেটা, ছোটজাতের লেটা, উকল।

টেপা-ক—পিঠ সবুজ, পেট শাদা, মুখে ফুঁ দিলে গোল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তৎপর্যায় :—পোটকা-ফ. ব, ফোটকা-ম।

টেংরা—আঁশবিহীন এক শ্রেণীর ছোট মাছ ; মুখের দুই পাশে এবং পিঠে ছুঁচালো কাঁটা আছে। তৎপর্যায়ঃ—টেংনা-রং। বড় জাতের টেংরা—গাগর-বগু। ছোট জাতের টেংরা—বজরা-ঢা. ফ, বজরি-ম।

ডানকিনা-ঢা. ফ—চুনোবর্গের মাছ। তৎপর্যায় :—ডানিকোনা-মে, দাড়কিনা-ম, দাঁড়ি / দাঁড়কে-চ, রানী।

ঢাঁই, ঢাইন — ধাঁই, সমুদ্রজাত আঁশবিহীন একশ্রেণীর বৃহৎ মৎস্য।

তপসী / তপসে—(সং তপস্বী)—তপসিয়া-পূব, সোনালী রঙের ছোট মাছ—মুখে বিড়ালের গোঁফের মত গোঁফ আছে। **তাজি**—(কেচকি দ্র)।

তারা বাইন—বাইনের প্রকারভেদ। ইহার গায়ে তারার মত বহু দাগ আছে।

তেলাপিয়া—(আমেরিকান কই দ্র)।

দাড়কিনা, দাঁড়কে, দাঁড়ি—(ডানকিনা দ্র)। **ধেড়াই. ধেন্ধা / ধ্যান্ধা, নয়না**—(নেধশ দ্র)।

নলা-পূব—কিলো দেড়কিলো ওজনের ছোট পোনা মাছ। তৎপর্যায় :—নওলা-পা. বগু, লহনা-মু, নইচা-ক, রউকড়া-ম। নল বিশিষ্ট (দোনলা বন্দুক)।

নাইপ্তা, নাপ্তিত মাছ—কালো রঙের চুনোজাতীয় মাছ ; ইহা অনেকেই খায় না।

নান্দিন, নানিদ, নাদিম-পা—কালবোস জাতীয় মাছ ; ইহার মাথাটি ছোট, পেটটি বেশ চওড়া। **নিশে**-মে—তপসে জাতীয় মাছ।

নেধশ / ন্যাধশ-ক—ভেদা / ভেদি / ভেতুরি-পূব. উব, মেনি-ঢা, রয়না-ফ. ঢা. য. খু, নয়না / খাঁদি-চ, পদ্মকাতল-ঢা, ধেড়াই-রং, ধেন্ধা / ধ্যান্ধা-বগু।

নোয়ারি—রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছের বাচ্চা। তৎপর্যায় :—পোনা-ক, পাইকামাছ-ম, চারামাছ-চ।

পাঁকাল / প্যাঁকাল-ক—বাইন জাতীয় মাছ, মুখ ছুঁচালো, লেজ সরু, চামড়া

শক্ত ; ইহারা সাধারণতঃ পাঁকে থাকে। তৎপর্যায় :—গচি-রং. মা. দি, পুঁয়ে-বগু, চিকরা-ম। **পাঙ্গাশ, পঙ্গাশ**—বোয়াল জাতীয় মাছ ; অনেকেই খায় না।

পাবদা-ক—পাপতা-ঢা. ফ. পা. দি. মা, পাইব্যা-ম, পা'ব, পাবা-খু, আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ।

পারশিয়া / পারশে-ক— চেলকা-মে, মৃগেল মাছের বাচ্চার মত শাদা রঙের ছোট মাছ।

পুঁটি (সং প্রোষ্ঠী, সাঁ পুবি)—শাদা রঙের ছোট মাছ।

গোবরে পুঁটি, তিতপুঁটি-ক. ম. ব—এই শ্রেণীর পুঁটির লেজের দুইদিকে কালো রঙের দুইটি দাগ থাকে। বড়জাতের পুঁটি—সরলপুঁটি-ক. মে, সেরন পুঁটি-বগু. রং, সরপুঁটি-ঢা. ফ. ব, পোঁটা-ম। পুঁটি ছোট মাছ হইলেও বাঙ্গালীর অনেক আচার-অনুষ্ঠানে (বিবাহ, বিজয়াদশমী) বিশেষ স্থান পায়।

পুঁয়ে—পাঁকালমাছ। **পোটকা**—(টেপা দ্র)। **পোঁটা**—(পুঁটি দ্র)।

পোনা, পোনামাছ-ক—পশ্চিম বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই 'পোনা' বলিতে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি বড় মাছের বাচ্চাকে এবং 'পোনামাছ' বলিতে ঐ সকল বড় মাছকে বুঝায় ; কিন্তু পূর্ব্ববালার এক বিস্তৃত অঞ্চলে শাল শোল লেটা ইত্যাদির বাচ্চাকেই সাধারণতঃ পনা (পোনা) বা পনামাছ বলা হয় এবং এই সকল বাচ্চা মাছের ঝাঁককে বলে—**'পনাবাইস'**। রুই জাতীয় বড় মাছের পেটের দিককে বলা হয়—মাছের **'কোল'**-ক, মাছের **'পেটি'**-পূব, পিঠের দিককে বলে—মাছের **'গাদা'**। মাছের মাথার দুইপাশের নিঃশ্বাস লইবার যন্ত্র—**কানকুয়া, কানকো**-ক, **কান্তা**-পূব। মাছের ডানা (যাহা দিয়া সাঁতার কাটে)—**পাখনা**-ক, **ফইর**-ম।

পোয়া, পোয়ামাছ—মাথাবড় মাঝারি ধরনের মাছ।

ফলি, ফলে-ক—ফলিয়া / ফইল্যা-ম, ফলুই-খু, কান্‌লা-ম. শ্রী, চিতল মাছের ধরন একশ্রেণীর ছোট মাছ। দেশাচার মতে বসন্ত রোগীকে আরোগ্য লাভের পর কোথাও কোথাও ফলি মাছ প্রথম পথ্য দেওয়া হয়।

ফাড়িয়া, ফাড়ে—ছোট চিতল। **ফেঁশা**-ক—ফেউয়া-ম. শ্রী ; এই মাছে খুব কাঁটা।

বইচা-ম—কুচো চাঁদা। **বগা মাছ**—(কাঁকাল দ্র)।

বজরা, বজরি—ছোট জাতের টেংরা। **বাইটকা**—বাটা জাতীয় মাছ।

বাইন, বান, বাম—পাঁকাল জাতীয় মাছ ; হঠাৎ দেখিলে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাদের মুখ সরু, চামড়া শক্ত ; কাদাজলেই ইহারা বেশী থাকে। কোথাও (মু)

ইহাদের 'কাদামাছ' নামও শুনা যায়। বাইন মাছের জাত অনেক: গাংবাইন (খুব বড় জাতের), তারা বাইন (গায়ে তারা চিহ্ন), কেড়া বাইন (ছোট জাতের)।

বাওলী—পাবদা জাতীয় মাছ, বাতাসী-চ। **বাগদা**—চিংড়ির প্রকারভেদ।

বাঘাইর—আইড় জাতীয় বৃহৎ মৎস্য; গায়ে হলুদ ও কালো রঙের চাকা চাকা দাগ থাকে।

বাচা—ছোট জাতের আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ, বাচি-মে।

বাটা—বাটার শ্রেণী এবং নাম অনেক: বাটা, কুরচি বাটা, খড়কে বাটা, ভাঙ্গন বাটা-চ / ভাংনা-ম. পা. রং, টাটকেনী-ঢা. ক. ব, রায়েক-ঢা. ফ. পা. খু, রায়ফল-ব, আখ্‌লা, বাক্‌লা-বগু।

বাঁশপাতা—চেপটা ধরনের শাদা ছোট মাছ। (চেলা দ্র)।

বেলে-ক—এই মাছ খুব নরম, অগভীর জলে বালি মাটির উপর শুইয়া থাকে। তৎপর্যায়:— বালিয়া / বাইল্যা-পূব, বাইলে-বগু, বালিগড়া-য, বালকিড়া / বালকুড়া-হিজ, কটকটিয়া / কটকইট্যা-ম।

বোয়াল / বোল [সং বোদাল, সাঁ বোয়াড়]—আঁশবিহীন বিস্তৃতমুখ বড়জাতের মাছ। রাঘব বোয়াল—খুব বড়জাতের বোয়াল; বাংলার বহু রূপকথা ব্রতকথায় এই রাঘববোয়ালের উল্লেখ আছে। বোয়াল পাত্যুয়া—ছোট বোয়াল।

ভরুঙ্গা-বগু—বিলঝিলের ছোটজাতের রুই।

ভাংনা—ভাঙ্গনবাটা, বাটার প্রকারভেদ (বাটা দ্র)।

ভাঙড়-ক—মৃগেল মাছের ধরন অপেক্ষাকৃত ছোট মাছ। সিদ্ধিখোর।

ভেটকি—বড়জাতের সুপ্রসিদ্ধ মাছ; এই মাছটি পূর্ববঙ্গের হাটে বাজারে খুব কম দেখা যায়। **ভেদা**—(নেধশ দ্র)।

মহাশোল, মাশুল—রুই জাতীয় মাছ (পাহাড়িয়া নদীতে বেশী থাকে)।

মাগুর [সং মদগুর, সাঁ মাগরী]—মজগুর-ব, আঁশশূন্য জাওলা মাছ বিশেষ (জাওলা দ্র)। গাং মাগুর—এক শ্রেণীর বড় মাগুর।

মৃগেল, মিরগেল-ক—রুই কাত্‌লাজাতীয় মাছ। তৎপর্যায়:—মিরকা / মিরগা পূব, মিরিক-বী।

মোরলা [সং মুরল]—দুই পাশে ডোরাকাটা শাদা রঙের ছোট মাছ। তৎপর্যায়:—মুরল-মে, মরলা / মলা-ম, মোয়া / ময়া-মু. দি. মা. বগু. রং. ঢা, মায়া-খু, মৌশি-পা, মলন্দি-ক, মলান্দি / মলিন্দা-ব, মৌটে-চ।

রউ—রুইমাছ। রউকড়া—ছোটরুই (নলা ও রুই দ্র)।
রয়না—(নেধশ দ্র)। **রাঘা, রাউয়া, রাঘুয়া**—চেং মাছ।
রায়ফল, রায়েক—বাটা পর্যায়ের মাছ (বাটা দ্র)। **রিঠা / রিঠে**— আঁশ-বিহীন এক প্রকার মাছ। ফল বিশেষ (পশমী কাপড় কাচে)।
রুই [সং রোহিত, হি রহু, সাঁ রুই]—রউ-ম। সুপরিচিত সর্বোৎকৃষ্ট মৎস্য। কথিত হয়, 'মাছের মধ্যে রুই, শাকের মধ্যে পুঁই।' মুড়িঘণ্ট—রুই প্রভৃতি মাছের মাথা দিয়া প্রস্তুত উপাদেয় ব্যঞ্জন বিশেষ।
লাচ'—আঁশবিহীন সুস্বাদু মাছ।
লেটা / ল্যাটা-চ—শোল জাতীয় মাছ, কিন্তু শোলের চেয়ে নরম এবং ছোট। তৎপর্যায় ঃ—নেটা / ন্যাটা-ন. রাঢ়, লাটা, লাটি / লাইট্যা / উকল-ম, টাকি-ঢা. ফ. পা. রং, গুটি-দি. মা, গোটকুন-মু, গড়াই-রং, গড়ই-মু. বগু. ব, চেংটি / সাঁটি-রং।
নেটা, লেটা—ডান হাতের বদলে যে বাঁ হাতে কাজ করে।
শঙ্কর মাছ—সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষ ; ইহার চাবুকের মত লম্বা পুচ্ছ থাকে।
শাটিং-চ—খয়রা ধরনের শাদা রঙের মাছ।
শাল মাছ—গজার দ্র। **শোল** [সং শকুল, সাঁ কারশোলা]—শৌল-পূব।
শিঙ্গি, শিং [সং শৃঙ্গী, সাঁ সিসিং]—মাগুর জাতীয় মাছ। তৎপর্যায় ঃ—কানছ-বগু, জিওল মাছ / জিয়ল মাছ-ফ. মু. পা. ম. ঢা। নিষ্ঠাবান হিন্দুদের অনেকেই এই মাছ খায় না ; কিন্তু রোগীর পথ্যরূপে নির্দিষ্ট হয়।
শিলোন—আইড় জাতীয় মাছ, শিলিন্দে-খু, শিলং-ম।
শেলে—ভেটকির ধরন সামুদ্রিক মাছ। **সাঁটি**-রং—লেটা জাতীয় মাছ।
স্বর্ণ খড়িকা / খইড়কা—স্বর্ণাভ খুব ছোট মাছ (কেচকি দ্র)। খড়িকা / খড়কে—সরু কাঠি (প্রায়ই দাঁত খোঁচাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

১ (খ) মাছ ধরিবার নানারকম সরঞ্জাম

চিত্রছাড়া যেমন মাছের তেমনই মাছ ধরার বিচিত্র যন্ত্রপাতিরও সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন অঞ্চলের যন্ত্রপাতির নামই শুধু বিভিন্ন নয়, তাহাদের ধরনগড়নও স্বতন্ত্র। এখানে সেই সকল স্থানীয় নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা বর্ণানুক্রমে দেওয়া হইল। স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ বর্ণনা এবং আঞ্চলিক সমনাম দিতেও চেষ্টা করিয়াছি।
আওড়া-ফ—বাঁশের তৈয়ারি দোমুখা ফাঁদ।

আটল-পব. য. খু—চারো-খু, বাঁশের পাতলা কাঠির তৈয়ারি বাক্সের মত ফাঁদ।
আতর-ন, **আনতা**-ঢা. ত্রি. নো—বাঁশের বিভিন্ন রকম ফাঁদ।
উছ / উছা-ম—(হোচা দ্র)। **উড়া জাল**—খেপ্‌লা জাল (যেন উড়িয়া যায়)।
উনিয়া / উইন্যা-ম—ব্যাংলা ৫ পাচের ধরন বাঁশের শলির খাঁচা বিশেষ; *অনেকটা মেদিনীপুরের 'মুগরি'র মত ; ইহাতে মৌরলা ইত্যাদি মাছ ধরা হয়।*
কই জাল, কইয়া জাল-পূব. খু. য—নাগাজাল-জ. কো, সুতা দিয়া ছোট ছোট খোপ করিয়া বোনা ২৫-৩০ ফুট লম্বা ২-৩ ফুট চওড়া জাল বিশেষ; কই, শিঙ্গি ইত্যাদির চলাচলের পথে এই জাল লম্বালম্বিভাবে পাতিয়া রাখা হয় এবং এই সকল মাছের মাথা জালের খোপে আটকা পড়ে; কোথাও ইহাকে 'ফাঁসিজাল'ও বলা হয়।
কনুই জাল—খেপলা জাল (কনুই-এর উপর তুলিয়া ঘুরাইয়া ফেলিতে হয়)।
কুঁড়া জাল / কুঁড়ো জাল-য. খু. চ—ধর্মজাল-য. ফ, শিব জাল, টাগ জাল-ম, ছুপনি জাল / ঝাটি জাল-জ. কো; সমচতুর্ভুজ (এক একটি ধার ৮-৯ ফুট থাকে) জালের কোণগুলির সহিত কোনাকুনিভাবে (diagonally) দুইটি গোল বাখারি অর্ধ বৃত্তাকারে বাঁধিয়া এবং বাখারি দুইটির সংযোগস্থলে একটি সরু লম্বা হাতল সংযুক্ত করিয়া এই জাল তৈয়ার করা হয়। জলে পাতিয়া কিছু কুঁড়া ছড়াইয়া দিলে প্রচুর চিংড়ি মাছ আসিয়া জড় হয়।
কেঁচা-মু, **কোঁচ, কোঁচা**-উব—লোহার বহু ছুঁচালো শলাযুক্ত অস্ত্র বিশেষ।
কোনা জাল-ফ. খু—এই জালে সাধারণতঃ ইলিশ ধরা হয়।
খগরা, খাগরা—(সাগরা দ্র)। **খড়কি জাল**—ইলিশ ধরিবার জাল বিশেষ।
খরা / খরা জাল-ম—ভেসাল জাল-ঢা. ফ. য. খু. চ; চব্বিশ পরগনায় ইহাকে 'ফেটাজাল'ও বলা হয় (ফেটাজাল দ্র)। একটি চাটাই-এর একপাশ দুমড়াইয়া দুইটি কোণ একত্র করিলে এই জালের আকৃতির একটা নমুনা পাওয়া যায়। কিন্তু যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের খরা বা খড়া জালের আকার স্বতন্ত্র; ইহা চতুষ্কোণ, কুঁড়া জালের ধরন, কিন্তু উহার চেয়ে বড়। এই জালে মাছ ধরিতে দুইজনের প্রয়োজন হয় এবং নৌকা লাগে।
খাদুল-য—মাছ ধরার বাঁশের ফাঁদ বিশেষ।
খুইয়া-ম—হোচা জালের ধরন, ইহা গামছা বা পাতলা কাপড় দিয়া তৈয়ার করা হয়; সাধারণতঃ কুচো মাছ ধরে।
খেপলা, খ্যাপলা-চ. য. ফ. ব—খ্যাওলা-খু, খেয়া জাল-মু, ফিকা জাল-মে,

ঝাঁকি জাল-ম. ঢা. ক, আংটা জাল / ভাউরি জাল-জ. কো, উড়া জাল, ঘুরনি জাল, কনুই জাল, থাপা জাল-ম। এই জালের কতকাংশ কনুই-এর উপর তুলিয়া শরীর একটু ঝাঁকিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া ফেলিতে হয়। তাড়াতাড়ি ডুবিবার জন্য এই জালের মাথায় বহুসংখ্যক সচ্ছিদ্র লৌহখণ্ড মালার আকারে বাঁধিয়া দেওয়া হয় ; এই লৌহখণ্ডগুলির নাম—জালের কাঠি।

গগনবেড়—বেড়জাল, বড় রকমের জাল যাহা দিয়া সাধারণত: পোনামাছ ধরে।

গলসা-খু—নদীতে মাছ (বিশেষ করিয়া ইলিশ) ধরিবার খুব লম্বা জাল।

গাঁতিজাল-চ—এই জালের বরফির মত ছোট ছোট খোপে কই, সিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদির মাথা আটকা পড়ে। **গোবাজাল**-চ.খু—এই জাল চার পাঁচ জনে টানিয়া নেয়, অনেকটা বেড় জালের মতই।

ঘুনি-চ. ন. য. খু. বর্ধ. মে—বাঁশের সরু কাঠির তৈয়ারি বাক্সের ধরন ফাঁদ বিশেষ।

চণ্ডীজাল-ক—ইলিশ ধরার জাল বিশেষ।

চার—মাছকে প্রলুব্ধ করিবার নানাজাতের মশলার পিণ্ড (পুকুরে চার ফেলা)। **চারো**—(আটল দ্র)।

চুঁই-বাঁ, **চুঙ্গি**-মে—কাতনা। **চৌড়া**-মে—বাঁশের শলার তৈয়ারি চতুর্মুখ ফাঁদ ; ইহাতে বড় বড় মাছ আটকায়।

ছাঁকনি জাল / ছাগনি জাল (ছাঁকনা- / ছাগনা-)-চ. খু. য. মু. মে—নাদাপেটা একরকম গোল জাল ; এই জালে ভাসা মাছ ছাঁকিয়া তোলা হয়। ২৪ পরগনায় ইহার 'চাকিন জাল' নামও শুনা যায়। **ছাবি জাল**-জ—খেপলা জাল বিশেষ।

ছুপনি জাল-জ—টাগ জাল, কুঁড়ো জাল-চ।

জনগা-রং—মাছ ধরিবার বাঁশের খাঁচা বিশেষ।

জলঙ্গা—(সাগরা দ্র)। **জাকই**-রং. জ. কো—সরুমুখ চেপটাতলা বাঁশের চুপড়ি (মাছের) বিশেষ। **জান**-মে—পাটা-দচ. খু. য, বানা-ম, বাঁশের শলার ঠাসবোনা বেড়া। মাছ আটকাইবার জন্য গভীর জলে বা স্রোতের মুখে যেখানে মাটির বাঁধ দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে প্রায়ই এইরূপ বেড়া ব্যবহার করা হয়।

জালি / ঠেলাজালি-ম—চব্বিশপরগনার ফেটাজাল বা ঢাকা ফরিদপুর যশোহরের হোচাজালের মত, কিন্তু ইহার তিনটি বাঁশের মধ্যে ডানদিকের হাতলটি বেশ লম্বা থাকে ; সাধারণতঃ ইহা দ্বারা কুচো মাছ ধরা হয়।

ঝকা / ঝোকা-জ. কো—পোলো। **ঝাঁকি জাল**—খেপলা জাল।

ঝুপাড়ি-মে, **ঝুপড়া**-ন—পোলো।

টাগ জাল—(কুঁড়া জাল দ্র)। **টাঙ্গি**-ক—ফাতনা।

টেটা, ট্যাটা—অঙ্কুশাকার বর্শা বিশেষ ; ইহাতে মাছ কি অন্য জন্তু বিদ্ধ হইলে সহজে ছুটিয়া যাইতে পারে না, কাতা-জ।

টোপ—ছিপে মাছ ধরিবার সময় বঁড়শিতে যে খাদ্য (মাছের) গাঁথা হয়।

টোপ ফেলা—প্রলুব্ধ করা।

ঠুয়া-ম, **ঠুসি**-য. রং—ঢোক্‌সা / বাগা-জ, বাঁশের শলির তৈয়ারি চোঙ্গাকৃতি এক প্রকার ফাঁদ।

তগি-বর্ধ—দঁড়-মে. খু. য. চ, দাওন-ক ; দুইটি খুঁটির সঙ্গে জলের ঠিক উপরে একটি লম্বা দড়ি বাঁধিয়া উহাতে ২-১ ফুটের ব্যবধানে কতকগুলি বঁড়শি টোপ গাঁথিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়।

দঁড়—(তগি দ্র)। **দাঁড়াজাল**-ক—ইলিশ ধরিবার জাল বিশেষ।

দুয়ের, দোয়াইর-ক—ভাইর-ম, ধেরু / ধিরোই-জ।

ধর্মজাল-য—কুঁড়াজাল। **ধোড়কা**-রং. জ—বাঁশের ঠুয়াজাতীয় ফাঁদ, ঢোক্‌সা (ঠুয়া দ্র)।

পলো-পূব—পলুই-বাঁ. বী, পোলো-পব, পলাই-রং, ঝুপড়ি-মে. ঝুপড়া-ম।

পাতন জাল-ক—ইলিশ ধরার জাল বিশেষ। **পাটা**—(জান দ্র)।

ফাতনা-ক—ফাত্‌রা-টা, পাতনা-চ, তেরেণ্ডা-ম, টাঙ্গি-ক, চুঁই-বাঁ. বী, চুঙ্গি-মে, শোলা বা পালকখণ্ড যাহা ছিপের সুতায় বাঁধা থাকে।

ফাঁস জাল-খু, **ফাঁসি জাল**-রং—এই জালে মাছের মাথা আটকা পড়ে।

ফেটাজাল-চ—বিস্তৃতমুখ ত্রিকোণাকার জাল বিশেষ ; সাধারণতঃ ইহাদের বড়গুলিকে ভেসাল জাল এবং হাতে ঠেলিয়া নেওয়া যায় এইরূপ ছোটগুলিকে ফেটা জাল বলা হয়—(খরা দ্র)।

বর্শা-য. খু—পাটকাঠির সঙ্গে হাতখানেক সুতায় বঁড়শি বাঁধিয়া টোপ গাঁথিয়া জোল জমিতে (ধানের) ফেলিয়া রাখা হয় ; টোপ খাইতে আসিয়া মাছ ধরা পড়ে, পাটকাঠিটি ধানের গোছায় আটকাইয়া যায়। বর্শা—সড়কি, spear।

বাচাড়ি জাল-খু—খুব বড় খেপলা জাল বিশেষ ; ইহা একজনে ঘুরাইয়া ফেলিতে পারে না, ৩-৪ জনে টানিয়া লইয়া যায়।

বানা-(জান দ্র)। **বেড়জাল**—বড় রকমের টানা জাল।

বৈউতি জাল / বাউতি জাল-খু—এই জাল খুব লম্বা হয়, নদীতে স্রোতের মুখে পাতিয়া রাখে এবং কোথায় পাতা হইয়াছে তদ্বিষয়ে নৌকাচালকদের

কোনও চিহ্ন দ্বারা সাবধান করিয়া দেওয়া হয়। নতুবা অনেক সময় এইসব জালে নৌকা ঢুকিয়া পড়ে এবং বিড়ম্বিত হয়।

ভাইর-ম—বাঁশের শলির ড্রামের ধরন ফাঁদ বিশেষ। তৎপর্যায় :—টেপাই / বুরুং / ধেরু / ধিরোই-জ. কো।

ভেসাল জাল—(খরা / খরাজাল দ্র)। **মাল্লি**-রং—মাছ আটকাইবার বাঁধ।

মুগরি-মে—বাংলা ৫-এর ধরন বাঁশের ফাঁদ বিশেষ।

লোচ / লোট-চ—থলের মত জালের অংশ, যেখানে মাছগুলি গিয়া জড় হয়।

সাগরা-ঢা. ফ. য. খু—খগরা-ম, খাগরা-ব, জলঙ্গা-ম, জালাঙ্গা-জ ; হোচা ধরনের, কিন্তু হোচার চেয়ে অনেক বড়, বাঁশের চেঁচাড়ি ও বাখারির তৈয়ারি। প্রায় সমচতুর্ভুজ চাটাই-এর একপাশ মুমড়াইয়া দুইটি কোণ একত্র করিলে ইহার গড়নের নমুনা পাওয়া যায়। ইহা ডালপালা (বিশেষ করিয়া সেওড়ার ডাল) দিয়া ঢাকিয়া পুকুরে, ডোবায়, বিলেখালে ফেলিয়া রাখা হয় এবং ৫।৭ দিন পর পর পাড়ে তুলিয়া প্রচুর মাছ (প্রধানতঃ জাওলা মাছ) ধরা হয়।

সারনী জাল-মে—বেড়জাল বিশেষ।

সালাং জাল / সাংলে জাল-য. খু. ফ—ইলিশ ধরিবার একপ্রকার বড় জাল।

হোচা-ঢা. ফ. য. খু—ঠেলা জাল বিশেষ ; ইহার ছিদ্রগুলি খুব ছোট থাকে, যাহাতে কুচো মাছ আটকা পড়ে। ময়মনসিংহের উছ / উছা এবং খুইয় হোচা পর্যায়ভুক্ত।

২ পশু

ইঁদুর [সং ইন্দুর, উন্দুর, হি মূসা, ইং rat]—মূষিক, ইন্দুর / উন্দুর-পূব, উঁদুর-নো, মুসা / উন্দর-খু, মশ / সালেরা-জ. কো। নেংটি ইঁদুর / নেংটে ইঁদুর-ক [হি চুহা, ইং mouse]—ছোট জাতের ইঁদুর। তৎপর্যায় :—বাতারি-ম, বাইতা শলই-ঢা. ফ. ব, বাইত্তা ইন্দুর-নো, শলই, শলা ইঁদুর-খু, ন্যাকনাই-জ. কো। ইঁদুর শস্যের প্রভূত ক্ষতি করে এবং প্লেগ রোগ ছড়ায়। আবার অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজও ইঁদুরের উপর দিয়া চলে।

উআঁপ-ম—একশ্রেণীর বন বিড়াল (বিড়াল দ্র)।

উদ-ম. শ্রী. ত্রি. নো [সং উদ্র, ইং otter]—মৎস্যপ্রিয় ও মৎস্য শিকারী জন্তু বিশেষ। তৎপর্যায় :—ভোঁদড়-চ, ধাড়ো / ধেড়ে-য. খু, ধাইড়া-ফ. ব।

উদবিড়াল / উদবেরাল—ভোঁদড় জাতীয় জন্তু বিশেষ ; কিন্তু ইহারা শুধু মৎস্যপ্রিয়ই নহে; পায়রা মুরগী প্রভৃতির উপরও ইহাদের লোভ যায়।

ওঁদা-ক—মর্দা বিড়াল, উন্দা-ম।

কটা-ব – কাঠবিড়াল জাতীয় প্রাণী, নারিকেলের খুব অনিষ্ট করে।

কটি বানর—(কাঠবিড়াল দ্র) **কাচর** – (মহিষ দ্র)।

কাঠবিড়াল / কাঠবেরালি [ইং squirrel]—শরীরে লম্বা ডোরা কাটা, লোমশ পুচ্ছ একপ্রকার গেছো প্রাণী। তৎপর্যায় ঃ—কটি বানর-ম।

কুকুর [সং কুক্কুর, হি কুত্তা, ইং dog]—কুত্তা। স্ত্রীকুকুর - কুকুরী, কুত্তী [হি কুতিয়া, ইং bitch]। শিকারী কুকুর—পূর্ব বঙ্গের বহু অঞ্চলে ইশ্‌কারী কুকুর / -কুত্তা (hound) রূপে উচ্চারিত হয়। খেঁকী কুকুর—যে কুকুর অল্পেতেই খেঁকায়।

খটাশ, খাটাশ-ম. মে. য [সং খট্টাশ / -স, ইং pole-cat, civet-cat]—গন্ধ মার্জার, গন্ধ গোকুলা, কটাশ-হা. হু। শীতকালের রাত্রিতে মাঠে মাঠে ইহাদের 'হো-হো-হো'-এর মত এক প্রকার তীব্র চীৎকার শুনা যায়।

খরগোশ [সং শশ, শশক, হি খরহা, ইং hare]—দ্রুতগতি ত্রস্ত প্রাণী বিশেষ। তৎপর্যায় ঃ—শশক, শোঁশা-বাঁ. বী, শুশা-ত্রি, খ্যাশা / ভোট-জ. কো, খরা-দচ, লাফা-খু, লাফারু-ফ. ব, কটিয়া / কইট্যা-ম।

গোরু, গরু [গোরূপ]—বাংলায় গোরু / গরু বলিতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর গোরুকেই বুঝায়। স্ত্রীগোরু—গাভী, গাই [হি গায়, ইং cow]। পুংগোরু —ষাঁড় [হি সাঁড়, ইং ox], আঁড়িয়া, আঁড়্যা, এঁড়্যা, এঁড়ে, ডেকা-পূব। বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে যে-ষাঁড় উৎসর্গ করা হয় তাহাকে বলে—বিরিষ, ধর্মের ষাঁড়, খোদার ষাঁড়, রাউলের ষাঁড়-ম। শ্রাদ্ধাদিতে যে-স্ত্রীগোরু উৎসর্গ করা হয় তাহাকে বলে—বৈতরণী।

ছিন্নমুষ্ক ষণ্ড—বলদ, বরদা-পু, দামড়া, আবাল-য, দামা-শ্রী, হেলে / হেল্যা-মে। দরজাগোরু-বী—বৃদ্ধ অপটু গোরু। গড়িয়া বলদ—যে বলদ লাঙ্গল বা গাড়িটানার সময় বার বার শুইয়া পড়ে। মেই বলদ / মেইয়ার বলদ-পূব—ধান মলন দিবার সময় যে বলদটি কেন্দ্রে বা সকলের বামে থাকে। বাছুর [বৎসরূপ]—গোবৎস। পুং বাছুর [হি বছওয়া]—এঁড়ে বাছুর, ষাঁড় বাছুর, ডেকা বাছুর। স্ত্রী বাছুর [হি বছিয়া]—নই-ন, বক্‌না-চ, বকন-পূব। মেনা গোরু—যে গোরুর শিং নড়ে। ষাঁড়ের ঝুঁটি, ঝিটা-মে, গজ-ম, চোচ-ঢা—ককুদ, hump. পালান-পব—গাভীর স্তন, ওলান-নো, উর্-ম, এঁডুয়াল-বাঁ। বান—বাঁট, স্তনের বোঁটা। গলকম্বল—গোরুর গলদেশের কম্বলের মত মাংস, লতি-ম, dewlap. গাভিন, গাভীন—গর্ভিণী (গাভিন গাই) -ডেকী,শ্রী।

আঁওল্-রাঢ়, জল-পূব—প্রসবের কতক্ষণ পর গাভীর উদর হইতে রক্ত মাংস জড়িত যে পদার্থ বাহির হয়। গোরু শব্দ যোগে প্রবাদ :—'গোরু মেরে জুতো দান', 'এড়া গোরুর দেড়া টান,' 'হিসাবের গোরু বাঘে খায় না,' 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে', 'ঘর পোড়া গোরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়', 'অবোধের গোবধেই আনন্দ', 'ক-অক্ষর গোমাংস', 'কানা গোরু বামুনকে দান', 'কানা গোরুর ভেনো ডয়র।' গোরুর দেবতা :—গোরক্ষনাথ (ঠাকুর গুরুথ)-ম, ত্রিনাথ, মানিকপীর, গাজিপীর, পাঁচপীর...।

চিকা-পূব [সংচিক্ক, হি ছছুন্দর, ইং shrew]-গন্ধমূষিক। ছুঁচা / ছুঁচো, ছুছুন্দরী, চিয়া-নো।

ছাগল—সংস্কৃতে ছাগল বলিতে ছাগ এবং ছাগী উভয়কেই বুঝায়। কিন্তু বাংলার বহু অঞ্চলে ছাগল বলিলে শুধু স্ত্রীজন্তুটিকেই বুঝায়। তৎপর্যায়ঃ—ছাগী, পাঁঠী / পাঁটী, বক্‌রী, she goat. পুংছাগল—ছাগ, পাঁঠা / পাঁটা, বক্‌রা, he goat. খাসি [আ. খস্‌সী]—ছিন্ন-অণ্ড পাঁঠা। রামছাগল—বড় জাতের ছাগল (প্রায়ই বাংলার বাহির হইতে আমদানী করা হয়)। নির্বোধ ব্যক্তিকে অনেক সময় 'রাম ছাগল' বলিয়া গালি দেওয়া হয় (রাম ছাগল কোথাকার)।

ছুঁচা, ছুছুন্দরী—ইহা এটা ওটায় মুখ দেয়, গন্ধমূষিক (চিকা দ্র)।

ধাইড়া, ধাড়ো, ধেড়ে (ধাড়িয়া)—মৎস্য শিকারী জন্তু বিশেষ (উদ দ্র)। ধেড়েঘাটা—চিত্রা নদীর তীরবর্তী যশোহরের একটি গ্রাম। হয়ত এককালে এই স্থানটি ধেড়ে অধ্যুষিত ছিল।

নেউল [সং নকুল, হি নেওলা, ইং mongoose]—বেজি, বেঁজি, বিজি-বী। পূর্ববঙ্গে 'নেউল' শব্দটিই অধিক প্রচলিত।

বাঘ—ব্যাঘ্র, স্বনামপ্রসিদ্ধ বন্যজন্তু। সুন্দর বনের অতিকায় বাঘকে Royal Bengal Tiger বলা হয়। চিতাবাঘ, নেকড়েবাঘ, বাঘডাসা, বাঘরোল, বাঘালিয়া, গোবাঘা—নানা শ্রেণীর বাঘ বা বাঘের তুল্য জীব। স্ত্রীবাঘ—বাঘিনী, বাঘুনী-ম। বাঘ অর্থে বাঘা শব্দটিও প্রায়ই শুনা যায় ('বাঘায় বুলে বাঘুনী ওরে, ঐ না পথে যাইও। অমুকের গোরু দেইখ্যা সেলাম জানাইও'-ম—কার্তিকব্রতের গীত। 'অমুকের' স্থলে কাহারো নাম বলা হয়)। এই হিংস্র জন্তুটিকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় অসংখ্য ছড়া, গান, কথাকাহিনী, লোককৃত্য ও লোকাচারের সৃষ্টি হইয়াছে; ব্যাঘ্রদেবতারূপে অনেক পীর-দেবতা পূজা ও শিরনী পাইয়া থাকেন।

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের ও বড় খাঁ গাজীর বহু বাঘ-বাঘিনীর নামের উল্লেখ আছে। এই সকল নাম যে কবির নিছক কল্পনাপ্রসূত, তাহা নহে। অনেক নামই ব্যাঘ্র-ব্যাঘ্রীদের আকৃতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া, উহাদিগকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলের বাঙ্গালীসাধারণের দেওয়া। যেমন,—কাশুয়া বাঘরৌল (যে বাঘ কাশ বনে থাকে), মাচবাঘরোল (মাছ খেকো বাঘ), বেড়াভাঙ্গা (যে বাঘ বেড়া ভাঙ্গে), টং ভাঙ্গা (যে বাঘ টং ভাঙ্গে), পাটাবুকা (বুক যাহার পাটার মত প্রশস্ত), ফেটানাকা (যে বাঘের নাক খুব চওড়া), বিলকাঁধা (যে বাঘ বিল ঝিলের ধারে শিকারের আশায় থাকে), হোগলাবুনিয়া (হোগলা বনে থাকে), হুড়কাখসানে (ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য যে বাঘ হুড়কা খসাইতে চায়), কিড়িমিড়ি (যে বাঘ শিকার দেখিয়া কিড়মিড় করে), লকলকি (যাহার জিহ্বা লক্ লক্ করে), নাদাপেটা (যে বাঘের পেট নাদার মত বড় ও গোল), বাটপাড়্যা (বাটপাড়ের মত যে বাঘের ব্যবহার), হামলা (যে হামলা করে), দাবাড়্যা (যে দাবাড় দেয়), গুড়গুড়্যা (যে চুপি চুপি আসে), কালানল / পাবকমুখী (যাহার মুখ আগুনের মত ভয়ঙ্কর)। এইরূপ আরও অনেক নাম আছে।

দক্ষিণ রায়ের ব্যাঘ্রবাহনের নাম—'লোহাজঙ্গ দানা' এবং বড় খাঁ গাজীর বাহনের নাম—'খান দাউড়া, খান দাউদা।'

প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রদেবতা ও পীরের নামঃ দক্ষিণ বঙ্গে (দচ. খু. ব. সুন্দরবন) দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী বা মোবারক গাজী ও বনবিবি ; উত্তরবঙ্গে (রংপুর, পাবনা) সোনারায় বা সোনাপীর। পূর্ববঙ্গে (ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট) বাঘাই ঠাকুর, গাজীসাহেব ও শালপীন। ইহাদের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক বিবিধ ছড়া-গান গাহিয়া বাংলার বহু অঞ্চলে গ্রাম্য বালকেরা পৌষমাসে 'মাগন' মাগে, শিরনী দেয়, চড়ুইভাতি করে। ময়মনসিংহে পৌষ-মাগনের এই সকল ছড়া-গানের লোকপ্রসিদ্ধ নাম **'বাঘাইর বয়াত'**।

বাঘডাসা-ঢা. ফ. ব—ছোট জাতের বাঘ বিশেষ, **বাঘালিয়া / বাঘাইল্যা**-ম. শ্রী।

বাঙ্গর-ম—মহিষ। **বাতারি, বাতাশলই**—নেংটি ইঁদুর (ইঁদুর দ্র)।

বানর [হি বন্দর, ইং monkey]—বাঁদর, বান্দর-পূব। হনুমান—বড় জাতের বানর ; ইহারা ফলাদির খুব অনিষ্ট করে, অথচ সংস্কারবশতঃ কেহ ইহাদিগকে মারে না। হনুমান—মহাবীর, পবন ও অঞ্জনার পুত্র রামভক্ত মহাবীর হনুমান।

বিড়াল / বেড়াল / বেরাল [হি বিল্লী, ইং cat]—মার্জার। তৎপর্যায়ঃ—

বিলাই-পূব. উব, মেকুর-পূব, মেউর-খু, নাকার-জ. কো। মর্দা বিড়াল—হুলা / হুলো, ওঁদা-পব, উলা / উন্দা-ম, ভোঁজা-নো।মাদী বিড়াল—মেই, মেচি, মেনী।

বনবিড়াল—বাট বিলাই- জ. কো, উআঁপ-ম, মোআঁপ-নো। উআঁপ-এর ডাক অনেকটা 'উআঁপ' বা 'মাপ'-এর মত। শেষরাত্রিতে যখন ইহারা (উআঁপ) ঐরূপ শব্দে ডাকে, তখন বৃদ্ধাদের কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'সুখ না দুখ'? জিজ্ঞাসার পরে শ্রুত ডাকের ভঙ্গি হইতে প্রশ্নকারী আপনার ভাগ্যে কি আছে বুঝিয়া লন। বিড়ালতপস্বী—ভণ্ড।

শইল (শল্য)—মৃতপশুর (বিশেষ করিয়া বিড়ালের) ভূগর্ভস্থ অস্থি। শইল-তোলা—শল্যোদ্ধার, বাস্তুজমি হইতে মৃতপশুর অস্থি উত্তোলন।

বাঘের সহিত বিড়ালের কতকটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে 'বাঘের মাসী' বলা হয়। ইহাদের পোষমানা সম্পর্কে নানা গল্পকথা প্রচলিত আছে। অঞ্চল-ভেদে কালো বিড়ালকে ষষ্ঠীর বাহন মনে করা হয়।

বৈতরণী—(গোরু দ্র)। উড়িষ্যার একটি নদী। যমালয়ের কল্পিত নদী।

ভইষ, ভঁইষ—মহিষ। ভয়ষা, ভঁয়ষা—ভইষ বা মহিষ জাত (ভঁয়ষা ঘি)।

ভাম-পব—ইহারা একদিকে যেমন কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল বিনষ্ট করে, অন্যদিকে তেমনই হাঁস, পায়র', মুরগী ইত্যাদির উপর আক্রমণ চালায়। তৎপর্যায়ঃ—লঙ্গর-ম, নেল-চা, সারকেল-খু।

ভেড়া [সং ভেড, হি ভেঁড়, sheep]—মেষ। তৎপর্যায়:—মেড়া, গাড়ল। স্ত্রী ভেড়ী, ewe. ভেড়ুয়া / ভেড়ো—ভেড়ার তুল্য, ভীতু। স্ত্রৈণ। বাইজীর সঙ্গে যে বাজায় বা সঙ্গত করে।

ভেড়ার ঘর—দোলের পূর্বদিন সন্ধ্যায় খড়কুটা দিয়া একটি কুঁড়ে তৈয়ার করিয়া মহোল্লাসে তাহা দগ্ধ করা হয়; কুঁড়ে-ঘরটিই শুধু দগ্ধ করা হয় না, উহাতে পিটালি বা খড়ের তৈয়ারি একটি ভেড়া বা মানুষের, কোথাও বা উভয়ের মূর্তি স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগ করা হয়। পূর্ববঙ্গে এই ঘরকে ভেড়ার ঘর বা মেড়ার ঘর বলা হয়; কোথাও বুড়ীর ঘর কথাটিও শুনা যায়।

ভোঁদড়—মৎস্যপ্রিয় জলজন্তু বিশেষ। (উদ দ্র)।

মহিষ [হি ভৈঁসা, ইং buffalo]—মইষ / ভইষ-পূব, মোষ-পব, বাঙ্গর-ম। বয়ার (পুং মহিষ), কাক্‌নী (স্ত্রী মহিষ)। মইষা-পূব—মহিষজাত (মহিষা দই)।

মেই, মেকুর, মেচি—বিড়াল দ্র)।

রাউলের ষাঁড়—ধর্মের ষাঁড়; শ্রাদ্ধে যে ষাঁড় উৎসর্গ করা হয় এবং যাহা পথে

প্রান্তরে, হাটে বন্দরে স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়ায়। কোনও যুবক যদি উপার্জন না করিয়া অপরের উপর বসিয়া খায়, তবে অনেক সময় তাহার প্রতি 'রাউলের ষাঁড়' কথাটি প্রয়োগ করিতে শুনা যায়।

লঙ্গর-ম—ভাম বা ভামজাতীয় প্রাণী (ভাম দ্র)। **শইল**— (বিড়াল দ্র)।

শিয়াল / শেয়াল [হি শিয়ার, গীদড়, ইং jackal]—শৃগাল, গিদ্ধর-মে।

খেঁকশিয়াল / -শিয়ালি [হি লোমড়ী, ইং fox]—পাতিশিয়াল (ছোটজাতের)।

সেজা / হেজা-পূব—সজারু, porcupine.

হুঁড়ল-মে—হায়না।

৩ পাখী

আণ্ডা, এণ্ডা [অণ্ড, egg]—ডিম। আণ্ডাবাচ্চা—ছানাপোনা (পাখী সম্পর্কে), ছেলেপেলে (মানুষ সম্পর্কে)।

কইতর, কবুতর [হি কবূতর, ইং pigeon]—কপোত (পায়রা দ্র)।

কলাচোষা, কলাচোরা-পূব—বাদুড়, bat।

কাক [হি কৌওয়া, ইং crow]—কাগ, কাই-চট্ট, কাইয়া-দি. মা, কাউয়া-পূব, কাওয়া-মে. পু, কাও-য, কেউয়া-বাঁ, কৌয়-বী।

দাঁড়কাক-ক, ডালকৌয়-বী—বড় জাতের কাক ; ইহাদের সমস্ত শরীর কালো।

পাতিকাক-ক, ধুরাকাউয়া-ম—ছোট জাতের কাক ; ইহাদের গলদেশ ধূসর।

কা কা—কাকের ডাক। কাকবলি / কাকবইল-পূব—নবান্নে, মৃতাশৌচে কাকের উদ্দেশে দেয় নৈবেদ্য, আলোচাল, দুধকলা ইত্যাদি। অনেকের বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ-শান্তি না হওয়া পর্যন্ত মৃতব্যক্তির আত্মা কিছুকাল কাক-দেহে অবস্থান করে এবং পিণ্ডাদি কাকরূপেই গ্রহণ করে।

কাক, কাগ [সং কর্ক, ইং cork]—শিশি বোতলের ছিপি।

কাঠঠোকরা—লম্বা ঠোঁটওয়ালা পাখী বিশেষ ; গাছে কোটর করিয়া বাস করে।

কুকুয়া / কুক্যুয়া-ম, হাঁড়িকুড়ি-নো—দাঁড়কাকের মত বড় পাখী ; ইহাদের ডানার রং পোড়া মাটির মত ; ইহারা ঝোপেঝাড়ে বাসা বাঁধে, 'কু কু' শব্দে ডাকে। এই পাখী যাত্রাকালে পথে পড়িলে অনেকে যাত্রা স্থগিত রাখে।

কুটুমপাখী, কুটুমপক্ষী—মাথা কালো, গায়ের রং হল্‌দে, সুন্দর একরকম পাখী। জনশ্রুতি এই যে, কুটুমপাখীর ডাকে বাড়ীতে 'ইষ্টিকুটুম' আসার সম্ভাবনা থাকে। পূর্ববঙ্গে 'ইষ্টি' অর্থে আত্মীয় বুঝায়। 'ইষ্টিকুটুম' সহচর

শব্দ। ইষ্ট কামনা করে বলিয়াই হয়ত আত্মীয়কে গ্রাম্য কথায় 'ইষ্টি' বলা হয়। কুটুমপাখীকে হলদিয়া পাখী / হল্‌দে পাখী বলিতেও শুনা যায়।

কুড়া-ম—ডাহুক জাতীয় পাখী। কুড়াশিকার পূর্ববঙ্গের অনেক সৌখীন যুবকের হবি (hobby) বিশেষ; অনেকে ইহা জীবিকার্জনের জন্য পেশারূপেও গ্রহণ করে ('ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল। কুড়া শিগারে যাইতে বিদায় মাগিল ॥'—মৈগী)। বর্ষাকালই কুড়াশিকারের প্রকৃষ্ট সময় ('শিগারে চলিল বিনোদ পালা (পোষা) কুড়া লইয়া। কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে। জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে ॥'—মৈগী)।

কুড়াশিকারে চমৎকারিত্ব দেখাইয়া এককালে কুড়াশিকারীরা নবাব ও দেওয়ানদের নিকট হইতে যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিত। যেমন, 'কুড়াশিগার কইরা বিনোদ পাইল জমিন বাড়ী। ইনাম বকশিশ্‌ পাইল কত কইতে নাহি পারি।'—মৈগী।

কুলি—কোকিলের প্রাদেশিক রূপভেদ (কোকিল দ্র)। কুলি—সরুপথ। মুটে। কুলকুচি, কুল্লি।

কুরগা, কুরাল, কুরুয়া—বাজ, শিকারী পাখী বিশেষ (বাজ দ্র)। এই পাখীকে কোথাও কোথাও (নো) রামের 'বনঘড়ি' বলা হয়; রাম যখন বনে ছিলেন, তখন নাকি এই পাখী প্রহরে প্রহরে ডাকিয়া সময় জানাইত।

কেচ্‌কেচিয়া / কেচকেইচ্যা-ম—তাড়ুয়া-ক. ব। ইহার ডাক অতি কর্কশ, লেজ খুব লম্বা। এই পাখীকে অনেকে ঝগড়ার দূত মনে করে (হয়ত ইহার কর্কশ 'কেচ্‌ কেচ্‌' শব্দের জন্য)।

কোকিল—স্বনামখ্যাত পাখী, ইং cuckoo. কুহুলী-জ. কো, কুইলা-চট্ট, কুলি / কুইল-ম, কোয়েল (পদ্যে)—কোকিলের রূপভেদ। শ্মশানকুলি নামক আর এক শ্রেণীর পাখী আছে, যাহা মাত্র রাত্রিতেই ডাকে এবং রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে উহার 'কু' ডাক বাস্তবিকই বিকট শুনায়।

গৃধিনী [সং গৃধ্র]—শকুন জাতীয় পক্ষী; ইহার কর্ণ লম্বিত এবং রক্তাভ। গৃধিনীকে কোথাও কোথাও 'রাজাশকুন' বলা হয়।

ঘুঘু—বনকপোত বিশেষ, spotted dove. পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে ইহাকে 'ঢুপী' বলা হয়। ভিটায় ঘুঘু চরানো—কাহাকেও ভিটামাটি হইতে উচ্ছন্ন করা। ঘুঘু, ঘুঘুলোক—ধুরন্ধর, ছলচাতুর্যে অতি পাকা।

চড়াই, চড়ুই [সং চটক, ইং sparrow]—ছোট পাখী বিশেষ; সাধারণতঃ

চালের নীচে, বাতার ফাঁকে, দেওয়ালের খুপরিতে তৃণখড় দিয়া বাসা বাঁধে। চড়ুই / চড়া-পূব, চটোই-মু, চটা / চটাপাখী-হু. বর্ধ। ...চড়াই—উপর দিকে ওঠা বা উঠিবার পথ (প্রায়ই পর্বতাদিতে আরোহণ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়)। চড়াই-উৎরাই —পর্বতাদিতে উঠিবার ও নামিবার পথ। চড়াইভাতি / চড়ুইভাতি—বনভোজন, picnic.

চামচিকা / চামচিকে [সং চর্মচটকা]—ছোট জাতের নিশাচর পাখী বিশেষ। তৎপর্যায় :—চামচড়া-ম।

চিল [হি চীল, ইং kite]—বাজ জাতীয় (বাজের চেয়ে ছোট) পাখী বিশেষ, চিলা-উব্।

চৈতার বউ-পূব—বউ-কথা-কও পাখী।

টুনটুনি, টুনি-পূব—অতি ছোট পাখী। এই পাখীটিকে অবলম্বন করিয়া অনেক রূপকথার সৃষ্টি হইয়াছে।

ডাক-চ [সং ডাহুক / দাত্যূহ]—ইহাদের চঞ্চু হাঁসের চঞ্চুর মত চেপটা, নিম্নদেশ শাদা, পৃষ্ঠদেশ ধূসর। ডাউক, ডাইক—প্রাদেশিক রূপভেদ। অনেকগুলি একত্র হইলে ভীষণ কলরব আরম্ভ করে।

ঢুপী—ঘুঘু। **তই তই** / চই চই,-পূব.—এই জোড়াশব্দে হাঁসকে ডাকা হয়।

দয়েল, দোয়েল—ছোট গায়ক পাখী। দইখল, দইয়ল-ম, কালীদোয়েল-মে।

দণ্ড, ডণ্ড—নিশাচর পাখী বিশেষ। ইহা শয়নগৃহের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে গৃহকর্ত্রী অমঙ্গল আশঙ্কা করেন।

পানকৌড়ি-পব—মৎস্যাশী ডুবুরী পাখী। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও ইহাকে 'পানিখাউরী' বলে। এই পাখীকে পরিষ্কার জলে বার বার ডুবিতে ভাসিতে ও মাছ ধরিতে দেখা যায়।

পায়রা [সং পারাবত, ইং pigeon]—পয়রা-মে, কবুতর-পব, কোবিতর-মু, কইতর-ম. ঢা. ত্রি. শ্রী, কোতৈর-ফ. ব। গোলা পায়রা, লোটন পায়রা—পায়রার ভিন্ন ভিন্ন জাতি। এক শ্রেণীর কালো পায়রাকে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে 'জালালী কইতর' বলিয়া থাকে। কিংবদন্তী এই যে, কোনও জালাল ফকির কর্তৃক এই পায়রা এদেশে প্রথম আনীত হয়।

পেঁচা / প্যাঁচা [পেচক, হি উল্লু, owl]—নিশাচর পাখীবিশেষ, উলূক, কুইক্যা-চট্ট। স্ত্রী পেঁচী। পেঁচাকে লক্ষ্মীর বাহন মনে করা হইলেও ইহার ডাক অনেকেই বরদাস্ত করিতে পারে না, ইহা নাকি অমঙ্গলসূচক। লক্ষ্মীপেঁচা [barn owl]—

বড় জাতের পেঁচা। ইহারা রাত্রিতে শস্যক্ষেত্রের ইঁদুর ইত্যাদি মারিয়া গৃহস্থকে শস্যরক্ষায় সাহায্য করে। (হুতোম দ্র)।

ফিঙ্গা / ফিঙ্গে [সং কিঙ্গক্]—ফেচ্যুয়া-ম, ফেইচা-ঢা, ফেউচ্কা-ফ. ব, হেচ্যা-নো। পূর্ববঙ্গে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ 'সাজতে পারতে ফেচ্যুয়া রাজা।' ইহার সমর্থনে একটি উপকথাও শুনা যায়।

বক—বগ, বগা। বকধার্মিক—ভণ্ড। বকফুল—ফুল বিশেষ (ভাজা খায়)।

বাজ [সং শ্যেন, ইং hawk]—বড় জাতের শিকারী পাখী। তৎপর্যায়ঃ—কুরাল, বাজকুরাল-ফ. ব, কুরগা-নো, কুরুয়া / কুর‍্যুয়া-ম, সাচান / হাচান-জি (কুরগা দ্র)।

বাদুড়—কলাচোষা-ম. মে, বোগডোল- জ. কো, bat.

বাবুই [হি বয়া, ইং weaver-bird]—বালুই-দচ, বাউই, বায়ই-পূব, দরজি-মে। ইহারা তাল ইত্যাদি উঁচু গাছে তৃণাদি ঝুলির আকারে বুনিয়া অতি সুন্দর বাসা তৈয়ার করে ('তালগাছেতে বাবুই বাসা')।

বুলবুল, বুলবুলি, বুলবুলিয়া—ঝুঁটিওয়ালা ছোট পাখী, bulbul. ইহারা নরম খোসাযুক্ত ফল, ধান ইত্যাদি খাইতে ভালবাসে।

ভগদত্ত—এই পাখীর সঙ্গে রাজা ভগদত্তের অনেক কিংবদন্তী জড়িত আছে।

ময়ূর—স্বনামপ্রসিদ্ধ পাখী, peacock (বর্তমানে ভারতের জাতীয় পাখী)। মউর, মোর—ময়ূর-এর প্রতিরূপ।

মাছরাঙ্গা [king fiisher]—লম্বা চঞ্চুযুক্ত মৎস্যাশী পাখী। মাছ্যয়ারাঙ্গা-পূব, ঘড়েল-দচ।

মুরগী [ফা মুর্গ, hen]—কুক্কুটী। মোরগ—কুক্কুট, cock, মুরগা-পূব। মোরগ-মুরগীকে একসঙ্গে 'মুগামুগী' বলিতেও শুনা যায়। বহু মোরগ মুরগী বুঝাইতেও অনেক সময় 'মুগামুগী' কথাটি প্রয়োগ করা হয়। মুরগীকে 'রামপাখী'ও বলা হয়, অবশ্য ইহা বক্রোক্তি।

শকুন, শকুনি—তীক্ষ্ণচঞ্চু সুবৃহৎ পক্ষী, vulture. হকিন / হগুন-পূব, (শকুন-এর প্রাদেশিক রূপভেদ), হোকোশ-জ. কো।

হাড়গিলা-পূব [ইং adjutant stork]—সারসজাতীয় দীর্ঘকণ্ঠ পক্ষী। এই পাখী দেখিয়া ছেলেমেয়েরা ছড়া বলেঃ—'হাড়গিলারে ভাই, চিড়া কুট্ট খাই।'-ম।

হুতোম, হুতুম [ইং brownfish owl]—ভুতুম, বড়জাতের পেঁচা। 'ইঁদুর ধরিতে ইহারা ওস্তাদ। ('হুতুম ভুতুম রাইত ওজাগর দিনে ঘুম'—ছড়া)।

৪ সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গ

আঞ্জনি, আঞ্জুনি, আজনাই [সং আঞ্জিনেয়]—টিকটিকির ধরন প্রাণী বিশেষ। তৎপর্যায় :—আঞ্জিন-ম, আজিনা-ত্রি, আর্জিনা- ঢা. ফ, আচিনা-নো।

আরশুলা, আরসুলা,-শোলা,-সোলা [সং তৈলচৌরিয়া / তৈলপায়িকা, ইং cockroach]—আঁশর‍্যাশ-মু, আঁশুরাল-মা. দি, আঁইশরাল-রা, তেলাপোকা, তেলাচোরা / তেলচোরা-পূব।

উই [হি দীমক, ইং white ant]—উইপোকা, পিপীলিকাজাতীয় অতি অনিষ্টকারী কীট বিশেষ। গাঙ্গেয় অঞ্চলে ইহার 'রুইপোকা' এবং পূর্ববঙ্গে 'উলি' 'উলু' নামও শুনা যায়। উইঢিবি—ঢিবির মত করিয়া তৈয়ারি উইপোকার বাসা।

উকুন [সং উৎকুণ, হি জুআঁ, ইং louse]—কেশকীট বিশেষ। বড় উকুন—ঢেলা, ঢোলা-ত্রি। ছোট উকুন বা উকুনের ডিম—লিক, নিক [হি. লীখ]।

উঙানি-রাঢ়—মশকজাতীয় অতি ক্ষুদ্র পোকা বিশেষ। উনিপোকা-ম. শ্রী, উনানি-নো। ইহার কামড়ে ভীষণ জ্বালা। কৃষকেরা শরীরে তেল মাখিয়া কিংবা বোলেন, উকা ইত্যাদি জ্বালাইয়া ইহাদের আক্রমণ রোধ করিতে চেষ্টা করে।

উচ্চিংড়া—পতঙ্গ বিশেষ, লাফাইয়া লাফাইয়া জিনিষপত্রের উপর পড়ে। তৎপর্যায় :—উইচিংড়া, কয়া-ঢা. ফ, তুরুলা-নো। **উৎরুঙ্গা**—ঘুর্ঘুরে দ্র।

উরস / উরাস / উরুস-পূব [হি খটমল, ইং bug]—ছারপোকা-ক, উলস / উলুস-ঢা. নো. ত্রি, উল্লুস-শ্রী; ভঁস / উরুস-মে।

উলি—উই দ্র। **এঁটুলি**—ওঁঠলি-বী, আঁটুলি-পূব, আটাইল-ম।

কারা, কেরা, কেওরা-ব—কেন্নো দ্র। **কিরা**-ম—কীট বিশেষ।

কুমীর [সং কুম্ভীর, হি মগর, ইং crocodile]—কুমইর, কুমুইর (কুমীরের আঞ্চলিক প্রতিরূপ)। সচরাচর দৃষ্ট কুমীরের মাথা টিকটিকির মাথার মত অনেকটা চেপটা। আর এক শ্রেণীর কুমীর আছে যাহার মুখ লম্বা, উহাকে 'ঘড়িয়াল' বলা হয়। কুমীর বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবতা কালুরায়ের বাহন। বাংলার স্থানে স্থানে মাটির মূর্তি গড়িয়া কুমীর পূজারও প্রচলন আছে।

কেঁচো [সং কিঞ্চুলুক, হি কেঁচুআ, earthworm]—লতার মত একপ্রকার ভূমিজ কীট, মহীলতা। কেইছা-টা, কেউচা-ঢা. ফ, কেউছ্যা-ব, কেউচ্যা-ত্রি, ক্যাছো-য, জির-ম, কেঁছ্যা-নো, চ্যারা-উব।

কেঠো-পব—কচ্ছপবিশেষ, কাঠো-য, কাঠুয়া / কাউঠা / কাঠ্যিয়া-পূব। কচ্ছপ—কাছিম, তুড়া / তুড্যা-রা. পা. রং, তুলি-চট্ট, জলখাসি (বক্রোক্তি)।

কেন্নো-চ. য. খু—বহুপদবিশিষ্ট কীট বিশেষ, স্পর্শ করা মাত্র বৃত্তাকারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তৎপর্যায়ঃ-কেন্না, কেন্নাই, কেন্নুই-হা. মে. হু. বর্ধ, কারা-ম, কেরা-ঢা. টা. ফ. ত্রি. নো, কেওরা-ব, কানকোটারি-বী।

খাতা—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ।

গরল-চ—এক রকম বিষাক্ত কীট, গর-ম।

গরল লাগা—গরল কীটের ছোঁয়াচ লাগিয়া শরীরে ঘা হওয়া।

গিরগিটি [হি গিরগিট, ইং chameleon]—টিকটিকি বা আঞ্জনি ধরনের লম্বা লেজওয়ালা জীব বিশেষ। তৎপর্যায়ঃ—বহুরূপী (বহুবার রং পালটায়), রক্তচোষা (অনেক সময় ইহাদের গলদেশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে), কাঁয়ালিশ-নো।

গুগ্‌লি—ছোট জাতের শামুক, গেঁড়ি-পব, গুজুরি-জ. কো।

গোসাপ—[yellow monitor] গোধা, গোধিকা, গুইসাপ-ঢা, গুইল-ম. ফ. বু. নো, গোহেড়কেল-দচ।

ঘুণ—কাষ্ঠকীট বিশেষ। ঘুণাক্ষরেও টের না পাওয়া—কোনও বিষয়ে আভাসমাত্রও না পাওয়া। ঘুণাক্ষর—ঘুণের আক্রমণে কাঠ বাঁশ ইত্যাদিতে যে দাগ হয়, তাহা অক্ষরের মত দেখায়।

ঘুরঘুরে-পব—পোকা বিশেষ, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটি খুঁড়ে। উৎরুঙ্গা-ম, উচুঙ্গা-ঢা. ফ. ব, ঘুংড়া পোকা। **চাটা, চাটুয়া / চাট্যিয়া**—এঁটুলি জাতীয় পোকা বিশেষ ; এইগুলি আঁশবিহীন মাছের গায়েই বেশী হয়।

চিতি-জ. কো—প্রজাপতি। চিতি-চ—সর্প বিশেষ।

চিনা জোঁক—জোঁক দ্র। **চেউটি, চাটি**-মে— পিঁপড়া বিশেষ।

চেলা-পূব—বিষমুখ বহুপদ কীট বিশেষ। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাঢ় এবং গাঙ্গেয় অঞ্চলে যাহাকে বিছা (সরস্বতী বিছা ও তেঁতুলে বিছা) বলে, পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে তাহা 'চেলা' বা 'সাপচেলা' নামে সুপরিচিত। চেলার অপর সাধারণ অর্থ—(১) শিষ্য, (২) মৎস্য বিশেষ, (৩) জ্বালানী ফাড়া কাঠ। (বিছা ও বিচ্ছু দ্র)।

ছারপোকা—(উরস দ্র)। **জির**—(কেঁচো দ্র)।

জোঁক—রক্তপায়ী কৃমি বিশেষ, leech. জোঁক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর : এক শ্রেণীর জোঁক জলে থাকে (জলৌকা); ইহাদের খুব বড়গুলিকে বলা

হয়—হাত্যা জোঁক (হাতিয়া), মইসা জোঁক। আর এক শ্রেণীর জোঁক ঘাসে জঙ্গলে স্থানে থাকে; ইহাদিগকে কোথাও ছিনা বা ছিনে জোঁক, কোথাও চিনা জোঁক বলে। হুঁকার জল, লবণ এবং চুন প্রয়োগে জোঁক মারা হয়। কথায় বলে,—জোঁকের মুখে চুন (বা নুন)।

জোনাকি—[হি জগন / জুগুনূ, ইং firefly] খদ্যোত, জুনি / জুনিপোক-পূব।

ঝিঁঝিপোকা [হি ঝীঙ্গুর, ইং cricket]—ঝিল্লী, ঝিঞ্জিপোক-পূব, ঘুগরো-দচ।

ঝিনুক—শুক্তি, oyster. ঝিনই / ঝিনুই-পুব। ঝিনুকাকার পাত্র।

টিকটিকি-ক—জ্যেষ্ঠি, lizard. হারুল-পূব, জেঠী-দচ। অনেক সময় গোয়েন্দা পুলিশকে বিদ্রূপ করিয়া টিকটিকি বলা হয়।

ডাঁশ / দাঁশ, ডাঁয়স-নো [সং দংশ, হি মচ্ছড়, ইং gnat]—বড় জাতের মাছি বিশেষ; ইহার দংশন অতি তীব্র।

ডেয়া, ডেয়ে / ডেয়ো-ক—বড় কালো পিঁপড়া। তৎপর্যায়ঃ—ডোঁয়া-নো, ডাই-জ. কো, মাদাইল, মান্দাইল, দুরুরা-ম, ওল্লা-ফ. ব। কাঠ পিপড়া—গাছে শুকনা ডালপালায় থাকে,—কামড়ে ভীষণ ব্যথা হয়; কাঠুলা নুটি-জ. কো, মাদার লুড়ি-নো।

ঢেলা—উকুন দ্র। **তেলচোরা**—আরসুলা দ্র।

ফাৎরা-ম—ধানের অনিষ্টকারী পতঙ্গ বিশেষ।

বাজনা—মাছির ডিম, মাছতা, চাট-ঢা. ক. ব।

বিচ্ছু-পূব [সং বৃশ্চিক, হি বিচ্ছূ, ইং scorpion]—কাঁকড়া বিছা-পব।

বিছা-পব. রাঢ়—বিষমুখ বহুপদ কীট বিশেষ। বিছা নানা প্রকারেরঃ কাঁকড়া বিছা (কাঁকড়ার পায়ের মত দুইটি বড় পা থাকে), তেঁতুলে বিছা (যেন একসূত্রে গাঁথা কতকগুলি তেঁতুলের বীচি) এবং সরস্বতী বিছা (সাধারণ ছোট জাতের বিছা, বিদ্যাদেবীর নামের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ছেলেরা ইহা মারিতে চায় না)। রাঢ় ও পশ্চিম বঙ্গের কাঁকড়া বিছাকে পূর্ববঙ্গে বিচ্ছু এবং তেঁতুলে ও সরস্বতী বিছাকে চেলা / সাপচেলা বলিয়া থাকে। হিন্দী ভাষাভাষীদের মধ্যেও 'বিচ্ছূ' শব্দটি বৃশ্চিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে উহা চিয়াড়ী (scorpion)।

বিছা-পূব—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে যাহাকে 'বিছা' বলা হয়, তাহা রাঢ় ও পশ্চিম বঙ্গের 'শুঁয়াপোকা / শুঁয়োপোকা', ত্রিপুরার 'ছেঙ্গা' এবং রাজসাহী ও পাবনার 'আঁচা'। দেখা যাইতেছে, বাংলার কোনও অঞ্চলের

বিছায় কামড়ায়, ব্যথায় শরীর অবসন্ন হয়; আবার কোনও অঞ্চলের বিছায় কামড়ায় না, উহার ছোঁয়াচ লাগিলে গা জ্বালা করে।

বোলতা-ক—বোল্লা-দচ, বলা / বল্লা-পূব, wasp.

মান্দাইল—বড় জাতের কালো পিঁপড়া।

মান্দারুয়া—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ।

রুই পোকা—উই পোকা, ant. **লিক**—উকুন বিশেষ।

লোহাগেড়ে-মে—ধানের অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ।

শাঁকি-চ—ধানের পোকা।

শুঁয়াপোকা-ক—অসংখ্য শুঁয়াযুক্ত কীট বিশেষ, (বিছা দ্র)।

সাপ—সর্প, নাগ। রাত্রিতে অনেকে 'সাপ' শব্দ মুখে আনে না, বলে 'লতা'। সাপের নাম ও জাতের শেষ নাই। মনসামঙ্গল কাব্যগুলি হইতে আমরা অনেক সাপের নাম জানিতে পারি। কেউটিয়া / কেউটে, গোক্ষুরা, চন্দ্রবোড়া, ঢোঁড়া, জল-ঢোঁড়া, চিতি, দাঁড়াস বাংলার প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোক্ষুরাকে পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও 'জাতি সাপ' বলা হয়। কালো রঙের এক শ্রেণীর বিষধর সর্পকে ময়মনসিংহে 'মাছুয়া সাপ' বলে। মেদিনীপুরের গোঁমুড়া এবং শিয়ালচাঁদী সাপ দুইটি অন্যত্র বড় দেখা যায় না।

সাপকে দুধকলা দেওয়া—বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে জীবিত সর্পের পূজা প্রচলিত না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ তিথিতে এবং মনসা পূজার দিনে সাপের উদ্দেশে দুধকলার নৈবেদ্য দিবার রীতি আছে। বাস্তুসাপ (বহুকাল ধরিয়া বাস্তুভিটায় অবস্থানকারী বৃহদাকার সর্প বিশেষ) অনেকেই মারে না, বরং উহাকে বাড়ীর রক্ষক বলিয়াই মনে করে। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিভিন্ন প্রতীকে,—সর্পফণায়, ঘটে, পটে, মূর্তিতে, মাটির ঢিবিতে, পাথরে, গাছে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। মহাসমারোহে বাৎসরিক পূজা ছাড়াও বহুগ্রামে, বহু পরিবারে সর্পদেবতার নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

হিমড়া-নো—পিঁপড়ার উচ্চারণ ভেদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আচার-অনুষ্ঠান

১ বিবাহে লোকাচার

অধিবাস—বিবাহ, উপনয়ন, যাগ, পূজা ইত্যাদির পূর্বে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা করণীয় সংস্কার বিশেষ। বৈবাহিক অধিবাস সাধারণতঃ বিবাহের পূর্বদিন হয়; বিশেষক্ষেত্রে কার্যদিনেও হইতে দেখা যায়। এই উপলক্ষে একটি বরণডালা (কুলা) ধান্য, দূর্বা, মহী, চন্দন, হরিদ্রা, ফল, পুষ্প, ঘৃত, দধি, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ, চামর, গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যে সাজানো হয় এবং পৃথক একটি থালায় আতপ চাউল ও মাষকলাই বাটিয়া 'শ্রী' বা 'ছিরি' নামক একটি দ্রব্যও তৈয়ার করিয়া রাখা হয়। যথাসময় পুরোহিত আসিয়া বরের বাড়ীতে বরকে ও কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে চন্দনের টিপ পরাইয়া দেন এবং অধিবাস-দ্রব্যগুলি একটি একটি করিয়া বর-কন্যার কপালে ছোঁয়ান; সমস্ত ছোঁয়াইয়া বরণডালাটা এবং 'শ্রী'র থালাটাও একবার তাহাদের মাথায় তুলিয়া ধরেন। অতঃপর একগোছা দূর্বা তৈল-হরিদ্রাসিক্ত নূতন কার্পাস সূত্রে বরের দক্ষিণ ও কন্যার বাম মণিবন্ধে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে 'মঙ্গলসূত্র' বা 'কঙ্কণ' বলে।

অষ্টমঙ্গল, অষ্টমঙ্গলা—বিবাহের অষ্টমদিনে কন্যার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত একটি লোকাচার বিশেষ। সেদিন এয়োস্ত্রীরা দুধ ও আলতা গোলা থালায় বর-কন্যার হাত রাখিয়া 'মঙ্গলসূত্র' খুলিয়া দেন, গ্রন্থিবন্ধনও (গাঁটছড়া) সঙ্গে সঙ্গেই খোলা হয়। কোথাও দশমদিনে এই আচার পালিত হয় এবং তদঞ্চলে ইহাকে **'দশমঙ্গল'** বলে। এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করিবার অবকাশ না থাকিলে বিবাহের চতুর্থদিনেও মঙ্গলসূত্র এবং গ্রন্থিবন্ধন খুলিবার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। চতুর্থদিনের অনুষ্ঠান **'চতুর্থমঙ্গল'** নামে অভিহিত হয়।

বিবাহের অষ্টম, অঞ্চলভেদে দশম দিন পর্যন্ত সময়কে মঙ্গলজনক মনে করা হয়। এজন্য জ্যোতিষের মতে শীঘ্র দ্বিরাগমনের কোনও শুভদিন না থাকিলে ঐ সময়ের মধ্যেই কন্যা স্বামীর সহিত পিত্রালয়ে আসিয়া আবার (দ্বিতীয়বার) জোড়ে স্বামী-গৃহে চলিয়া যায় (ধুলাপায়ে গমন দ্র)।

আইবড় পথ ভাঁড়ানো-পব—গ্রামের যে পথ দিয়া বিবাহ করিতে যাওয়া, বিবাহ করিয়া অন্যপথে ফিরিয়া আসা। ভাঁড়ানো—ঠকানো।

আইবড় ভাত, আইবুড় ভাত—গায়েহলুদের পর পিতৃগৃহে কন্যার বিবিধ উপকরণ ও পিষ্টকাদিসহ অন্নগ্রহণরূপ সংস্কার বিশেষ। বাংলার সর্বত্র সকল সমাজে ইহার রেওয়াজ নাই। কোথাও কোথাও আবার পাত্র-পাত্রী দুইজনকেই 'আইবুড় ভাত' খাওয়ানো হয়।

আগোদ-পড়ান-মুস—বিবাহের শপথ-বাক্য (মন্ত্র ?) পাঠ করানো।

আভ্যুদয়িক—বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে অভ্যুদয় অর্থাৎ সমৃদ্ধির জন্য পিতৃপুরুষের উদ্দেশে যে-শ্রাদ্ধকার্যাদি করা হয়, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। তৎপর্যায় :— বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ। আব্যদিক—আভ্যুদয়িক-এর প্রাদেশিক রূপভেদ।

আশীর্বাদ—সাধারণ অর্থ গুরুজন কর্তৃক মঙ্গলপ্রার্থনা। বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইলে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে বা কন্যাপক্ষ হইতে বরকে 'আশীর্বাদ' করা হয়। সাধারণতঃ বরপক্ষের আশীর্বাদে বরের কোনও গুরুজন পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া কন্যার বাড়ী যান। প্রথমে পুরোহিত স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া কন্যার মস্তকে ধান্য-দূর্বা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দেন; পরে বরপক্ষীয় ব্যক্তি কোনও স্বর্ণালঙ্কার (বা টাকা-গিনি) দিয়া কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। পশ্চিমবঙ্গে শুধু বরপক্ষ হইতে কন্যাকে নয়, কন্যাপক্ষ হইতেও বরকে কোনও সোনার জিনিষ দিয়া আশীর্বাদ করা হয় (পাকা-দেখা দ্র)।

উকীল-মুস—মুসলমানি বিবাহে 'কনে' রাজি বলিয়া যিনি কন্যাপক্ষ সমর্থন করেন। আইন-ব্যবসায়ী।

উঠে আসা-মুস—কন্যাকে উঠাইয়া আনিয়া বরের বাড়ীতে বিবাহের প্রথা। চোড়ে যাওয়া—কন্যার বাড়ীতে যাইয়া বিবাহের প্রথা। হিন্দুসমাজে দ্বিতীয় প্রথাটিকে 'বরাহ্বানে বিবাহ' বলা হয়।

কড়িখেলা—বাসরঘরে বর-বধূর একপ্রকার আনন্দঘন খেলা বা খেলার প্রহসন (farce)। হলুদমাখা চাল এবং ২১টি কড়িসহ একটি সুচিত্রিত হাঁড়ি সরা দিয়া ঢাকিয়া বর-বধূর সামনে রাখা হয়। ঢাকনিটি উঠাইয়া একবার বর সেগুলি ছড়াইয়া ফেলে, বধূ কুড়াইয়া রাখে; আবার বধূ ছড়াইয়া দেয়, বর কুড়াইয়া তোলে। এইরূপ তিনবার কি সাতবার করিবার পর রায় দেওয়া হয়—'বধূর জিত, বরের হার।' রায় দেয় বধূর বান্ধবীরাই, তাহাদেরই সেখানে পূর্ণ আধিপত্য। এই খেলায় অঞ্চলভেদে আচার-নিয়মের পার্থক্য থাকিলেও রায়

সর্বত্রই বধূর অনুকূলে যায়। খেলার শেষে পরাজিত বরের দক্ষিণ হস্ত একটি নোড়ায় চাপিয়া ধরা হয় এবং বধূর জন্য কোনও যৌতুকের প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয় না। কড়িখেলা পর্যায়ের অপর খেলা:— যৌতুকখেলা, ভাঁড়কুলো খেলা, পাশাখেলা।

কনকাঞ্জলি—বিবাহে যাত্রা করিবার পূর্বে পুত্র কর্তৃক মাতাকে সতণ্ডুল স্বর্ণ কি রৌপ্যমুদ্রা দানের আঞ্চলিক প্রথা; মা এই দান আঁচল পাতিয়া গ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গে সমাজভেদে বরবরণের সময় বর শাশুড়ীর আঁচলে এক মুষ্টি পানসুপারি ও একটি টাকা ফেলিয়া দেয়,—ইহারও স্থানীয় নাম কনকাঞ্জলি। বিসর্জনের পূর্বে প্রতিমার (বিশেষ করিয়া দুর্গাপ্রতিমার) চরণেও গৃহস্থ স্বর্ণ ছোঁয়াইয়া কনকাঞ্জলি দানের প্রথা পালন করে। মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে মঙ্গলসূচক কৃত্য হিসাবে কনকাঞ্জলি দানের অনেক উল্লেখ আছে।

কন্যাকর্তা—কন্যাসম্প্রদাতা, কন্যা-সম্প্রদানে অধিকারী ব্যক্তি। অনেক সমাজে কন্যার বিবাহে মামাকেই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদানকর্তা বলিয়া মনে করা হয়।

কন্যাতি, কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী—বিবাহে কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ। বিবাহের সময় যাহারা কন্যার সঙ্গে বরের গৃহে যায় (কোনো কোনো সমাজে বর কন্যাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ করে। বর্তমানে উচ্চকোটি সমাজে এই প্রথা কদাচিৎ দেখা যায়; নিম্নকোটি সমাজেও ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে)।

করমী—ঘটক ('মাঘ মাসে করমী আইল হীরাধরের বাড়ী'—মৈগী)।

কলাতল, কলাতলা—চারটি কলাগাছ বেষ্টিত সমচতুর্ভুজাকার স্থান। এই স্থানের মধ্যে একটি শিল পাতা থাকে এবং তাহার উপরে বসিয়া বর বা কন্যা বিবাহকালীন স্নান করে। এই স্নানকে বলা হয়—'কলাতলায় স্নান'। আবার কোথাও (ম. শ্রী. ত্রি) কলাতল—বিবাহ-স্থান, যেস্থানে সম্প্রদানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ গাঙ্গেয় অঞ্চলের 'ছাঁদনাতলা'। কিন্তু কোথাও কোথাও ছাঁদনাতলায় কলাগাছ পোঁতা হয় না, সেখানে সুরম্য চাঁদোয়া বা শামিয়ানা টানাইয়া বিবাহ হয়। ঢাকা অঞ্চলেও মূল বিবাহ কলাতলায় হয় না, কিন্তু বাসি বিবাহ রীতিমত কলাগাছ পুঁতিয়া, পুকুর খুঁড়িয়া, তাহার চারিদিকে সাতপাক ঘুরিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই 'কলাতলে'র অর্থ সমাজ ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন।

কাজায়ী ঘুস—বরপক্ষের নিকট হইতে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা তাহাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদির (স্কুল, মসজিদ) জন্য যাহা আদায় করে।

কালরাত্রি—বাংলার বহু অঞ্চলেই বিবাহের দ্বিতীয় দিনের রাত্রিকে 'কালরাত্রি'

বলা হয়। আবার সমাজভেদে বাসি-বিবাহের পরদিনের রাত্রিকে, অর্থাৎ বিবাহের তৃতীয় রাত্রিকে 'কালরাত্রি' ধরা হয়। মনসামঙ্গলে কালরাত্রি বলা হইয়াছে বিবাহের প্রথম রাত্রিকে,—যে-রাত্রিতে সর্পদংশনে লখাইর মৃত্যু ঘটিয়াছিল। লোকমতে কালরাত্রিতে বর-কন্যার সাক্ষাৎকার নিষিদ্ধ।

কালরাত্রি—ভয়ঙ্কর রাত্রি, যে রাত্রিতে মৃত্যু বা তদ্রূপ কোনও বিপদ ঘটে, ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে। জ্যোতিষে কালরাত্রি বলা হয়—শুভকার্যের অযোগ্য রাত্রির বিশেষ বিশেষ যামার্দ্ধকে।

কুঞ্জ-শ্রী—শ্রীহট্টে বিবাহ-স্থানকে বলা হয় 'কুঞ্জ'। সেই স্থানটি বহু কলাগাছ পুঁতিয়া রীতিমত একটি কদলীকুঞ্জই করা হয়। তদঞ্চলে বাঁশের কঞ্চি পোঁতার প্রথাও আছে। কুঞ্জ—কুঞ্জবন। বৈষ্ণবদের আখড়া।

কুশণ্ডিকা—বিবাহের রাত্রে বা পরদিবসে অনুষ্ঠেয় হোমাদি সংস্কার বিশেষ।

খোত্‌বা-মুস—বিবাহ পড়ানোর (আগোদ পড়ান দ্র) পর কোরান হইতে কিছু পাঠ।

গওয়া-মুস—বিবাহের সাক্ষী, যে-বরের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি আছে—এই বিষয়ের সাক্ষী।

গন্ধতৈল—বিবাহকালীন স্নানে, বিশেষ করিয়া অধিবাসে ও গায়েহলুদে বর-কন্যার ব্যবহারের জন্য মেথি ইত্যাদি মশলা সহযোগে সুভগা নারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে যে সুগন্ধি তৈল পাক করেন। সমাজভেদে বরের বাড়ীর বরস্পৃষ্ট গন্ধতৈল কন্যার বাড়ীতে পাঠাইতে হয় এবং কন্যাকে নাওয়াইবার কালে উহা তাহার গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয়।

গাওকুশী-মুস—বিবাহের পূর্বদিনের ভোজ।

গাঁটছড়া—সম্প্রদানের পর বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন। হলুদ-ছোপানো নূতন গামছায় হরিতকী, আমলকী ইত্যাদি পাঁচটি ফলের একটি পুঁটুলি করিয়া উহার একপ্রান্ত বরের এবং অপর প্রান্ত কন্যার বস্ত্রের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবন্ধন, চলতি কথায় 'গাঁটছড়া'।

গায়েহলুদ, গায়হলুদ—গাত্র-হরিদ্রা, বিবাহের একটি প্রধান স্ত্রী-আচার। বাংলা দেশে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, চূড়াকরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও ছেলেদের হলুদ মাখাইয়া স্নান করানো হয়। বৈবাহিক গাত্রহরিদ্রা সর্বত্র সর্বসমাজে একই দিনে একই নিয়মে সম্পন্ন হয় না। পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-দিনে অথবা দুই একদিন পূর্বে কোন শুভ সময়ে বর-কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে।

এয়োস্ত্রীরা বর কি কন্যাকে নূতন কাপড় পরাইয়া, আলপনাযুক্ত পিঁড়িতে বসাইয়া হলুদবাটা ও গন্ধতেল মাখাইয়া স্নান করান। এই উপলক্ষে বরের বাড়ী হইতে গায়ে হলুদের তত্ত্ব—বস্ত্রালঙ্কার, মাছ, দধি, সন্দেশ ইত্যাদি পাঠানো হয়। কোনও সমাজে আবার বরের গায়েহলুদ না হওয়া পর্যন্ত কন্যার গায়েহলুদ হইবার প্রথা নাই। বরের বাড়ী হইতে বরের ব্যবহৃত হলুদের অবশিষ্টাংশ কন্যার বাড়ীতে পাঠানো হয়। পূর্ববঙ্গে 'গায়েহলুদ' কথাটি খুব প্রচলিত নহে। সেখানে বিশেষ ঘটা করিয়া 'হলুদ কোটা' করা হয় এবং অধিবাসের দিন বা বিবাহের দিন বর ও কন্যাকে হলুদ ও গিলা বাটা মাখাইয়া এয়োদের আনীত জলে নাওয়ানো হয়।

গৌরবচন—মুখচন্দ্রিকার সময়, কিংবা অঞ্চলভেদে তাহার অব্যবহিত পরে, অথবা সম্প্রদানকালে বরকে যখন মধুপর্ক দেওয়া হয় বা মন্ত্রে যখন গোরুর উল্লেখ করা হয়, তখন নাপিত 'গৌর গৌর' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে নানারূপ ছড়া কাটে। এইসকল ছড়া 'গৌরবচন' নামে অভিহিত হইলেও গোঃ-এর সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

গ্রন্থিবন্ধন—বিবাহকালে বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কন্যার বস্ত্রাঞ্চলের বন্ধনরূপ স্ত্রী-আচার। (গাঁটছড়া দ্র)।

গ্রন্থিমোচন—গাঁটছড়া খোলা,—যাহা সাধারণতঃ বিবাহের চতুর্থ, অষ্টম বা দশম দিনে কন্যার পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামদর্শনী-প্রব—সেকালে বিবাহ উপলক্ষে কুলীনরা 'বাঙ্গাল' গ্রামে (অকুলীনদের গ্রামে) প্রবেশ করিলে তাহাদিগকে দর্শনী (টাকা) দিতে হইত। তাহারা ঠাকুর চাকর নিয়া যাইত, সিধা পাইত, নূতন চুলা খোদাইয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করিত। চুলা খোদানোর জন্যও তাহারা টাকা পাইত, উহা **'চুলাখোদানি'** নামে কথিত হইত।

ঘটক—বিবাহ ব্যাপারে যিনি পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের যোগ ঘটান, যিনি বিবাহের সম্বন্ধ আনেন। তৎপর্যায়ঃ—কেরেয়া-জ. কো, কর্মী-ম। ঘটকালি—ঘটকের কাজ ; বিবাহের সম্বন্ধ আনা, দুই পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো ইত্যাদি। কোনো কোনো অঞ্চলে 'ঘটকতালি' কথাটিও শুনা যায়।

ঘরবর চাওয়া—বিবাহের কথাবার্তা পাকা করিবার পূর্বে কন্যাকর্তা বা তৎপক্ষীয় লোকের সাক্ষাৎভাবে বর ও বরগৃহের অবস্থা দেখা ('বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা। ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা।'—মৈগী)।

চোরপানি, চোরপানি ভরা—বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে পূর্বময়মনসিংহ, ত্রিপুরা,

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে কন্যার বাড়ীতে 'চোরপানি ভরা' নামক এক স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয় ('চোরপানি ভইরা আইসা দধিচিড়া খাও'-ম)। ভোর না হইতে কন্যার মাতা ও পিতা একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া এয়োদের লইয়া কোনও জলাশয়ে জল ভরিতে যান। পিতার হস্তে থাকে খাঁড়া বা অন্য কোনও লৌহাস্ত্র এবং মাতার কক্ষে থাকে কলসী। কন্যার মাতা কি পিতা জীবিত না থাকিলে অপর কোনও স্বামী-স্ত্রী দ্বারা এই কাজ হইতে পারে। জলে নামিয়া স্বামী খাঁড়া দিয়া যোগচিহ্নের আকারে দুইবার জল কাটিয়া দেন, স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে তাঁহার কলসী ভরিয়া লন। বাড়ীতে আসিয়া কলসীতে পাঁচটি ফল ও এক ছড়া মালা রাখিয়া নূতন কাপড়ে উহার মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কলসীটি যে ঘরে থাকে, রাত্রিতে বরকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া নানা রকম কৌতুকাবহ স্ত্রী-আচার পালন করা হয় ('বিবাহে লোকাচার ও মেয়েলী সঙ্গীত', মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৯ দ্র)। তৎপর্যায় :—'নিদ্রাকলসে জলভরা'-ঢা।

ছাঁদনাতলা (ছাঁদলাতলা, ছানলাতলা, ছাঁল্লাতলা, ছাননাতলা)-পব. রাঢ়—ছায়ামণ্ডপ, বিবাহ-স্থান। তৎপর্যায় :– বিবাহ-বাসর-পূব, মাড়োয়ারতল-কো. জ. গো. কা, কলাতল-ম. ত্রি, কুঞ্জ--শ্রী। গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ অঞ্চলে ছায়নারতল/ছায়নরতল এবং আসামের অপর কোথাও কোথাও রভাতল (রস্তা) কথাগুলিও শুনা যায়। বাংলার বহু অঞ্চলেই বাড়ীর আঙ্গিনায় চাঁদোয়া খাটাইয়া তাহার নীচে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করা হয়। আবার কোথাও কোথাও চাঁদোয়া না টানাইয়া উন্মুক্ত আকাশতলে অন্যূন চারটি কলাগাছ পুঁতিয়া তাহার বেষ্টনীর মধ্যে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ('কলাতল' দ্র)।

জলভরা-পূব—বিবাহ-দিনে বর-কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য এয়োস্ত্রীরা বিশেষ ঘটা করিয়া নদী বা পুকুর হইতে জল ভরিয়া আনেন। একসময়ে 'জলভরা'র গীতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিত, বর্তমানে শুধু শঙ্খধ্বনি ও উলূধ্বনি শুনা যায়। 'জলভরা' একটি আনন্দঘন স্ত্রী-আচার।

জলসহা, জলসাওয়া, জলসাধা—বর-কন্যাকে স্নান করাইবার জন্য দেব-মন্দির এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাড়াপড়শীর বাড়ী হইতে সোহাগ জল প্রার্থনা করিয়া আনিবার প্রথাবিশেষ। এয়োরা 'জলসহা'র জল লইতে প্রথমেই দেবমন্দিরে যান এবং সেখান হইতে জল লইয়া কোনও প্রতিবেশীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। গৃহকর্ত্রী তখন তাঁহাদের ঘটগুলিতে অল্প অল্প জল ঢালিয়া দেন ; এয়োরা তাঁহাকে পানসুপারি ও মিষ্টি দিয়া অন্য বাড়ীতে যান। এইরূপে বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া ঘটগুলি

পূর্ণ করিয়া তাঁহারা বিবাহ-বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। এই শুভেচ্ছাপূত জলে বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্যার বাড়ীতে কন্যাকে কলাতলে শিলের উপর বসাইয়া স্নান করানো হয়।

জুলুয়া-মুস—শুভদৃষ্টি, বরকন্যার পরস্পরকে প্রথম দর্শন।

জোড়ভাঙ্গা—বিবাহের পর পতিসহ কন্যার পিত্রালয়ে গমন এবং সেখানে গিয়া গাঁটছড়া ও হাতের সুতা (মঙ্গলসূত্র) খুলিবার প্রথা (অষ্টমঙ্গলা দ্র)।

জোড়ে যাওয়া—বিবাহের পর বরের সহিত কন্যার একত্রে পিত্রালয়ে গমন।

তত্ত্ব—বাংলায় তত্ত্ব বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় উপঢৌকন ; বিবাহের বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান এবং পূজাপার্বণ উপলক্ষে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে কিংবা কন্যার বাড়ী হইতে বরের বাড়ীতে বস্ত্রালঙ্কার, ফলফুল, দধিসন্দেশ, মৎস্য ইত্যাদি যেসব দ্রব্য পাঠানো হয় (অধিবাসের তত্ত্ব, গায়ে হলুদের তত্ত্ব, ফুলশয্যার তত্ত্ব, পূজার তত্ত্ব)।

তৈল কাপড়—পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বিবাহের পূর্বদিন বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে অধিবাসের তত্ত্ব পাঠানো হয় ; পূর্ব ময়মনসিংহে ইহাকে 'তৈল কাপড়' বা 'তেলকাপড়' এবং কামরূপে 'তেলের ভার' (তেলের ভাঁড়) বলিতে শুনা যায় (দেইখা ভুলে ঝিয়ারী বহুরী। তৈলকাপড় আইসাছে ঋষির বাড়ী)। তৈল-কাপড়ের দ্রব্যাদির মধ্যে বর-স্পৃষ্ট গন্ধতৈল অবশ্যই পাঠাইতে হয়।

দধিমঙ্গল—বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে কন্যার মাতা এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া দধি-চিড়া খান এবং কন্যার কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেন। কোথাও ফোঁটার পরিবর্তে দধি-চন্দন মিশ্রিত জল একটি পান দিয়া কন্যার শরীরে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও শুধু কন্যার বাড়ীতেই নয়, বরের বাড়ীতেও একই সময়ে বরকে লইয়া দধি-চিড়া খাইবার এবং বরের কপালে দধি-চন্দনের ফোঁটা দিবার প্রথা আছে। বহু অঞ্চলে বহু সমাজে কন্যাগৃহে যাত্রা করিবার সময়ও বরের কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। শ্রীহট্টে বর যখন (বিবাহের প্রাক্কালে) 'কুঞ্জে' গিয়া দাঁড়ায় তখন কন্যার মা একটি পর্দার আড়ালে থাকিয়া পিছন হইতে তাহার হাত দুইটি দধি দ্বারা ধুইয়া দেন। বিভিন্ন অঞ্চলের এই সকল মঙ্গল-আচার প্রত্যেকটি 'দধিমঙ্গল' নামে অভিহিত হয়। যাত্রাদি শুভকর্মে দধি ভক্ষণ, স্পর্শন বা দর্শনকেও 'দধিমঙ্গল' বলিতে শুনা যায়।

দরগুয়া—বিবাহের পাকা কথাকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা 'দরগুয়া' বলে। তাহারা গুয়া কাটিয়া বিশেষ এক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রস্তাবিত বিবাহের শুভাশুভ

নির্ণয় করে ('গুয়া পান কাটিয়া শুভাশুভ বুঝিল। বিবাহের দিন তখনই করিল' —মারাগা)। 'দরগুয়া হওয়া'র মূল অর্থ হইতেছে—গুয়া (সুপারি) দৃঢ় হওয়া (দর = দড় = দৃঢ়)।

দেনমোহর-মুস—বিবাহকালে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীকে দেয় যৌতুক (যৌতুকস্বরূপ অর্থ)।

দ্বিরাগমন—বিবাহের পর নববধূর দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন। নাইহর, নাইয়র—পতিগৃহ হইতে বধূর পিত্রালয়ে বা আত্মীয়ের বাড়ী গমন।

ধুতুরাকাটাইল-শ্রী—শ্রীহট্টে বিবাহ-দিবসে আনুষ্ঠানিক স্নানের পর বর ও কন্যার হাতে ধুতুরাকাটাইল দেওয়া হয়। ইহা কলার মাজ, ধুতুরা, লোহার পেরেক ইত্যাদি সাতটি দ্রব্যের একটি গুচ্ছ। তদঞ্চলে কাটারিকে কাটাইল বলে; হয়ত এককালে দ্রব্যসমষ্টির মধ্যে ধুতুরা এবং কাটাইল-এর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। 'কুঞ্জে' মালা বদলের সময় বর-কন্যা ধুতুরা-কাটাইলও বদল করে।

পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে বর-কন্যাকে **মাজদর্পণ** (কলার মাজ পাতা এবং পিতলের বা লোহার দর্পণাকার দ্রব্য বিশেষ) এবং পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বরকে রূপার জাঁতি ও কন্যাকে কাজললতা ধারণ করিতে দেখা যায়। বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইগুলি হাতে বা সঙ্গে রাখিতে হয়। ধুতুরা-কাটাইল-এর ন্যায় মাজ-দর্পণও বর-কন্যা বিবাহ-বাসরে বদল করিয়া লয়।

ধুতুরা পিদ্দিম—বরবরণের সময় ধুতুরার খোলায় সরিষার তেলের যে প্রদীপ জ্বালানো হয়।

ধূলপায়ে গমন—বিবাহের আটদিনের মধ্যে পতিসহ কন্যার পিত্রালয়ে গমন এবং সন্তাই বা তিনরাত্র বাস করিবার পূর্বেই পতিগৃহে প্রত্যাগমন। লোকমত এই যে, বিবাহের আটদিন (কাহারো মতে দশ দিন) বর-কন্যার পক্ষে সর্বকার্যে শুভ সময়। তাই অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে দ্বিরাগমনের শুভদিনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া 'ধূলা-পায়ে গমন' স্ত্রী-আচার পালন করে।

নান্দীমুখ—বিবাহাদি শুভকার্যের পূর্বে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়াকে অভ্যুদয় বা কল্যাণের হেতু মনে করা হয় বলিয়া উহাকে নান্দীমুখ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বলা হয়। ইহার অপর নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

নিছনিডালা—বরণডালা, যে ডালায় বরকে নির্মঞ্ছন অর্থাৎ তাহার অঙ্গ মুছিয়া যাবতীয় বালাই দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সাজানো থাকে।

নিদ্রাকলস, নিদ্রাকলসে জলভরা—বিবাহের দিন অতি প্রত্যূষে কন্যার মাতা ও পিতা কর্তৃক একসঙ্গে বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া জল ভরিবার অনুষ্ঠান। তৎপর্যায় :—চোরপানি ভরা। 'নিদ্রাকলসে জলভরা' এবং 'চোরপানি ভরা' অনুষ্ঠান বিভিন্ন অঞ্চলের হইলেও এবং ইহাদের নামে পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলতঃ এক এবং প্রায় একই পদ্ধতিতে উদযাপিত হয়। হয়ত সকলের নিদ্রিত থাকা অবস্থায় জলভরা হয় বলিয়া আধারটির নাম 'নিদ্রাকলস' হইয়াছে। আবার চোরের মত চুপি চুপি জল ভরিয়া আনা হয় বলিয়া অঞ্চলভেদে ঐ একই অনুষ্ঠানের 'চোরপানি' নামকরণ হইয়া থাকিবে। ('চোরপানি' দ্র)।

নিমন্ত্রণ—ভোজন বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। বৈবাহিক নিমন্ত্রণে স্থান ও সমাজভেদে নানারূপ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অনেক সমাজে পাকস্পর্শ বা বৌভাতের নিমন্ত্রণ সাধারণতঃ পান দিয়া করা হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যদি পান গ্রহণ করেন, তবেই তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন; আর যদি পান প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করিলেন, বুঝা গেল। আসামেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও বিবাহ-ভোজে স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ স্ত্রীলোক দ্বারা করাইতে হয়, নতুবা মহিলারা যোগদান করেন না। প্রথমেই প্রজাপতিকে নমস্কার করিয়া (শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ) বিবাহের নিমন্ত্রণ চিঠি আরম্ভ করা হয় এবং প্রায়ই উহা লাল কালিতে কিংবা কালো রং ছাড়া অন্য কালিতে লেখা হয়। শুধু বিবাহের নয়, সামাজিক অন্যসব নিমন্ত্রণ চিঠিতেও 'পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা করিবেন'—এইরূপ একটি কথা লেখা থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, এককালে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিমন্ত্রণ করাই শিষ্ট রীতি ছিল।

পত্রকরণ, পয়নামাপত্র—(আশীর্বাদ ও পাকাদেখা দ্র)।

পাকস্পর্শ—পতিগৃহে নববধূর প্রথম পাক (রন্ধন) স্পর্শ এবং স্পৃষ্ট অন্ন বর ও জ্ঞাতি-কুটুম্বকে পরিবেশন রূপ শুভ আচার (বউভাত দ্র)।

পাকা দেখা—বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইলে পাত্র-পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া আশীর্বাদ এবং বিবাহের তারিখ লগ্ন ইত্যাদি স্থিরকরা রূপ মাঙ্গলিক আচার বিশেষ। স্থান এবং সমাজ ভেদে 'পাকাদেখা' অনুষ্ঠান 'আশীর্বাদ', 'মঙ্গলাচরণ', 'লগ্নপত্র', 'পয়নামা পত্র', 'পত্রকরণ', 'পাটিপত্র', 'পানচিনি', 'কন্যা-জোড়া' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হয়। সাধারণতঃ কন্যাকে আশীর্বাদের (আশীর্বাদ দ্র) পর পুরোহিত একখণ্ড কাগজে লালকালিতে বর-কন্যার নাম, বিবাহের দিন, লগ্ন ইত্যাদি

লেখেন এবং বরপক্ষীয় ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিয়া কন্যার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে অর্পণ করেন।

পাটিপত্র-ঢা—বিবাহের প্রস্তাব পাকাকরণ রূপ অনুষ্ঠান বিশেষ। এই অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের স্বাক্ষরিত দুই খণ্ড কাগজে পাত্র-পাত্রীর শুধু নামধাম এবং বিবাহের লগ্ন তারিখই লেখা থাকে না, কোন্ পক্ষ প্রধান কি কি অলঙ্কার ও দানসামগ্রী দিবেন, তাহারও উল্লেখ থাকে।

সাধারণ পল্লীসমাজে এইরূপ লেখালেখির প্রথা তত নাই, উচ্চকোটি সমাজেও ইহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে।

পানখিল—ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে আশীর্বাদ বা লগ্নপত্রের কয়েকদিন পর প্রথমে বরের বাড়ীতে এবং পরে কন্যার বাড়ীতে সমাজের এয়োগণ একত্র হইয়া 'পানখিল', 'পানখিলি' বা 'পানভাঙ্গানি' নামে এক আচার পালন করেন।

এয়োগণকে পূর্বেই যথারীতি নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা আসিয়া কেহ আলপনা দেন, কেহ মঙ্গলঘট বসান, কেহ বা ধূপ-দীপ জ্বালেন। তারপর সকলে বসিয়া এক একটি গোটা পান হাতে লন এবং উহাতে খিলি দেন (পানটি ভাঁজ করিয়া খড়িকা দিয়া গাঁথিয়া রাখেন)। সঙ্গে সঙ্গে গীত, জোকার, আমোদ-আহ্লাদ চলিতে থাকে। গৃহকর্ত্রী সকলকে পান-সুপারি ও মিষ্টি দিয়া আপ্যায়িত করেন। বলিতে কি, তদঞ্চলে 'পানখিল' হইতেই বিবাহোৎসব আরম্ভ হয়।

পানচিনি-ম—বৈবাহিক মঙ্গলাচরণ, পাকাদেখা। কথাটি পল্লীর নিম্নকোটি সমাজেই অধিক শুনা যায়। এক সময়ে কন্যার আশীর্বাদ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে বরপক্ষপ্রদত্ত পান-সুপারি ও চিনি-বাতাসা বিতরণ করা হইত। বর্তমানে এই প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

পান দেওয়া, পান লওয়া—স্থান ও অনুষ্ঠান বিশেষে কথা দুইটির অর্থ দাঁড়ায় যথাক্রমে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা (নিমন্ত্রণ দ্র)।

পাশাখেলা—বিবাহের পর কোনো কোনো সমাজে বর-কন্যার মধ্যে বাসরঘরে যে কড়িখেলা হয়, তাহাকে 'পাশাখেলা' বলিতেও শুনা যায়—যদিও এই খেলায় ছক ঘুঁটি কিছুই থাকে না। (কড়িখেলা দ্র)।

ফুলছিটানো—কোনো কোনো সমাজে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার কালে কন্যাকে প্রত্যেকবার বরের মুখোমুখি করা হয় এবং সেই সময়ে সে সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুইখানি কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বরের দিকে ফুল ছিটাইয়া দেয় ও করযোড়ে প্রণাম করে।

ফুলশয্যা—বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম একত্র শয়নরূপ আচার। হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে (বিবাহ-রাত্রির পর একরাত্রি বাদ দিয়া) এই আচার পালিত হইতে দেখা যায়। 'ফুলশয্যা'র রাত্রিকে 'শুভরাত্রি' বলা হয় ; অঞ্চলভেদে অনুষ্ঠানটিও 'শুভরাত্রি' নামে অভিহিত হয়। এই উপলক্ষে কন্যাপক্ষ হইতে যে তত্ত্ব আসে, তাহাতে ফুল এবং ফুলের তৈয়ারি শিল্পবস্তুই প্রাধান্য লাভ করে। ফুলের কৃত্রিম অলঙ্কার, ফুলের কৃত্রিম খাবার, ফুলের রকমারি মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদুপরি নানারকম মিষ্টির থালা, বস্ত্রালঙ্কার অনেক কিছু ফুলশয্যার তত্ত্বে স্থান পায়। বরবধূকে সে রাত্রিতে আবার নূতন করিয়া বসন-ভূষণে মালা-চন্দনে সাজানো হয়।

বউঘরা—বধূবরণ অনুষ্ঠান বিশেষ। পতিসহ নববধূ শ্বশুরগৃহে প্রথম পদার্পণ করিলে তাহাকে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বরণ করিয়া ঘরে তোলা হয় ['বউগড়া (বউঘরা) লইল মায় পিড়িতে বসিয়া। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া॥'—মৈগী]। ময়মনসিংহে বধূবরণকে বউঘরা বলা হয়।

বউভাত—(পাকস্পর্শ দ্র)। বিবাহের পর বর নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিলে বরপক্ষ হইতে একদিন সমাজের সকলকে ভোজ দিতে হয়। এইদিন নববধূ স্বামীগৃহে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া প্রথম রান্নায় হাত দেয় এবং তাহার স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া বরের আত্মীয়বান্ধব ও সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজেদের সমাজে তুলিয়া লন। সেকালে 'হীন' ঘর হইতে কন্যা আনিলে সমাজপতিরা বরের নিকট হইতে উপযুক্ত 'বিদায়' না পাইয়া আহার করিতেন না।

বউহাজরি, বোহাজরি-মুস—বউভাত বিশেষ।

বধূবরণ—ইহা একটি আনন্দঘন অনুষ্ঠান। বর যখন নববধূকে লইয়া স্বগৃহে আসিয়া পৌঁছয়, তখন তাহাগিকে দেখিতে বা সাদর সম্ভাষণ জানাইতে সমস্ত পাড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। শাঁখ বাজায়, উলু দেয়, গীত গায়, কলকোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। কিন্তু বধূবরণের বিচিত্র আচার-পদ্ধতি সর্বত্র সকল সমাজে একরূপ নহে। কোথাও নববধূ দুধ ও আলতা গোলা থালায়, কাঁখে জলের কলস, মাথায় ধানের কুনকে এবং হাতে একটি মাছ বা মাছের ডোলা লইয়া দাঁড়ায়। তখন বরের মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেহ এয়োস্ত্রীদের সঙ্গে লইয়া বরণ-কুলায় সজ্জিত বিবিধ মঙ্গলদ্রব্য দ্বারা বধূকে বরণ করিয়া ঘরে লইয়া যান। ঘরে উঠিবার মুখে কোথাও নববধূকে 'আওটা হইতে দুধ উথলাইয়া পড়িতেছে' দেখানো হয়। কোথাও তাহাকে রান্নাঘরে লইয়া গিয়া হাঁড়িভরতি এবং হাঁড়িঢালা ভাত

দেখাইবারও রীতি আছে। কোথাও ননদ বা তৎস্থানীয়ারা কনেবউকে ঘরে উঠিতে বাধা দেয় এবং ভাইয়ের (বরের) নিকট হইতে কিছু অর্থ বা পারিতোষিক পাইয়া তবে পথ ছাড়ে। অঞ্চল ও সমাজভেদে বধূবরণের এইরূপ নানারকম প্রথা প্রচলিত আছে।

বর—বিবাহের পাত্র, বিবাহার্থী, সদ্য বিবাহিত, পতি। প্রার্থিত বস্তু, boon (বরলাভ)। শ্রেষ্ঠ (কবিবর)।

বরকর্ত্তা—বরযাত্রীদের সঙ্গে বরপক্ষের প্রধান হইয়া যিনি কন্যাগৃহে যান। বরপক্ষের প্রধান ব্যক্তি।

বরণডালা—যে পাত্রে (প্রায়ই কুলা) বরণ করিবার বিবিধ মঙ্গল-দ্রব্য থাকে।

বরবরণ—বরবরণ দুই মতে হয়ঃ শাস্ত্রমতে এবং স্ত্রী-আচারমতে। বিভিন্ন সমাজে স্ত্রী-আচারে বিভিন্নতা আছে। পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও বর বিবাহ-বাড়ীতে আসা মাত্রই পুরস্ত্রীরা বরণডালায় সজ্জিত যাবতীয় মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহাকে বরণ করেন, ডিম ছুঁড়িয়া মারেন ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানে মেয়েলী প্রথায় বর-বরণ সাধারণতঃ সম্প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে ছাঁদনাতলায় সম্পন্ন হয়। কন্যাদাতা কর্তৃক বর শাস্ত্রীয় বিধিমতে বৃত হইবার পর, এয়োরা মেয়েলী আচার মতে আবার তাহাকে বরণ করেন। পাঁচজন কি সাতজন এয়োস্ত্রী বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন এবং বরণডালার দ্রব্যগুলি একে একে তাহার শরীরে ছোঁয়াইয়া, 'ধুতুরা পিদ্দিম' জ্বালাইয়া এবং আরও নানারকম প্রথায় বরণ-কার্য শেষ করেন।

বরভোজন—শ্বশুরবাড়ীতে বরের প্রথম অন্নগ্রহণরূপ অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গের বহু সমাজে বর বিবাহের রাত্রিতে শ্বশুরবাড়ীর অন্ন গ্রহণ করে না, নিজের বাড়ী হইতে আনীত ডালচাল রন্ধন করাইয়া খায়, কিংবা শ্বশুরের কোনও আত্মীয় বা প্রতিবেশীর বাড়ীতে ভোজন করে; কোথাও বা কন্যাগৃহে সে রাত্রিতে বরভোজনের একটা অভিনয়মাত্র করা হয়ঃ—বরের সম্মুখে অন্ন-ব্যঞ্জনের একটি থালা রাখা হয়, বর তাহা হইতে পাঁচ গ্রাস অন্ন (ভাত) শুঁকিয়া ফেলিয়া দেয়, শাশুড়ী আঁচল পাতিয়া সেই অন্ন গ্রহণ করেন। এজন্য বরপক্ষ হইতে তাঁহাকে কাপড় দেওয়া হয়। তদঞ্চলে প্রকৃত বরভোজন হয় পরদিন। আবার কোনো কোনো সমাজে বরভোজনের কোনও বাঁধাধরা রীতি নাই, বিবাহের রাত্রিতেই বরকে বরযাত্রীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতে দেখা যায়।

বরযাত্র, বরযাত্রী—বিবাহের সময় বরের সঙ্গে যাহারা কন্যার গৃহে যায়। তৎপর্যায় :—বৈরাতি, ম্যামান্-মুস।

বরযাত্রা—কন্যাপক্ষের আহ্বানে বিবাহার্থী বরের সাড়ম্বর কন্যা-গৃহে গমন। এই ব্যাপারে স্থান ও সমাজভেদে বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে বাঙ্গালী বরের মস্তকে শুধু মুকুট (শোলার টোপর), ললাটে চন্দনের ফোঁটা, কণ্ঠে ফুলের মালা, মণিবন্ধে মঙ্গলসূত্র, হস্তে জাঁতি বা মাজ-দর্পণ দেখা যায়। আসামের কোথাও কোথাও বরের মস্তকে উষ্ণীষ পরাইবার এবং ললাটে বটের আটা ও সোহাগার ফোঁটা দিবারও প্রথা আছে।

বাদগোস্তী-মুস—বিবাহের পর জামাতার দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়ী গিয়া কয়েকদিন অবস্থান।

বাসর, বাসরঘর—যে ঘরে বর-কন্যা বিবাহ-রাত্রিতে শয়ন করে, অর্থাৎ পুরস্ত্রীদের সহিত আমোদ আহ্লাদে জাগিয়া বিবাহরাত্রি অতিবাহিত করে। বাসর জাগা—বাসরে বর-কন্যাকে লইয়া পুরনারীদের আমোদআহ্লাদে রাত জাগার সুপ্রচলিত রীতি। বাসর জাগানি – বাসরে যাহারা বর-কন্যার সহিত রাত জাগে তাহাদিগকে বরপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থ।

বাসিবিবাহ—সাধারণতঃ বিবাহের পরদিন পূর্বাহ্ণে কন্যার বাড়ীতে বাসি বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। ইহা প্রধানতঃ স্ত্রী-আচার। সর্বত্র সকল সমাজে এই প্রথার প্রচলন নাই। কোথাও বা বিবাহের রাত্রিতেই কুশণ্ডিকার পর এই আচার পালিত হয় এবং তখনই বধূর কপালে সিঁদুর পরাইয়া দেওয়া হয়। পরদিনের বাসিবিবাহে অনেক সমাজে বর-বধূকে 'সোহাগ জলে' একত্রে কলাতলে নাওয়ানো হয়; গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় তাহারা পাশাপাশি বসিয়া সূর্যার্ঘ্য প্রদান করে এবং পুরোহিতকে অগ্রগামী করিয়া সাতবার 'কলাতল'টি প্রদক্ষিণ করে। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় পুরোহিত কলাতলে খনিত একটি পুকুরে (গর্তে) গাড়ু হইতে কিছুটা জল ঢালিয়া দেন। এইরূপে গর্ত ভরিয়া উঠে এবং পুরোহিত আশীর্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর বর-কন্যার মধ্যে সেই পুকুরে আংটি লুকানো ও খুঁজিয়া বাহির করা ইত্যাদি নানা রকম খেলার অভিনয় হয় এবং বর বধূর কপালে সিঁদুর পরাইয়া দেয়। স্থান এবং সমাজভেদে আচার-নিয়মের অবশ্যই পার্থক্য আছে।

বিবাহ-বাসর—বিবাহ-স্থান, ছাঁদনাতলা, যেখানে সম্প্রদানাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

বৃদ্ধির বারা—অভ্যুদয় বা সমৃদ্ধির জন্য বিবাহাদি শুভকার্যের পূর্বে পিতৃপুরুষের

উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধকৃত্য করা হয়, তাহার এক নাম **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**। গ্রামে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের চাউল বাড়ীর এবং পাড়ার এয়োস্ত্রীরা ঢেঁকিতে বা উদূখলে ভানিয়া তৈয়ার করেন। এই ধান ভানাকে বলা হয় 'বৃদ্ধির বারা' ('আন এয়োগণ যত ছানার সন্দেশ তত। তৈল সিন্দূর দিয়ে ধান্য ভানে রানী।'-ম ।

ভাত-কাপড়-পূব—বিবাহের পর (সাধারণতঃ বিবাহের তৃতীয় দিবসে দ্বিপ্রহরে) স্বামী কর্তৃক নববধূকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম অন্ন-বস্ত্র প্রদান এবং তাহার সমস্ত জীবনের ভারগ্রহণ। ইহা একটি মনোজ্ঞ স্ত্রী-আচার। সুভগা কোনও এয়ো এই 'ভাতকাপড়ে'র রান্না রাঁধেন। উপকরণের মধ্যে (menu) মাছ, মাংস, ডিম, দধি, দুগ্ধ, পিষ্টক, পরমান্ন কিছুই বাদ যায় না। শুভক্ষণে নববধূ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যে একটি পিঁড়িতে বসে এবং থালায় ও বাটিতে বাটিতে সব কিছু সাজাইয়া তাহার সামনে আনিয়া রাখা হয়। স্বামী আসিয়া অন্নের থালাটি এবং শঙ্খ সিন্দূর ও শাড়ীখানি বধূর হাতে তুলিয়া দেয়। স্বামীদত্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি বধূ উপস্থিত ছেলেমেয়েদিগকে কিছু কিছু পরিবেশন করিয়া পরে নিজে গ্রহণ করে।

মঙ্গলসূত্র— (অধিবাস দ্র)। **মঙ্গলাচরণ**—পাকাদেখা, পাকা দেখার দিনে আচরিত অনুষ্ঠান (পাকাদেখা দ্র)।

মাজদর্পণ— (ধুতুরা কাটাইল দ্র)। **মাড়োয়ারতল**—ছাঁদনাতলা, বিবাহ-মণ্ডপ। মাড়ো—মণ্ডপ।

মালাবদল—শুভদৃষ্টির সময় বর-কন্যার মালা বদলের সুপ্রচলিত প্রথা। ছাঁদনা-তলায় সাতবার প্রদক্ষিণ করিবার পর কন্যা নিজের গলার মালা বরকে এবং বর নিজের গলার মালা কন্যাকে পরাইয়া দেয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে তিনবার করা হয়। ইহাই বৈবাহিক মালাবদল এবং লোকমতে বিবাহ সিদ্ধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

মিতবর, নিতবর—বিবাহে যাত্রা করিবার-কালে অনেক সমাজে একটি সুবেশ বালক বরের পার্শ্বে থাকে এবং বিবাহ-সভায় গিয়াও তাহার পার্শ্বে বসে। ইংরেজিতে এইরূপ সহচরকে best man বলা হয়। মেয়ে মজলিসে কন্যার পার্শ্বেও মিতকনে / নিতকনে (bridesmaid) নামে একটি সুবেশা বালিকাকে সর্বদা বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

মুখচন্দ্রিকা—শুভদৃষ্টি, বিবাহ-বাসরে বর-কন্যার পরস্পর মুখাবলোকন বা দৃষ্টি-বিনিময়। অঞ্চল ও সমাজভেদে এই ব্যাপারে অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত

হয়। কোথাও দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট বরকে সাতবার প্রদক্ষিণের পর কন্যাকে বরের মুখোমুখি করিয়া তাহাদের উপর একটি কাপড় ধরা হয়। সেই অবসরে বর-কন্যার দৃষ্টি-বিনিময় ও মালা-বদল হয়। কোথাও প্রদক্ষিণকালে বরের মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়, কন্যাও দুই হাতে দুইটি পান লইয়া মুখ ঢাকিয়া রাখে। অবশ্য, যথাসময়ে উভয়ের আচ্ছাদন সরাইয়া দেওয়া হয়। আবার কোনও সমাজে প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের পর দৃষ্টি-বিনিময় হয় ('ফুল ছিটান' দ্র)। কোনও সমাজে কন্যাকে যখন পিঁড়িতে বসাইয়া ঘুরানো হয়, তখন বরকেও পিঁড়িতে উপরে তুলিয়া ধরা হয়। সাধারণ লোক এই প্রথাকে বলে, 'পাটে পাটে বিবাহ'। আবার কোথাও বর ছাঁদনাতলায় একটি বাঁশের খুঁটি ধরিয়া অথবা খুঁটিতে বাঁধা কাপড়ের একপ্রান্তে পা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং সেই অবস্থায় কন্যাকে পিঁড়িতে তুলিয়া বরকে প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহাকে বলে, 'শালে পাটে বিবাহ'। একসময়ে বিশেষ একশ্রেণীর পরিচারকেরাই কন্যাকে পাটে তুলিয়া ঘুরাইত, বর্তমানে কন্যার আত্মীয়স্বজন বা ভ্রাতারাই এই কাজ করিয়া থাকে। বর্তমানে অনেক শিক্ষিতা যৌবনপ্রাপ্তা কন্যা হাঁটিয়াই বরকে প্রদক্ষিণ করে, কাহারো সাহায্য তাহাদের আবশ্যক হয় না।

মোনামুনি ভাসানো-পব—স্ত্রী-আচার বিশেষ। বিবাহের দিন সন্ধ্যায় কন্যাকে নাওয়াইয়া এয়োরা একটি জলের গামলায় দুইটি 'মোনামুনি' ছাড়িয়া দেয়; ঐগুলি ভাসিতে ভাসিতে যদি মিলিত হয়, তবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, বর-বধূর দাম্পত্য-জীবন সুখের হইবে।

এই আচার উত্তরবঙ্গের '**প্রদীপভাসানো**'র মতই। তদঞ্চলে বর ও কন্যার নামে সন্ধ্যায় দুইটি প্রদীপ ভাসাইয়া দেওয়া হয়। উহারা ভাসিতে ভাসিতে একত্র ঠেকিলে শুভ, পৃথক থাকিলে অশুভ মনে করা হয়; কোনোটি ডুবিয়া গেলে আশঙ্কার সীমা থাকে না।

রীত-রসুন-মুস—বিবাহাদিতে যেসব প্রথা পালিত হয়।

লগ্নপত্র—বিবাহ প্রস্তাবকে পাকা করিবার শেষ ধাপ বিশেষ (পাকা দেখা দ্র)।

শালেপাটে বিবাহ—(মুখচন্দ্রিকা দ্র)। **শুভদৃষ্টি**—বিবাহের শুভলগ্নে বর-কন্যার দৃষ্টি বিনিময়, পরস্পরকে দর্শন (মুখচন্দ্রিকা দ্র)।

শুভরাত্রি—শুভ্‌রাত, শুভ্‌রাইত, যে রাত্রিতে বর-বধূ প্রথম একত্র শয়ন করে (ফুল-শয্যা দ্র)।

শেজতুলনি—বাসরঘরে বর-কন্যা যে শয্যায় শয়ন করে সেই শয্যা তোলার

জন্য কন্যার ছোট বোন বা বান্ধবীরা বরপক্ষের নিকট হইতে যে-অর্থ আদায় করে।

শ্যামাপূজা—পূর্ববঙ্গে বহু সমাজেই বিবাহের পূর্বদিন শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং নিমন্ত্রণ-লিপিতে প্রথমেই শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার এবং পরে বিবাহের উল্লেখ করিয়া উভয় অনুষ্ঠানে যথাসময়ে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়।

সিঁদুর দান—বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী-আচার। হোমাদির শেষেই বহু অঞ্চলে বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুর-পরানো হয়। কোথাও কোথাও পরদিন বাসি-বিবাহের সময় এই প্রথা পালিত হইতে দেখা যায়। আবার কোথাও বা বিবাহের তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে বধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম অন্ন-বস্ত্র (ভাত-কাপড় দ্র) দিবার সময় সিন্দুরও দেওয়া হয়। বহু স্থানেই বর তাহার আংটির সাহায্যে বধূর সীমন্তে সিঁদুর দিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কোথাও কোথাও কুনকের পিঠে সিঁদুর মাখাইয়া বর উহা এক হাতে বধূর কপাল হইতে মাথার দিকে টানিয়া নেয় এবং অন্য হাতে তাহার ঘোমটা পরাইয়া দেয়।

সোহাগজল—পাঁচজন কি সাতজন সুভগা স্ত্রীর আঁচল ভিজানো জল। এই জল দ্বারা বাসি-বিবাহের সময় বর-কন্যাকে একত্রে নাওয়ানো হয়।

সোহাগ মাগা—পূর্ববঙ্গের বহু সমাজে বিবাহের দিন অপরাহ্ণে কন্যার বাড়ীতে 'সোহাগ মাগা' নামক এক হৃদয়গ্রাহী স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে কন্যার মা বা মাতৃ-স্থানীয়া কেহ জা কিংবা ননদ এবং অপর কয়েকজন এয়োকে সঙ্গে লইয়া প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে তাহাদের সোহাগ অর্থাৎ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে যান। তাঁহার মাথায় থাকে একটি কুলা এবং উহাতে বিভিন্ন আধারে অল্প অল্প করিয়া ডাল, চাল, মশলা, তেল, লবণ ইত্যাদি। জা বা ননদ কাঁখে একটি জলের কলসী বহন করেন এবং তাঁহার আঁচলের সহিত কুলা-বহন-কারিণীর আঁচল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা বাড়ী বাড়ী উপস্থিত হইয়া উলুধ্বনির মধ্যে কুলাটি গৃহদ্বারে নামাইয়া রাখেন এবং সেখান হইতে তিন চিমটি মাটি তুলিয়া লন। গৃহকর্ত্রী তখন কুলায় যে আধারে যে জিনিষ সাজানো থাকে, সেই আধারে সেই জিনিষ অল্প অল্প করিয়া দেন, জলের কলসীতে একটু জল ঢালেন এবং শুভেচ্ছা জানাইয়া সকলকে হাসিমুখে বিদায় করেন (জলসহা দ্র)।

সোহাগ মাপা—বিবাহের দিন কন্যার স্নানের পর তাহার সামনে এক হাঁড়ি জল রাখা হয়। এই জল পাঁচ এয়োতে মিলিয়া পূর্বেই ভরিয়া আনে। কন্যা একটি খুরিদিয়া মধ্যে মধ্যে সেই জল আওটায়—একবার ভরিয়া তোলে, একবার

ঢালে, আর মনে মনে বলে,—'আমি যেন শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী ভাশুর সকলের সোহাগ পাই, সকলের আদরিণী হই।'

হলুদ কোটা—বাংলার অঞ্চলভেদে হলুদ-কোটা বিবাহের একটি মঙ্গলাচার বিশেষ। বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে আনুষ্ঠানিক ভাবে হলুদ কুটিয়া (ঢেঁকিতে বা উদূখলে) রাখা হয় এবং যথাসময়ে বর-কন্যাকে তাহা মাখাইয়া স্নান করানো হয়।

হস্তবন্ধন, হস্তলেপ—এই দুইটি বৈবাহিক ক্রিয়া অনেকটা শাস্ত্রবিধি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। সম্প্রদানের সময় কন্যা আপনার ডান হাতখানি বরের ডান হাতের উপর রাখিলে পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুশ ও মাল্য দ্বারা সেই হাত দুইটি বাঁধিয়া দেন। কখনো বা কন্যাদাতা নিজে কিংবা কোনও পতি-পুত্রবতী নারী এই কাজ করিয়া থাকেন। পূর্বে এই সময়ে বিবিধ ভেষজ দ্রব্যে বর-কন্যার হস্ত লেপন করা হইত, বর্তমানে শুধু দধি ঢালিয়াই নিয়ম রক্ষা করা হয়। সম্প্রদানের পর হস্তবন্ধন খুলিয়া বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া দেওয়া হয় (গাঁটছড়া দ্র)।

হাই আমলা বাটা—দুইজন সুভগা নারী উড়ুনির নীচে বসিয়া একত্রে নোড়া ধরিয়া হাই-আমলা (আমলকী ও মেথী ?) বাটে এবং তাহা পানে লেপিয়া বরণ-কুলায় রাখিয়া দেয়। বর-বরণের সময় এই পান বরের বুকে ও পিঠে ছোঁয়ানো হয়।

হাজরি-মুস—কন্যাপক্ষ হইতে বরপক্ষকে যে ভোজ দেওয়া হয়।

২ বিবিধ ব্রতাচার ও লোকবিশ্বাস

অক্ষয় কুমারী—অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে সধবাদের কুমারী-পরিচর্যারূপ অনুষ্ঠান বিশেষ।

অক্ষয় সিঁদুর—অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে সধবাদের অপর সধবাকে সিঁদুর, আলতা, নোয়া, কাপড় ইত্যাদি দিয়া এবং ভোজন করাইয়া সন্তুষ্ট করিবার ব্রত বিশেষ।

অরন্ধন—বিশেষ বিশেষ দিনে রন্ধনবর্জনের প্রথা। পশ্চিমবঙ্গের অনেক পরিবারেই ভাদ্রের সংক্রান্তিতে এবং শীতলষষ্ঠীর দিনে (শ্রীপঞ্চমীর পরদিন) রান্না করা হয় না; দশহরা এবং শ্রাবণ মাসের শেষ দিনেও এই প্রথা স্থানে স্থানে পালিত হইতে দেখা যায়। অরন্ধন উপলক্ষে পূর্বরাত্রে রান্না করা বাসি ভাত খাওয়া হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির অরন্ধন অঞ্চলভেদে নানা নামে অভিহিত হয়। যেমন, হাওড়ায় 'ঢেলাফেলা', বাঁকুড়ায় 'খইধারা', বর্ধমানে 'খইদই' নদীয়ায়

'পাতালফোঁড়'। ভাদ্র-সংক্রান্তির অরন্ধনের অন্য নাম 'রান্নাপূজা।' শীতলষষ্ঠীর অরন্ধন 'গোটাসিদ্ধ খাওয়া'। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজনৈতিক কারণে (বঙ্গভঙ্গ) আশ্বিনের সংক্রান্তিও অরন্ধন এবং রাখীবন্ধন দিবসরূপে ঘোষিত হয়।

অলক্ষ্মী বিদায়—দীপালীর রাত্রিতে—সন্ধ্যায় বাংলার বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ, যশোহর ও খুলনা জেলায় গোবর দিয়া অলক্ষ্মীর এবং পিটুলি দিয়া লক্ষ্মী, কুবের ও নারায়ণের মূর্তি গড়া হয়। অলক্ষ্মীর মূর্তিটি কলার খোলে বসাইয়া প্রথমে তাঁহার পূজা ও ধ্যান করা হয়। ধ্যানে অলক্ষ্মী কৃষ্ণ-বর্ণা, ক্রোধী, এলোকেশী; তাঁহার এক হাতে কুলা অন্য হাতে ঝাঁটা। পূজান্তে ছেলেমেয়েরা কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাঁহার মূর্তিটি তেমাথায় লইয়া যায় এবং ফেলিয়া দিয়া বলে, 'লক্ষ্মী ঘরে আয়, অলক্ষ্মী দূর হ।' এইরূপে 'অলক্ষ্মী-বিদায়'-এর পর গৃহিণীরা ঘরে আসিয়া আবার যথারীতি লক্ষ্মীপূজা করেন।

অশৌচতোলা বা নাওয়ান—পূর্ব ময়মনসিংহের কোথাও কোথাও গাই প্রসব করিলে পর পঞ্চম, সপ্তম কি নবম দিনে প্রথম দুধ দোহন করা হয়। প্রথমে গাই বাছুরকে স্নান করাইয়া বাছুরটিকে মাথা হইতে লেজের আগা পর্যন্ত দুধ দিয়া তিনবার মুছিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ আরও কয়েকটি আচার পালন করিয়া উপস্থিত ছেলেমেয়েদের একটু একটু দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানের স্থানীয় নাম, 'অশুজ তোলা 'বা' নাওয়ানি।'

আওনি বাওনি—পশ্চিম বঙ্গের গৃহিণীরা পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন সযত্নে রক্ষিত এক মুঠা ধানগাছ পূজা করিয়া এক একটি শীষ বাক্স, সিন্দুক, খাট-চৌকি, গোলা, গোশালা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দেন, এবং বলেন,—

'আওনি বাওনি চাওনি।
তিন দিন পিঠা খাওনি॥
তিন দিন না কোথা যেও।
ঘরে বসে পিঠা খেও॥'

অনেকে এই ছড়াটির এইরূপ অর্থ করেন: 'আওনি'—লক্ষ্মীর আগমন; 'বাওনি'—লক্ষ্মীর বন্ধন বা স্থিতি, আর 'চাওনি'—তাঁহার নিকট প্রার্থনা। উত্তরবঙ্গেও প্রায় অনুরূপ 'আওরি বাওরি' প্রথা প্রচলিত আছে।

আকাশবাতি—আশ্বিনের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া কার্তিকের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় বাঁশের বা কাঠের লম্বা খুঁটির আগায় যে প্রদীপ দেওয়া হয়।

আঁকিকা—ইসলাম ধর্মশাস্ত্রানুসারে ছেলের নামকরণ উৎসব।

আদর সিংহাসন—শ্বশুর-গৃহে সকলের আদরিণী হইবার উদ্দেশ্যে নববধূর অনুষ্ঠেয় ব্রত বিশেষ। এই ব্রতে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে একজন সুভগা স্ত্রীকে ও একজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বসনভূষণে ও আহারে পরিতুষ্ট করিতে হয়। চার বৎসর এইরূপ করিবার পর বৈশাখের সংক্রান্তিতে আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

আদা-হলুদ—ইহাও এয়ো-পরিচর্যারূপ অনুষ্ঠান বিশেষ। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখ মাস ভোর একজন সুভগা স্ত্রীকে প্রতিদিন পাঁচ টুকরা আদা, পাঁচ টুকরা হলুদ, এক মুঠা ধান, এক মুঠা ধনে, কিছু মিষ্টি ও একটি পয়সা দিতে হয়। চার বৎসর নিয়মিত এইরূপ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য শঙ্খে সিন্দুরে বাঁচিয়া থাকা।

আমলে পাওয়া—ভূতাবিষ্ট হওয়া; কাহাকেও (প্রায়ই স্ত্রীলোক) সহসা আবোল-তাবোল বকিতে, কখনো হাসিতে, কখনো কাঁদিতে, কখনো বা বিকট ভঙ্গি করিতে দেখিলে বলা হয়, উহাকে আমলে পাইয়াছে, অর্থাৎ উহার শরীরে অপ-দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে। তখন ঝাড়ফুঁকের রোজা ডাকা হয়।

উঠানি—সূতিকাগৃহ হইতে নির্দিষ্ট কয়দিন পর স্নানাদি করিয়া নবজাতক সহ প্রধান গৃহে আসা। তৎপর্যায়:—আঁতুড় তোলা-ম, আঁতুড় বেরেন-মু।

একাচুরার বেড়ি—একাচুরা বা একাচোরা নবজাতকের ইষ্টানিষ্টকারী দেবতা বিশেষ। অশৌচান্ত দিবসে কিংবা অন্নপ্রাশনে ইহার ব্রত করা হয়। কোনো কোনো মৃতবৎসা জননীকে একচুরার নামে সন্তানের একপায়ে একটি লোহার বেড়ি (ডাঁড়ুকা) বা সুতার দড়ি বাঁধিয়া রাখিতে দেখা যায়। শিশুর বয়স আঠার মাস উত্তীর্ণ হইলে যথারীতি একাচুরা ব্রত করিয়া ঐ বেড়ি খুলিয়া ফেলা হয়। বেড়ি পরানোর সঙ্গে কখনো কখনো শিশুর চুল লম্বা রাখিতে এবং নাক-কান বিঁধাইতেও দেখা যায়। অনেকের বিশ্বাস, শিশুকে এইরূপে চিহ্নিত বা খুঁত করিয়া রাখিলে সে অপদেবতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়।

এয়ো সংক্রান্তি—সধবাদের ব্রত বিশেষ; এই ব্রত তাহারা বিবাহের বৎসর কিংবা পর বৎসর মহাবিষুব সংক্রান্তিতে লইয়া থাকে। এয়োর পা ধোয়ানো, এয়োকে আলতা পরানো, তেল মাখানো, এয়োর হাতে নোয়া দেওয়া, এয়োকে সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করা এই ব্রতের প্রধান প্রধান করণীয়।

কমলে কামিনী—সিংহলে যাইবার পথে প্রথমে ধনপতি এবং পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সমুদ্রে (কালীদহে) এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কমলবনে এক

সুন্দরী রমণী প্রস্ফুটিত কমলের উপর বসিয়া একটি হাতী গিলিতেছে আর 'উগরাইয়া দিতেছে। এই রমণীই তথা দেবীই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কমলে কামিনী',—মঙ্গলচণ্ডীর মায়া-মূর্তি।

কলা বউ—নব-পত্রিকা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ইহারও পূজা হইয়া থাকে। নব-পত্রিকা—কদলী, হরিদ্রা, ধান্য, কচু, মান, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, অশোক ও বিল্ব—এই নয়টি গাছের (কোনো কোনোটির মাত্র ডালপালার) একটি আটি লালপাড় কাপড়ে আচ্ছাদিত করিয়া নব-বধূর ন্যায় গণেশের পার্শ্বে রাখা হয়। ইহার মধ্যে কলাগাছটিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলিয়া সাধারণ লোক ইহাদের 'কলাবউ' বলিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়াও মনে করে। পূজার পূর্বে এই 'কলাবউ'কে নদী বা পুষ্করিণীর জলে শোভাযাত্রা সহকারে স্নান করানো হয়। পণ্ডিতদের মধ্যে এই 'কলাবউ' সম্পর্কে নানা মত দেখা যায়।

কলা বিবাহ—পূর্ববঙ্গের বসন্ত-ব্রতের তথা 'বসন্‌রা' ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ। ঐ ব্রত বা পূজা উপলক্ষে দুইটি কলার তেউড়কে বর-কন্যা সাজাইয়া বিবাহের যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের অভিনয় করা হয়। কয়েকজন এয়োস্ত্রী বরবেশী গাছটিকে লইয়া দাঁড়ান, আর কয়েকজন বধূবেশী গাছটিকে লইয়া চারদিকে সাতবার ঘুরেন, সামনাসামনি হইয়া শুভদৃষ্টি করান, ফুল-ছিটান, মালা পরান ইত্যাদি।

কাকবলি, কাকবইল—(জীবজন্তু অধ্যায়ে 'কাক' দ্র)।

কাদামাটি—নবমী পূজার পর বলির রক্ত ও হাড়িকাঠের মাটি লইয়া কাদা করিয়া তাহাতে গড়াগড়ি দেওয়া দুর্গোৎসবের একটি আনুষঙ্গিক আচাররূপে গণ্য হয়। বহু পূর্বে শুধু ছাগ-মহিষই বলি দেওয়া হইত না, দেবীর প্রীত্যর্থে এবং শত্রুক্ষয় মানসে মনুষ্য বলিরও প্রথা ছিল। শত্রুপক্ষের কাহাকেও পাইলে সর্বোত্তম, নতুবা যবচূর্ণ বা মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুমূর্তি তৈয়ার করিয়া বলি দেওয়া হইত। শত্রুর এইরূপ প্রতীক বলি দেওয়ার প্রথা আজও কোনো কোনো পরিবারে বর্তমান আছে।

কুলাইর মাগন-ব, **কুলের মাগন**-ঢা—পৌষ মাসে আমনধান গোলাজাত হইলে গ্রামের বালকেরা (প্রায়ই নিম্নকোটি সমাজের) বাড়ী বাড়ী যায় এবং নানারূপ ছড়া আবৃত্তি করিয়া ধান-চাল ইত্যাদি মাগিয়া আনে ও পৌষ-সংক্রান্তির দিনে চড়ুইভাতি করে। এক সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কুলাই ঠাকুরের বেশ নামডাক ছিল এবং তাঁহার নামে মাগা হইত বলিয়াই হয়ত স্থানভেদে পৌষ-মাগনের এক নাম হইয়াছে 'কুলাইর মাগন'।

কোয়াট-মে—(নিশির ডাক দ্র)।

গম্ভীরা—গম্ভীর নামক দেবগৃহে শিবাদি দেবতার যে পূজা-উৎসব হইয়া থাকে বাংলার অঞ্চল বিশেষে (রং. দি. মা. রা. মু) তাহারই নাম গম্ভীরা। মালদহের গম্ভীরা বা আদ্যের গম্ভীরা সমধিক প্রসিদ্ধ। বাংলার অপর বহু অঞ্চলে (চ. ন. খু. য. ফ. হা. হু. মে. বাঁ. বর্ধ. বীর) গম্ভীরা উৎসব বর্তমানে 'গাজন' নামে পরিচিত। উৎকল এবং মেদিনীপুরে 'সাহীযাত্রা' এবং ময়মনসিংহে 'চড়কপূজা' নামও শুনা যায়। এই সকল অনুষ্ঠান মূলতঃ এক হইলেও ইহাদের আচার-নিয়মে কিছু কিছু তারতম্য আছে ('আদ্যের গম্ভীরা'-পালিত দ্র)।

গরণাকাটা-পূব—লোকমত এই যে, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় কোনও অন্তঃসত্বা স্ত্রীলোক যদি কাটাকাটির কাজ করে, তাহা হইলে ভ্রূণের কোনও অঙ্গহানি ঘটে (প্রায়ই উপরের ঠোঁটে এই দোষ অর্শায়)। এইরূপ অঙ্গহানিকে গরণাকাটা (গ্রহণের প্রভাবহেতু কাটা ?) বলা হয়।

গাছ জাগান—চড়কপূজা বা গাজনের একটি আনুষঙ্গিক আচার। সাধারণতঃ চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন চড়কগাছকে জাগাইতে হয়। একটি গাছকে বহু বৎসর, এমন কি বহু পুরুষ ধরিয়া পূজা করা চলে। যে জলাশয়ে উক্তরূপ পূজিত চড়কগাছ নিমগ্ন থাকে, সন্ন্যাসীরা নৃত্য গীত এবং বাদ্যসহকারে তাহার পাড়ে যাইয়া সমবেত হয় এবং মহাদেবের নাম করিয়া গাছ অন্বেষণে নামিয়া পড়ে। জনশ্রুতি এই যে, চড়কগাছ সহজে ধরা দেয় না, ভক্তদের মনপরীক্ষার জন্য বা তাহাদের কোনও অন্যায়ের জন্য আত্মগোপন করিয়া থাকে। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর গাছটির সন্ধান পাওয়া যায় এবং উহাকে উঠাইয়া উহার সর্বাঙ্গে তেল-ঘি মাখাইয়া চড়কতলায় আনিয়া যথারীতি পোঁতা হয়। এই অনুষ্ঠানেরই নাম 'গাছ জাগান।' গাছটি শাল বা গজারির ২০-২৫ ফুট লম্বা একটি খুঁটি হইলেও সকলে ইহাকে 'জাগ্রত' মনে করে।

গাছবেড়া—বিবাহের পূর্বে কোনও গাছকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, উহাকে সুতায় জড়ানো, উহার সঙ্গে মালাবদল ইত্যাদির ভিতর দিয়া বিবাহের অভিনয় বিশেষ। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, অনেক সময় সম্প্রদায় নির্বিশেষে দোজবর তেজবর বিবাহার্থীদেরও পুনর্বার বিবাহের প্রাক্কালে ঐরূপ করিতে (সাধারণতঃ কলাগাছের সঙ্গে) দেখা যায় ; যে গাছের সঙ্গে এই ধরণের কৃত্রিম বিবাহ হয়, সেই গাছের ফল স্বামী-স্ত্রী কেহ কখনো খায় না।

গাজন—গাজন বলিতে প্রথমেই চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত শিবের উৎসব এবং

চড়কপূজার কথা মনে আসে। কিন্তু চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি দিনে বা তিথিতে গাজন-উৎসব হইতে দেখা যায় এবং শুধু শিবেরই নহে, অপর কোনও কোনও দেবতার পূজা-উৎসবেরও লোকপ্রসিদ্ধ নাম গাজন। যেমন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন। অনেকে বলেন, সংস্কৃত 'গর্জন' শব্দ হইতে 'গাজন' শব্দ আসিয়াছে। ইহা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কেননা, সন্ন্যাসী (ভক্ত্যা) এবং অপর বহুলোকের উচ্চধ্বনি, কোলাহল, নৃত্য, গীত ও ঢক্কানিনাদের মধ্যেই গাজন-উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

গোজন্মে মুক্তি—পল্লীগ্রামের অনেক নিষ্ঠাবতী বর্ষীয়সী মহিলার মুখে এই কথাটি শুনা যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস, গোজন্মের পর জীবকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; জন্মমৃত্যুর বহুস্তর অতিক্রম করিয়া সর্বশেষে সে গোরু হইয়া জন্মায় এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজাত তাহার সমস্ত কর্মফল-ভোগের অবসান ঘটে; গোজীবন অন্তে সে পরম আত্মায় লীন হইয়া যায়।

ঘট ওলানো—পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বারোয়ারি শীতলাপূজা উপলক্ষে মেয়েরা কুলার উপর শীতলার ঘট স্থাপন করিয়া বাড়ী বাড়ী যায় এবং গোবরজলে নিকানো উঠানে ঘট-কুলা নামাইয়া হাততালি দিতে দিতে উহার চারিদিকে ঘুরে (বৃদ্ধারা বলেন, পূর্বে এই উপলক্ষে গীত ও নৃত্য হইত, বর্তমানে এই প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে)। গৃহকর্ত্রী তখন চাল-পয়সা, ফলমূল মাগন দিয়া তাহাদিগকে বিদায় করেন। এই প্রথার নাম 'ঘটওলানো।' ওলানো, ওলা-য. ন. খু, উলে ফেলা-মে—নামানো।

চৈতলা দেওয়া-ম—ফাল্গুনের সংক্রান্তিতে খুব ভোরে প্রত্যেক ঘরের দুয়ারে এবং বাড়ী হইতে বাহির হইবার প্রত্যেক পথে কয়েকটি করিয়া গোবরের পিণ্ড ফুল ও দূর্বাসহ সারিবদ্ধ ভাবে দেওয়া হয়; ইহারই স্থানীয় নাম 'চৈতলা দেওয়া।' যদি কেহ প্রবাসে থাকে তাহা হইলে বাড়ীর একটি পথ খোলা রাখা হয়। 'চৈতলা'র এই গোবর শুকাইয়া চৈত্রসংক্রান্তিতে গোয়ালে সাঁজাল দেওয়া হয়।

চোদ্দশাক খাওয়া—দীপান্বিতা অমাবস্যার পূর্বদিন চতুর্দশীতে চোদ্দরকম শাক খাইবার যে-রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকেই 'চোদ্দশাক খাওয়া' বলে।

ছলন-পব—ছলনমূর্তি। মন্দিরে বা 'থানে' প্রতিষ্ঠিত বৃহদাকার মূর্তির অনুরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি বিশেষ। অনেকে মানত করেন, সফলকাম হইলে তিনি দেবতার থানে 'ছলন' দিবেন। সাধারণতঃ লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পূজার দিনেই

(জাঁতাল) মানতকারীরা এইরূপ ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি গড়াইয়া দেন। অনেক সময় ছলনমূর্তি হিসাবে ছোট ছোট হাতীঘোড়াও দেওয়া হয়।

ছাতু উড়ানি—ছাতু উড়ানো। ইহা চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলের একটি লোকাচার বিশেষ। সংক্রান্তি-দিন স্নান করিয়া আসিয়া পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ দুই মুঠা ছাতু লইয়া তেমাথায় যায় এবং উপুড় হইয়া দুই পায়ের ফাঁক দিয়া পিছন দিকে তাহা উড়াইতে উড়াইতে তিনবার বলে, 'ছাতু যায় উইড়া, দুষমনি বাদী মরে পুইড়া।' বরিশালের দিকে শুনা যায়, 'শত্রু উড়াইলাম, শত্রু উড়াইলাম'।

জলপড়া—ওঝাদের মন্ত্রপূত জল যাহা সাধারণ লোক বিষ-ব্যথা ইত্যাদি নানা রোগের ঔষধরূপে ব্যবহার করে।

জাতাল, জাঁতাল—লৌকিক দেবতার বাৎসরিক পূজা-উৎসব। তৎপর্যায়:—জাতের পূজা। এই পূজার দিনে দূর দূরান্তর হইতে মানতকারীরা নানা অর্ঘ্য লইয়া পূজার থানে আসে; এই উপলক্ষে বহুস্থানে মেলাও বসে।

শনি ও মঙ্গলবারের পূজাকে বলা হয় 'বারের পূজা'।

জামাইষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীতে পুরনারীরা যে ষষ্ঠীব্রত করেন তাহার শাস্ত্রীয় নাম 'আরণ্য ষষ্ঠী' লোকপ্রসিদ্ধ নাম 'জামাইষষ্ঠী'। এই ব্রত উপলক্ষে শাশুড়ী জামাতাকে নিমন্ত্রণ করেন, ষষ্ঠীর বাটা দেন, চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করেন। অবশ্য, সর্বত্র সকল সমাজে এই রীতির প্রচলন নাই।

ঝাঁপান—মনসা পূজা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ স্থানে সাপের ওঝাদের বার্ষিক সম্মেলন এবং সাপখেলা প্রদর্শন, গুণীতে গুণীতে প্রতিযোগিতা, ভাসান ইত্যাদি।

ডাঁড়্কা—দেবতার নামে মানত করিয়া শিশুদের হাতে বা পায়ে লোহার বা তামার যে বেড়ি (বালা) পরানো হয় (একাচুরার বেড়ি দ্র)।

ঢেঁকিচুমান-মা, **ঢেঁকিমঙ্গলা**-রাঢ়—গাজন এবং গম্ভীরা উৎসবে, বিবাহ অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে হরিদ্রা, সিন্দূর এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ঢেঁকি বরণের এবং ঢেঁকি পূজার রীতি বাংলার বহু অঞ্চলেই দেখা যায়। গাজনে এবং গম্ভীরায় একজনকে ঢেঁকির উপর বসাইয়া নারদের অভিনয় এবং শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়।

ঢেলাবাঁধা—কোনও কিছু কামনা করিয়া বিভিন্ন দেবতার বা পীরের থানে ঢেলা বাঁধিবার রীতি বাংলার এবং বাংলার বাহিরে সর্বত্র সকল সমাজের মধ্যেই আছে। সাধারণতঃ একখণ্ড নেকড়া কি একগাছা সুতা বা খড় দিয়া মাটির একটি ছোট

ঢেলা বা ইটের একটি টুকরা বাঁধিয়া থানের কোনও বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। সতীমার মন্দির প্রাঙ্গণে (ঘোষপাড়া), রামপ্রসাদের 'সাধনপীঠে (হালিশহর), জয়চণ্ডীর মন্দিরে (কাঁকিনাড়া) এবং অনেক মসীজিদের গরাদেও ঐরূপ ঢেলাবাঁধা দেখা যায়। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে মানতকারী একদিন যাইয়া পূজা বা শিরনি দিয়া আসে। চিনিতে পারিলে আপনার বাঁধা ঢেলাটিও তখন খুলিয়া দেয়।

তুলসীঝারা—চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখের সংক্রান্তি পর্যন্ত তুলসীমঞ্চের উপর একটি সচ্ছিদ্র সতৃণ হাঁড়ি বাঁধিয়া উহাতে প্রতিদিন যে জল-ধারা দেওয়া হয়, তাহাকে কোথাও 'তুলসী ঝারা', কোথাও বা 'তুলসী ধারা' বলা হয়।

তুঁষ-তুষলী—কুমারীব্রত বিশেষ। পৌষমাস ভোর কুমারীরা নূতন ধানের তুঁষ, গোবর, সরিষার ফুল বা মূলার ফুল দিয়া লাড়ু পাকাইয়া, সেই লাড়ুতে হাত রাখিয়া ছড়া বলিয়া এই ব্রত করে। ছড়াগুলির মধ্যে নারীজীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়।

তেজ-দর্পণ—এই ব্রতে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বৈশাখমাস-ভোর ব্রাহ্মণকে তেজপাতা, সুপারি, পৈতা, পয়সা, মিঠি ইত্যাদি দান করা হয়। এই ব্রত করিলে তেজের সহিত স্বামীরঘর করা যায়।

তেলপড়া—সরিষার তেল মন্ত্রপূত করিয়া ভূতপ্রেত বা রোগাদি দূর করিবার প্রক্রিয়া বিশেষ।

দরবেশের সেবা—পূর্ববঙ্গের কোথাও কোথাও এক সময়ে নিম্নকোটি সমাজের মধ্যে 'দরবেশের সেবা' নামে তামাকের এক ব্রত প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ তামাকপায়ী বিধবা স্ত্রীলোকেরাই এই অনুষ্ঠান করিত। কোনও একদিন বিকালে উঠানে কতক জায়গা লেপিয়া পুঁছিয়া সেখানে কোনও দরবেশের উদ্দেশে একাধিক হুঁকা কল্কিতে তামাক সাজাইয়া দিয়া 'কথা' বলা হইত এবং শেষে সকলে মিলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া হুঁকা টানিত।

দাঁতে কুটা করা—বাঁধা অবস্থায় যদি আগুনে পুড়িয়া গোরু মরে তাহা হইলে হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তাহাকে গলায় একটা দড়ি ঝুলাইয়া, মুখে কুটা লইয়া, গোরুর মত শব্দ করিয়া চাউল পয়সা মাগিয়া আনিতে দেখা যায়।

দেইলপাট-ম—শিবের গাজন উপলক্ষে নিমকাঠ কি বেলকাঠ দিয়া বটি'।-এর পাটার মত করিয়া 'দেইলপাট' বা 'পাট' তৈয়ার করা হয়। পাটের মাথায়

দিকে কয়েকটি বঁড়শি ও একটি ত্রিশূল বিদ্ধ করা থাকে। পাটটি নূতন লাল গামছা দিয়া ঢাকিয়া মাথায় করিয়া গীত বাদ্য ও নৃত্য সহকারে মণ্ডপে আনিয়া যথারীতি পূজা করা হয়।" সন্ন্যাসীরা এই পাট মাথায় করিয়া প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী যায় এবং ঢাকের বাদ্য ও নৃত্যসহযোগে শিবদুর্গাবিষয়ক বিবিধ গান গাহিয়া বিস্তর চাউল পয়সা সংগ্রহ করে।

দোয়াত পূজা—সরস্বতী পূজার নামান্তর। বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই মূর্তিতে সরস্বতী পূজা হয়। কোনো কোনো পরিবারে শুধু দোয়াতে পূজা হইতেও দেখা যায়। একাধিক দোয়াত কালিশূন্য করিয়া, উত্তমরূপে ধুইয়া দুধ দিয়া ভরিয়া আসনের উপর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি দোয়াতের মুখে কুল ও পাশে খাগের কলম থাকে।

দোর ধরা—সন্তানকে কোনও দেবতার আশ্রিত করিয়া রাখা। অনেকের বিশ্বাস, দেবতার কৃপা ছাড়া সন্তানলাভ ঘটে না। এজন্য নিঃসন্তান দম্পতিদের কেহ কেহ দেবতার দুয়ারে ধরনা দেয়, মানত করে এবং সন্তান হইলে তাহাকে আরাধিত দেবতার 'দোরধরা' করিয়া রাখে। এইরূপ করিলে নাকি সন্তানের সমস্ত ফাঁড়া কাটিয়া যায় এবং যে-দেবতার (প্রায়ই বাবাঠাকুরের বা পঞ্চানন্দের) দোরধরা, তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন।

ধরনা দেওয়া, ধন্না দেওয়া—কোনও অভীষ্টলাভের জন্য মন্দিরদ্বারে বা কাহারো গৃহদ্বারে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পড়িয়া থাকা। তৎপর্যায়ঃ—হত্যা দেওয়া। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বাবাঠাকুরের (শিব, পঞ্চানন্দ) মন্দির-প্রাঙ্গণে ধরনা বা হত্যা দিতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন পড়িয়া থাকার পর কাহারো কাহারো উপর ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হয় এবং তাঁহারা তদনুরূপ নিয়ম পালন করিয়া নিরাময় হয়,—এইরূপ শুনা যায়।

ধর্মসভা—পাতলা মেঘের উপর সূর্যরশ্মি পড়িয়া সূর্যের চারিদিকে নানা রঙের একটি চক্রের সৃষ্টি হয়। মণ্ডলাকার সেই স্থানকে নিরক্ষর সাধারণ লোক ধর্মসভা বা দেবসভা বলিয়া থাকে। তাহারা সূর্যকে ধর্ম বলিয়া জানে, ধর্ম বলিয়া নমস্কার করে, ধর্মকে সকল কার্যের সাক্ষী রাখে ; ধর্মের নামে উপবাস করিয়া সূর্যের উদ্দেশে নৈবেদ্য দেয়।

মেঘের উপর চন্দ্রকিরণ পড়িয়াও ঐরূপ যে মণ্ডলের সৃষ্টি করে, তাহাকে সাধারণ লোক 'চাঁদের সভা / চাঁদে সভা বসেছে' বলিয়া থাকে।

ধুলবাড়ানো-মে – নূতন হাঁড়ি (রান্নার) ব্যবহার করা।

নজর—দৃষ্টি, মনোযোগ, লক্ষ্য, ভেট, সেলামি ইত্যাদি সাধারণ অর্থ ছাড়াও নজরের একটি বিশেষ অর্থ আছে; তাহা হইতেছে, বিশেষ কোনও ব্যক্তি, অপদেবতা প্রভৃতির কুদৃষ্টি। পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়, 'ঐ লোকটা ভারী নজুরে', 'ঐ লোকটার ভারী নজর লাগে'। কথিত হয়, প্রায় সর্বত্রই এমন দুই একজন কুদৃষ্টিসম্পন্ন লোক আছে (দেবতাদের মধ্যে যেমন শনি), যাহাদের দৃষ্টি সোজাসুজি কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপর পড়িলে উহার কিছু না কিছু বিকৃতি ঘটে ('অরগা' ১৩৯ পৃ দ্র)।

নিশির ডাক—কোয়াট-মে। কথিত হয়, অপদেবতারা নাকি কখনো কখনো গভীর রাত্রিতে নিদ্রিত ব্যক্তিকে তাহার অতি পরিচিত গলায় ডাকে; এই ডাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা একবারমাত্রই উচ্চারিত হয়। এই বিশ্বাস এতই বদ্ধমূল যে, পল্লীগ্রামে রাত্রিতে কেহ অতি পরিচিত ব্যক্তির ডাকেও এক ডাকের মাথায় সাড়া দেয় না, তিন ডাকের পর কথা বলে। অনেকক্ষেত্রে কাহাকেও এক ডাক দিয়া চুপ করিয়া থাকা দোষের মধ্যে গণ্য হয়।

নুন খাওয়া—কাহারো দ্বারা উপকৃত হওয়া সে উপকার যতই সামান্য (নুনের মত) হউক (নুন খাই যার, গুণ গাই তার)। নিমকহারাম—নুন খাইয়াও অর্থাৎ উপকার পাইয়াও যে অপকার করে।

পাঁতানামা-উব—ভর হওয়া। কাহারো দেহে সাময়িকভাবে কোনও দেবতার বা অপদেবতার অধিষ্ঠান হওয়া। যাহার উপর পাঁতানামে বা ভর হয় সে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি ও চীৎকার করিতে থাকে, যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। তখন অনেকে অনেক রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, কেহবা আপনার দুরারোগ্য ব্যাধি কিসে দূর হইবে জানিতে চাহে। আবিষ্ট ব্যক্তি কখনো উত্তর দেয়, কখনো দেয় না। যাহাদের উপর ভর হয়, উত্তরবঙ্গে (জ. কো) তাহাদিগকে বলা হয় 'ধ্যাওধা'।

পানপড়া—এককালে বশীকরণের একটি প্রধান ঔষধরূপে গণ্য হইত। সেকালে পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে দুষ্টপ্রকৃতির যে কেহ ঈপ্সিতজনকে করায়ত্ত করিবার জন্য অনেক সময় বশীকরণ ঔষধাদি প্রয়োগ করিত। পান অতি লোকপ্রিয় এবং পান দিয়া আদর-আপ্যায়নের প্রথা বহুপ্রচলিত বলিয়াই পানের ভিতর ঔষধ পূরিয়া কিংবা পান মন্ত্রপূত করিয়া কাহাকেও খাওয়ানো এবং বশীভূত করা সহজ মনে হইত।

পুঁটুলি বাঁধা—দেবতার নামে মানত করিয়া একটি নেকড়ায় কয়েকটি পয়সা (প্রায়ই পাঁচটি) বাঁধিয়া তুলিয়া রাখা। সাধারণতঃ পরিবারস্থ কেহ দীর্ঘকাল

রোগে ভুগিতে থাকিলে তাহার আরোগ্য কামনায় গৃহকর্ত্রী লৌকিক দেবতার থানে যাইয়া এইরূপ পুঁটুলি বাঁধেন এবং অভীষ্টসিদ্ধ হইলে ঐ পয়সা পূজায় দেন। তৎপর্যায় :—মুদাবাঁধা, আগতোলা।

পেঁচোয় পাওয়া—শিশুদের ধনুষ্টঙ্কার বা খেঁচুনি রোগবিশেষ। লোকবিশ্বাস এই যে, পাঁচু বা পেঁচো নামক এক অপদেবতার আক্রমণ হইতেই নাকি শিশুদের এই রোগ জন্মে। পাঁচু পঞ্চানন্দের সহচর, তাঁহার মূর্তির পার্শ্বে ইহারও এক বিকৃতবদন মূর্তি প্রায়ই দেখা যায়। ইহার আকৃতি প্রকৃতি সম্পর্কে হাওড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলে অনেক ছড়া প্রচলিত আছে ('হাওড়ার লোক-উৎসব' দ্র)।

বাটি চালনা—চোর ধরিবার প্রক্রিয়া বিশেষ। জনশ্রুতি এই যে, গুণীদের মন্ত্রশক্তি বলে বাটি চোরের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়।

বাটি পোঁতা—বৃষ্টি নামানোর প্রক্রিয়া বিশেষ। প্রতিবেশীর বাডী হইতে বাটি চুরি করিয়া আনিয়া যদি কোথাও পুঁতিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বৃষ্টি হয়—'এইরূপ বিশ্বাস।

বারবান মারা-ম—কার্তিক পূজার রাত্রিতে পূজার শেষে ব্রতিনীরা 'বারবান মারা' নামে এক আচার পালন করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে একগাছা পাট কি একগাছা লম্বা দড়ি হাতে লন এবং মশা, মাছি, উলু, ইঁদুর, বাদুড়, পিঁপড়া ইত্যাদি বারটি বানের (শত্রুর) নাম করিয়া উহাতে বারটি গিঁট দেন।

'উলু বান্ধুম উলু বান্ধুম,
এক এক উলু মারে উষা কামানে দাগিয়া।'

—এই ধরনের গানের ভিতর দিয়া 'বার বান মারা' উদ্‌যাপিত হয়।

বারান—বৎসরের যে কোনও নূতন খাদ্যবস্তু আগে গ্রামদেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে গৃহকর্ত্রীর নিজের এবং পরিবারস্থ সকলের গ্রহণ রূপ অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের প্রধান গ্রামদেবতা বনদুর্গা। সেখানে 'বনদুর্গার বারান'ই সমধিক প্রচলিত। নূতন ধানের চিড়া-গুঁড়া, নূতন ফলমূল, কখনো বা নূতনের ভাত-ব্যঞ্জন কলার আগপাতায় করিয়া সেওড়া তলায় কি বটতলায় বনদুর্গার উদ্দেশে দিয়া আসা হয়। সাধারণের বিশ্বাস, বনদুর্গা কাকরূপে এই ভোগ গ্রহণ করেন।

বারের পূজা—শনি ও মঙ্গলবারে লৌকিক দেবতাদের যে পূজা হয়। নিত্য-পূজা—প্রতিদিনের পূজা।

বালু বাঁধা-ম—সন্তান কামনায় নিঃসন্তান দম্পতির বস্ত্রাঞ্চলে গিঁট দিয়া অষ্টমীস্নান (ব্রহ্মপুত্র নদে) এবং স্ত্রীর আঁচলে বালি বাঁধার অনুষ্ঠান।

বেঙের বিবাহ—বৃষ্টি কামনা করিয়া দুইটি বেঙের মধ্যে গ্রামের কুমারীরা বিবাহের যে অভিনয় করে।

ভক্ত, ভক্তা, ভক্ত্যা—গাজন-সন্ন্যাসী; গাজনাদি উপলক্ষে যাহারা সাময়িক ভাবে সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে। সাধারণতঃ উৎসবের কয়দিন ইহারা হবিষ্যান্ন ও ফল ভক্ষণ করে, গলায় মালার মত করিয়া সূত্রগুচ্ছ (উতরি) পরে এবং হাতে বেত রাখে। ইহাদের বালক ভক্তদিগকে 'বালাভক্ত' বলা হয়।
লৌকিক দেবতার পূজকদেরও কোথাও কোথাও 'ভক্ত্যা' বলিতে শুনা যায়।

ভর হওয়া—(পাতা নামা দ্র)।

ভাই ফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অতীব মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান; এই অনুষ্ঠানে ভগিনী ভাইয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাহার কপালে চন্দনাদির ফোঁটা দেয় এবং তাহাকে উপাদেয় আহার্য ইত্যাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করে।

ভাঙ্গন—ইহার সাধারণ অর্থ (১) ধস, নদ্যাদির পাড়ের মাটির স্থানচ্যুতি, (২) বাটা জাতীয় মৎস্য। কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গে 'ভাঙ্গন' বলিতে বুঝায়—গম্ভীরা-উৎসবের বাজেট,—কত টাকা চাঁদা উঠিবে, কত খরচ হইবে, ইত্যাদির আনুমানিক হিসাব।

ভুঁজোন-মুস—অন্নপ্রাশন বিশেষ।

ভুলা পোড়ানি (পোড়ানো)—খড়কুটার একটি মূর্তি পোড়াইয়া গ্রাম হইতে আপদ-বালাই দূর করিবার অনুষ্ঠান বিশেষ। পূর্ব বাংলার বহু অঞ্চলে (ম. ত্রি. ঢা. ফ. ব) কার্তিক সংক্রান্তির সন্ধ্যায় খড়কুটা দিয়া মানুষের মত একটা মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার মাথায় ধূপ, সরিষা, শুকনা পাটপাতা ও কয়েকটা মশা-মাছি রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর একজন সেই জলন্ত মূর্তিটিকে লইয়া চতুর্দিকে দৌড়ায়, আর চীৎকার করিয়া বলে—

'ভালা আইয়ে বুড়া যায়
মশা-মাছির মুখ পোড়া যায়।
দো! দো!! দো!!!'

ঐ সময় আর কয়েকজনও কুলা পিটাইতে পিটাইতে তাহার পিছনে পিছনে ছুটে এবং 'দো দো' বলিতে থাকে। ঐরূপে পথে-প্রান্তরে আনাচে কানাচে অনেকক্ষণ ছুটিয়া দগ্ধপ্রায় মূর্তিটি মাঠে দাঁড় করিয়া রাখা হয়।

মল্লিদোষ—কাহারো সন্তান হইয়া না বাঁচিলে বলা হয়, উহাকে 'মল্লি দোষে পাইয়াছে।'

মাগন, মাঙন—আচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'মাগন' বলিতে বুঝায়, উদ্দিষ্ট অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য পাড়া-পড়শীর বাড়ী হইতে চাল, পয়সা ইত্যাদি মাগিয়া (চাহিয়া) আনা (শীতলার মাগন, কুলের মাগন, বসন্রার মাগন)।

মানত, মানসিক- দেবতার কৃপায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশা করিয়া তাঁহাকে কিছু দিবার সঙ্কল্প। মানত অনুসারে কেহ প্রতিমার চোখ সোনা দিয়া গড়াইয়া দেয়, কেহ বা 'ছলন' দেয়, কেহ বা সাড়ম্বর পূজার ব্যবস্থা করে।

মায়ের দয়া—বসন্ত রোগ। মায়ের দয়া হওয়া—বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া।

মাসীমার দৃষ্টি-ব—অলক্ষীর দৃষ্টি। ইহার ফলে সংসারে সর্বদা খাই খাই, নাই নাই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

মুদাবাঁধা-পব—পুঁটুলি বাঁধা দ্র।

যাচাপান—ব্রত বিশেষ। এই ব্রতে দুই খিলি পান ভালভাবে সাজাইয়া বাপকে খাইতে দিতে হয়।

যাত্রাপাতা—বিজয়া দশমীতে অনুষ্ঠেয় স্ত্রী-আচার বিশেষ। সেদিন গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষপত্র, বাসনকোসন, ধামাকুলা, ডেক্সবাক্স, খাট-আলমারি, অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্রপাতি সমস্ত ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং প্রত্যেকটির গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। গৃহিণীরা সেদিন বহুকালের সঞ্চিত সিঁদুর মাখানো টাকা-গিনি বাহির করেন এবং সেগুলির সঙ্গে আরও দুই চারিটি যোগ করিয়া সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া মধ্যমপালার গোড়ায় অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে সাজাইয়া রাখেন, ধূপদীপ জ্বালেন, সুখ সমৃদ্ধি কামনা করিয়া ভগবতীর উদ্দেশে প্রণাম করেন। এই অনুষ্ঠানকে পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে 'যাত্রাপাতা' বলে। কোথাও কোথাও ইহাতে দুইটি সিন্দূরলিপ্ত পুঁটি মাছও দেওয়া হয়।

রাম—ওজনের ক্ষেত্রে রাম অর্থ এক। ধান্যাদি মাপিবার সময় প্রায়ই এক সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে 'রাম' বা 'লাভ' বলিতে শুনা যায়।

রামরামি—সাক্ষাৎকার ('দুই দলে বাঘে হইল রামরামি'-রায়ম)।

রূপ হলুদ—পশ্চিমবঙ্গের একটি মেয়েলী ব্রতের নাম। এই ব্রতে একজন এয়োকে কপালে হলুদ বাটা ছোঁয়াইয়া মাথা আঁচড়াইয়া ও সিঁদুর পরাইয়া দিতে এবং বিকালে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতে হয়। এই ব্রত করিলে ব্রতিনীর রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।

রোগচলনা—এই কথাটি পল্লীগ্রামে প্রায়ই শুনা যায়। গ্রামে কলেরা কি বসন্ত যখন মহামারীরূপে দেখা দেয়, তখন অনেককে ফকির-ওঝাদের শরণাপন্ন হইতে

দেখা যায়। তাহারা নাকি নানা প্রক্রিয়ার সাহায্যে এক স্থানের রোগ অন্য স্থানে পাচার করিয়া দিতে পারে।

লখীডাক—('চাষ-আবাদ' ১৫৩ পৃঃ দ্র)

লোটন—দেবতার প্রীত্যর্থে 'ভক্ত্যাদের' মাটির উপর গড়াগড়ি।

শনির দৃষ্টি—যখনই কোনো পরিবারে অকারণ নানা বিপৎপাত ঘটে, অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়, সাধুসজ্জন ব্যক্তিও কুরুচি কুনেশায় মত্ত হয়, পদে পদে দুঃখ বিড়ম্বনা ভোগ করে, তখনই সাধারণ লোক সেখানে, সেই ব্যক্তির উপর 'শনির দৃষ্টি' পড়িয়াছে মনে করে। 'শনির দৃষ্টি', 'রন্ধ্রগত শনি', 'কপালে শনি', 'শনির দশা' প্রভৃতি কথাগুলি লোক-সমাজে বহুপ্রচলিত।

শিরনি, শিন্নি—পীরের দরগায় তথা পীরের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি। সত্যনারায়ণের সেবায় বা পূজায় আটা ময়দা দুধ চিনি কলা ইত্যাদির যে মিশ্র-নৈবেদ্য দেওয়া হয়, তাহাকেও শিরনি বলা হয় ('শিন্নি দেইখ্যা আগুয়ায়, কুত্তা দেইখ্যা পাছায়'—প্রবাদ)।

শীতল দেওয়া—দেবতাকে সন্ধ্যাকালীন ভোগ দেওয়া। সাধারণতঃ সন্ধ্যারতির পরই এই ভোগ (শীতল) দেওয়া হয়।

শীতলিয়া রাখা—সধবাদের শাঁখা ইত্যাদি আভরণ সাময়িকভাবে খুলিয়া রাখার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রয়োগ করা হয় ('বাগর্থ'-ভট্টাচার্য দ্র)।

ষাট ষাট—ষষ্ঠীদেবী সন্তানকে রক্ষা করুন, সন্তানের যেন কোনও বিপদ না ঘটে,—এইরূপ কামনাসূচক উক্তি; সন্তানের আপদবালাই নিবারণার্থ ষষ্ঠী-দেবীর নাম উচ্চারণ। সন্তান সম্পর্কে কোনও অমঙ্গলসূচক কথা উচ্চারিত হইলে, বিদেশস্থ সন্তানের নাম হঠাৎ মুখে আসিলে, সন্তান বিষম খাইলে বা হাঁচি দিলে মা অমনি বলিয়া উঠেন, 'ষাট ষাট'। বাংলার বহু অঞ্চলেই ব্রতিনীরা ষষ্ঠীর দূর্বা বা বাঁশের পাতা জলে ডুবাইয়া ঘটে ছিটা দেন এবং বার মাসের বার রকম ষষ্ঠীর নাম বলিয়া পরিবারের সকলের উদ্দেশে 'ষাট, ষাট' বলেন। এখানে পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যষষ্ঠী ব্রতের একটি 'ষাট-মন্ত্র' উল্লেখ করিতেছি :— 'জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট। ফিরে ঘুরে এলো ষাট বার মাসে তের ষাট। ষাট ষাট ষাট॥ ঝি-চাকর, গোরুবাছুর, পশুপাখী, কর্তাছেলে, মেয়েবউ, নাতিনাতনী, ষাট ষাট ষাট॥ ষাট বাঁচানো—সন্তানাদির আপদবালাই নিবারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ করা। ষাট—ষষ্ঠীদেবী। ষষ্টি, ৬০ সংখ্যা।

ষেটের কোলে—ষষ্ঠীদেবীর কৃপায় (ষেটের কোলে বাচার আমার তিন বছর)।

ষেটেরা—সন্তানের জন্মের ষষ্ঠদিন রাত্রিতে জন্মষষ্ঠীর পূজা ইত্যাদি যেসব আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। সে রাত্রিতে নাকি ভাগ্যবিধাতা সন্তানের কপালে তাহার ভাগ্যলিপি লিখিয়া যান। এজন্য তাহার শিয়রে দোয়াতকলমও রাখা হয়।

সহেলা, সয়লা, সইয়ালা—স্ত্রীলোকদের মধ্যে সখিত্ব স্থাপনের উৎসব (সপ্তম অধ্যায়ে সই দ্র)।

সেঁজুতি—ছড়া ও আলপনাপ্রধান একটি কুমারীব্রত। অগ্রহায়ণ মাসভোর প্রত্যহ বিকালে নিকানো উঠানে এই ব্রত করা হয়। পিটুলি দিয়া শিব, কোঁড়া, গুয়াগাছ, অশ্বত্থগাছ, কুলগাছ, পিঁড়ি, সিঁদুর চুপড়ি, ঢেঁকি, গোয়ালঘর ইত্যাদির ৪০-৫০ রকম চিত্র আঁকিয়া, এক একটি চিত্রে দূর্বা ধরিয়া ছড়া বলা হয়। ছড়াগুলির ভিতর দিয়া নারীজীবনের নানা আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা ব্যক্ত হয়।

সত্য সত্য—টিকটিকির শব্দের প্রত্যুক্তি। টিকটিকির ডাক শুনিয়া অনেক বৃদ্ধা মাটিতে টোকা দিয়া বলেন, 'সত্য সত্য।'

হত্যা দেওয়া—(ধরনা দেওয়া দ্র)

হাড়বিষু-পূব—চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনকে বহু অঞ্চলে 'হাড়বিষু' বলা হয়। বৃদ্ধারা বলেন, এইদিন বর্ষাকালীন শাকসবজির বীজ পুঁতিলে হাড়ে হাড়ে ফল ধরে অর্থাৎ পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যায়। এইদিন মেঘ ডাকিলেও নাকি সাপের ডিম বিনষ্ট হয়।

হোলির সঙ—বাংলা দেশের কোথাও কোথাও পঞ্চম দোলের দিন একটি বালককে গাধার টুপি পরাইয়া এবং সর্বাঙ্গে কাদা মাখাইয়া বাড়ী বাড়ী লইয়া যাওয়া হয়। বালক, বৃদ্ধ অনেকেই ইহাতে যোগ দেয় এবং প্রতিবাড়ীর বাহির আঙ্গিনায় জল ঢালিয়া কাদা করিয়া সকলে হোলিগানে মত্ত হয়, কাদা ছড়ায়, কাদায় গড়াগড়ি দেয়। গানগুলি অনেক ক্ষেত্রে শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আদিরসাত্মক হইয়া উঠে। হোলি সম্পর্কিত এইরূপ আচার-আচরণের একনাম 'হোলির সঙ'।
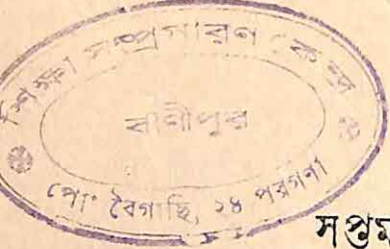
সপ্তম অধ্যায়

নামাবলী

১ সম্বন্ধসূচক

আই, আইমা, আয়ি—মাতামহী। তৎপর্যায়ঃ—বড়ায়ি / বড়াই (বড় আই দ্রুত উচ্চারণে বড়াই), বড়মা, দিদিমা, আজী / আজীমা, আবো (সম্বোধনে আবোগে)-জ. কো. মা. দি. কা. হুহু-ম (প্রায় অপ্রচলিত), নানী-মুস। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে মা, শাশুড়ী এবং পুত্রবধূকেও আই সম্বোধন করা হয়। অসমীয়া ভাষাতেও 'আই' শব্দ মাতৃবাচক। আই—মাতা, ঈশ্বরী, দেবী (বিষহরীআই, বাসলীআই, দুর্গামাই<মা + আই)। আই—আয়ু (অল্লাই, পরমাই)। আই—'আসি' ক্রিয়াপদের অপভ্রংশ। আই আই, আইমা—ছি ছি (আই আই! কি লাজের কথা!)।

বাংলায় 'আই' প্রত্যয়ান্ত অনেক শব্দ আছে; ঐ সকল শব্দে 'আই' ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, বোনাই—বোনের স্বামী; আবার জেঠাই—জেঠার স্ত্রী। কানাই, গণাই, সূর্যাই যথাক্রমে কৃষ্ণ (কান), গণেশ ও সূর্যের আদরসূচক সম্বোধন ('তোমার দেশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে')। ঝাড়াই—ঝাড়ার কাজ। চোরাই—চুরির সহিত সম্বন্ধযুক্ত (চোরাই মাল)। ঢাকাই—ঢাকায় উৎপন্ন (ঢাকাই শাড়ী)।

আইয়া-জ. কো—মা (মাতৃবাচক 'আই' শব্দের রূপভেদ)।

আজা / আজাই / আজু-উব—মাতামহ। **আজী / আজীমা**—মাতামহী।

আনু / আনো-জ. মা—ভগিনীপতি।

আবু / আব্যুয়া-ম—শিশু; শিশুকে সম্বোধন।

আবুইধ্যা (আবুদ্ধিয়া)—অবোধ শিশু।

আঁবুই / আঁবুই মা—মাউই / মাউই মা, ভ্রাতা বা ভগ্নীর শাশুড়ী।

আবো - মাতামহী (আই দ্র)।

ইষ্টি, ইষ্টিকুটুম—আত্মীয়স্বজন।

এই-দচ - স্ত্রীকে স্বামীর সম্বোধন (সম্প্রদায় বিশেষে)। এই-জ—স্বামীকে স্ত্রীর সম্বোধন (রাজবংশীদের মধ্যে)। 'এই' শব্দটির স্থানীয় অর্থ না জানায় অনেক

সময় হাটেবাজারে জিনিষপত্র কিনিতে মেয়েদের 'এই' সম্বোধন করার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।

এয়োঁ - এয়োস্ত্রী, আয়তী, সধবা, আইও / আইয়ো-পূব, ভাতাত্তী-কো. জ। এয়োতি—সধবার লক্ষণ ; ইহা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নপ্রকার। বাঙ্গালী হিন্দুর এয়োতির চিহ্ন—শাঁখা, সিঁদুর, নোয়া।

কন্যা / কইন্যা / কইনা / কনে—পুত্রী, তনয়া, daughter. তৎপর্যায় :— মেয়ে, ঝি, বিটি / বেটী, ছেরী। কুমারী, বালিকা। বিবাহের পাত্রী (কনে দেখা)। নববধূ (বর-কনে এসেছে)। বাড়ীর সকলের ছোট বা নূতন বউ (কনে বউ)। (মেয়ে দ্র)। কন্যাদান—কন্যার বিবাহ দেওয়া ; পণ গ্রহণ না করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান। কন্যাদায়—কন্যার বিবাহ দেওয়া রূপ কঠোর কর্তব্য (কথায় বলে, কন্যাদায় বড় দায়)। কন্যাযাত্র / কন্যাযাত্রী—কন্যাতি, বিবাহ উপলক্ষে কন্যার সহগামী কন্যাপক্ষীয় লোকজন ('কন্যাতি বর‍্যাতি পথে হৈল হুড়াহুড়ি। কন্দল করিয়া পথে নিভাল দেউটী' ।—কে ক্ষেমা)।

কর্তা—গৃহস্বামী, পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, গিরি-উব (Head of the family). কর্তাবাবু / কত্তাবাবু—কর্তাকে চাকর বাকরের বা চাষাভূষার সম্বোধন (বাবু দ্র)।

কাকা–(খুড়া দ্র)। **কুটুম, কুটুম্ব**—আত্মীয়। বাংলায় 'কুটুম' বলিতে সাধারণতঃ শ্বশুরবাড়ীর দিকের আত্মীয়কে বুঝায়। পর্যায় শব্দ :—গুতিয়া / সাগাই-উব, মেমান / খেস-মুস, ইষ্টি / ইষ্টিকুটুম-পূব। বড় কুটুম—বড় শ্যালক।

কুদী-য. ফ. ঢা. টা—খুকী, খুকু (আদরে), নসী-ব. ফ, পুরী-ম (পোলাপুরী), ছেমরী-পূব, মাইও-রং. জ।

কোদা-য. ফ. ঢা. টা—খোকা, খোকন (আদরে), নসু-ব. ফ, ছেমরা-পূব, বোপাই-রং. জ।

খসম-মুস—স্বামী। **খালা**-মুস—মাসী। খালু—মেসো। খালাত ভাই—মাসতুত ভাই।

খুড়া / খুড়ো—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তৎপর্যায় :—কাকা (আদরে কাকু), চাচা-মুস, পুতি-ফ। খুড়ী—খুড়ার পত্নী। তৎপর্যায় :—কাকী, চাচী-মুস, খুড়ন-শ্রী, খুড়াই-জ. কো। খুড়তুত / খুড়তুতো, খুড়ুত, খুড়াত / খুড়াত্ত—খুড়ার বা খুড়-শ্বশুরের সন্তান সম্পর্কে (খুড়তুতো ভাই, খুড়ুত শালী)। খুড়-শ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়া। খুড়-শাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়ী, খুড়াই শাশুড়ী-পূব।

গিন্নী–গৃহিণী, গৃহকর্ত্রী, গিথানী / গিরথানী-উব, গির্থাইন-ম। ভিখারী,

অনাত্মীয় পোষ্য, ঝি-চাকর প্রভৃতির নিকট ইনি 'গিন্নীমা', 'মা-ঠাকরুন', 'মা' এবং বাড়ীর কর্তার নিকট প্রায়ই 'বড় বউ'। গিন্নীপনা—গিন্নীর মত আচরণ, গৃহিণীর কাজ। গিন্নীবান্নী - পাকা গৃহিণী (গিন্নীবান্নী মা আমার)।

গুরু—কুলগুরু, দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু। গুরুজন—পূজনীয় ব্যক্তি। গুরুকুল—গুরুর বংশ। গুরুর গৃহ। গুরুভাই—একই গুরুর শিষ্য। গুরুমা—গুরুপত্নী। হিন্দুর সমাজ ও ধর্মজীবনে গুরুর স্থান অতি উচ্চে। গুরুবাদ—গুরুর কৃপা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না, এইরূপ মতবাদ। গুরুরদশা—মাতা বা পিতার বিয়োগ জনিত অবস্থা।

ছেলে—বালক (স্কুলের ছেলে)। যুবক (এম. এ. ক্লাসের ছেলে)। পুত্র (রামবাবুর পাঁচ ছেলে)। বিবাহের পাত্র (ছেলে দেখা)। ছেলেমানুষ—অল্প বয়স্ক বালক কি বালিকা ('খুকি তোমার ভারি ছেলেমানুষ'-র)। পুত্র বা বালক অর্থে ছেলের আঞ্চলিক প্রতিরূপ ও প্রতিশব্দ অনেক : ছালিয়া, ছাইলা, ছেলিয়া, ছেইলা, ছাওয়া, ছাওয়াল, ছেরা, ছেমরা, ছোকরা, ছোঁড়া, পোলা, পোয়া, খোকা, কোদা, নসু। ছেলেপিলে,-পুলে,-পেলে—ছোট ছেলেমেয়ে। তৎপর্যায় :—ছালপাল, পোলাপান, পোলাপুরী, খোকাখুকী, কোদাকুদী, বায়াবায়ানি, চেংড়া-ফেংড়া, আণ্ডাবাচ্চা, আবোধঅবোধ / আবুদুবুধ। ছাইলান-পূব—ছাইলা তথা ছেলের বহুবচন, ছেরাইন, পোলাইন।

জা, যা [সং যাতা]—স্বামীর ভ্রাতার পত্নী। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে জা-এর স্থলে 'জাল' ও 'জাক' এবং জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলে 'জাও' শব্দের প্রয়োগ শুনা যায় (ইনি আমার বড় জাল-ম ; ইনি আমার জাও-জ)। সম্বোধনে বড় জাকে প্রায়ই দিদি, আপা-মে, বাই-জ. কো. দি এবং ছোট জাকে নাম ধরিয়া, কখনো বা 'অমুকের মা' বলিয়া ডাকা হয়।

জামাই, জামাতা [সং জামাতৃক, হি দামাদ, ইং son-in-law] - জাঁঅই / জায়োই-জ. কো. মা. দি, কন্যার স্বামী। শ্বশুর শাশুড়ীর নিকট জামাতা—জামাতা বাবাজী, বাবাজীবন। ছোট শালাশালীর নিকট জামাইবাবু। জামাই ঠকানো—শ্বশুরবাড়ীতে নূতন জামাইকে শালাশালীদের ঠাট্টাচাতুরীর ভিতর দিয়া নানাভাবে জব্দ করিবার চিরাচরিত প্রথা। জামাইষষ্ঠী—অরণ্য ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠের শুক্লাষষ্ঠীতে কন্যা ও জামাতার কল্যাণ কামনা করিয়া যে অনুষ্ঠান করা হয়। বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে এই অনুষ্ঠানে জামাতাকে তত্ত্বাদি পাঠাইবার এবং ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিবার রীতি আছে। ঘর জামাই—যে জামাতা স্থায়ীভাবে

শ্বশুরগৃহে বাস করে। আদিবাসী সমাজেই ঘরজামাই প্রথা অধিক প্রচলিত; উচ্চকোটি সমাজে শ্বশুরান্নে প্রতিপালিত জামাতাকে কেহই খুব সুনজরে দেখে না। 'করিয়া শ্যালক সেবা শ্বশুরান্নে থাকে যেবা, তাহার জীবনে থাক ধিক্'।—রারচ। অন্য জামাতার প্রতিও অনেক ছড়ায় কথায় যেন একটা বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ পায়। যেমন, 'যম, জামাই, ভাগিনা, তিন নয় আপনা।' 'আশি টেহার খাসি দিলাম, নব্বই টেহার ভইষ। তেও ত জামাই খায় না, বিদায় দিলে যায় না'-ম।

জেঠা—জ্যেষ্ঠতাত, পিতার বড় ভাই, জেঠো-জ. কো. রং (সম্বোধনে জেঠামশায়, বড় জেঠো, ম্যাসকিলা জেঠো ইত্যাদি)।

জেঠার পত্নী—জেঠী, জেঠাই-উব, জেঠন-শ্রী, জেঠুই-বী (সম্বোধনে জেঠীমা, জেঠাই মা)। জেঠতুতো, জাটতুতা, জেঠাত, জেঠাত্ত—জেঠার অথবা জেঠশ্বশুরের সন্তান এই সম্পর্কে (জেঠতুতো ভাই, জেঠতুতো শালী)।

জেঠ শ্বশুর—স্বামীর পক্ষে পত্নীর জেঠা এবং স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর জেঠা। জেঠ শাশুড়ী-পব, জেঠাই শাশুড়ী-পূব, জেঠশুশ-দি—জেঠশ্বশুরের স্ত্রী।

জেওয়াস-পূব—স্ত্রীর বড়বোন, বড়শালী-ক, জেইঠানী / জেঠানী-উব, জেশাহু (উত্তর আসাম)। বড়শালীকে বহু অঞ্চলে দিদি বলিয়া এবং ছোটশালীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।

ঝি—কন্যা (ঝি-জামাই)। চাকরানী (ঠিকা ঝি, ঝি-চাকর)।

ঝিয়ারী—মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুহিতা অর্থে ঝিয়ারী, ঝিউড়ী শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে জামাতার ভগিনীকে 'ঝিয়ারী' এবং জামাতার ভ্রাতাকে 'পুত্রা' বলা হয়।

ঠাকুর—দেবতা। দেবতার মূর্তি (ঠাকুর বিসর্জন)। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত। সংসার-সমাজের পূজনীয় ব্যক্তি (পিতাঠাকুর, ভাশুরঠাকুর)। পদবী। পাচক, পাচক ব্রাহ্মণ, cook,

বাঙ্গালীর সমাজে পূজনীয় এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অনেকেই ঠাকুর। যেমন, পিতাঠাকুর, শ্বশুরঠাকুর, ভাশুরঠাকুর। পিতামহ—ঠাকুরদাদা, আবার পিতামহীও ঠাকুরমা। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে সকলের বড় ভাই, কাকা, মামা এবং দিদিও যথাক্রমে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরকাকা, ঠাকুরমামা, ঠাকুরদিদি। কল্যাণীয় দেবরও ঠাকুরপো, ঠাকুরকুমার। ননদ—ঠাকুরঝি, ঠাকুরকন্যা। নন্দাই—ঠাকুর জামাই। যেমন ঠাকুর, তেমনই ঠাকুরাণীও (যাহার প্রতিরূপ ঠাকরুন, ঠাকরন, ঠাকরান,

ঠাকুরান, ঠাকুরন, ঠাউকরাইন, ঠাইগ্‌রাইন, ঠাইরন, ঠান) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, হৃদ্যতা বা মর্যাদা জ্ঞাপক। মা, শাশুড়ী, বউদিদি, গৃহকর্ত্রী, মাতৃতুল্যা নারী, ভদ্রমহিলা—ইহারা সকলেই ঠাকুরাণী। যেমন, মা—মাতাঠাকুরাণী ; গৃহকর্ত্রী—মা ঠাকরুন ; বউদিদি—বউঠান, বৌঠাকরুন ; বড় জা–ঠানদি। পাড়ার বয়স্কা অনাত্মীয়া মহিলাকেও প্রায়ই ঠানদি ডাকা হয়।

ঠাকুরদাদা / ঠাকুরদা—পিতামহ ; পিতামহকে সম্বোধন। তৎপর্যায় :—ঠাকুর-বাবা, দাদামশায় (-মশাই), দাদাবাবু, দাদু, বুড়া বাপু / আজু-রং, বড় বাপু / আজ্জা / দাদো-জ. কো, আজাই-বগু, নানা-মুস। (ঠাকুর দ্র)।

ঠাকুরমা / ঠাকুমা—পিতামহী, বড় মা-জ. কো, দাদী-মুস। পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো সমাজে 'ঠুঠু / ঠাকুর-ঠু' ডাকও শুনা যায়।

ঠাকুরাণী, ঠানদি—(ঠাকুর দ্র)।

তাউই-ক, **তালুই**-চ [সং তাতগু]—ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুর ; পিতার মিত্র বা মাতার সখীর স্বামী (সইয়া) বা তৎতুল্য ব্যক্তি। তৎপর্যায় :—তাঐ / তালই-পূব. ত্রি. চট্ট, তাহই-উব। তাউইর পত্নী—মাউই-রাঢ়, মাঐ-পূব, মাহই-উব, আঁবুই / আঁবুই মা-ক।

দাদা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (বড়দা, ঠাকুরদা—সকলের বড়, মাইতোদা-বী. মু—দ্বিতীয়, নদা / লদা—তৃতীয়, সেজদা—চতুর্থ, ফুলদা—পঞ্চম, ছোড়দা—সকলের ছোট)। অনেক সময় দাদাদের কাহাকেও 'ভাইটি' বলিতেও শুনা যায়। স্বামীর দাদা এবং স্ত্রীর দাদাকেও বর্তমানে 'দাদা' ডাকা হয়। দাদা, দাদামহাশয় / মশায়, দাদাবাবু, দাদু—পিতামহ বা মাতামহ (ঠাকুরদাদা দ্র)। দাদা / দাদাভাই—নাতিকে বা তৎতুল্যকে স্নেহ সম্বোধন। অনাত্মীয় সমবয়স্ক বা বয়োজ্যেষ্ঠকেও অনেক সময় দাদা বলিয়া সম্বোধন করা হয়। দাদাঠাকুর—বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তিকে, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রায়ই দাদাঠাকুর / ঠাকুরদা / ঠাউরদা সম্বোধন করা হয় (ভাই দ্র)।

দিদি—জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে সম্বোধন (বড়দি, মেজদি, নদি, সেজদি)। বড় জা, বড় ননদ, সখী, সখীস্থানীয়া প্রতিবেশিনী, বড় শালী এবং তৎতুল্যাদেরও দিদি ডাকা হয়। দিদি ঠাকরুন, দিদিমণি—মনিব কন্যাকে সম্বোধন। নাতিন এবং দিদিমাকেও দিদিমণি ডাকিতে শুনা যায়। বর্তমানে শিক্ষিকাকেও ছাত্রীরা দিদিমণি সম্বোধন করে। (বোন দ্র)।

দিদিমা—মাতামহী (আই দ্র)।

দেবর—স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দেওর, দেওরা-মে, দেওরিয়া-ম (আদরে)। ঠাকুরপো, ঠাকুরকুমার, ছোটজন / ছোট মিঁয়া-মুস—দেওরকে সম্বোধন।

ননদ [সং ননন্দা, নন্দা]—স্বামীর ভগিনী, ননদী-উব, ননন-শ্রী, ননদিনী (প্রায়ই পদ্যে)। ময়মনসিংহে স্বামীর বড় ভগিনীকে 'ননাস' বলা হয়। (দিদি দ্র)। ননদের স্বামী—নন্দাই, নন্দু-মা। বড় ননদের স্বামী—জেঠপোইত-জ. কো. দি; ছোট ননদের স্বামী—শালপোইত-জ. কো. দি। ঠাকুরঝি ও ঠাকুরজামাই যথাক্রমে ননদ ও নন্দাইকে সম্বোধন।

নাতি [সং নপ্তা ইং grandson]- পৌত্র বা দৌহিত্র।

নাতিনী / নাতনী [সং নপ্ত্রী, ইং grand-daughter]—পৌত্রী বা দৌহিত্রী; তৎপর্যায়:- নাতিন, নাতন-শ্রী। নাতির স্ত্রী—নাত বউ। নাতনীর স্বামী—নাত জামাই।

পিতা—বাবা, বাপ, বাপো, বাজী / বাজান / বাপজান / আব্বা / আব্বাজান-মুস।

পিতামহ—(ঠাকুরদাদা দ্র)। **পিতামহী**—(ঠাকুরমা দ্র)।

পিসা / পিসে—পিসীর স্বামী, পিয়া-শ্রী, ফুফা-মুস।

পিসী, পিসি [সং পিতৃস্বসা]—পিতার ভগিনী, পিসাই-কো. জ. দি. মা, পি-শ্রী, ফুফু / ঝিমা-মুস। পিসতুত / পিসতুতো-ক, পিসাত / পিসাত্ত-পূব—পিসীর বা পিস্‌শাশুড়ীর সন্তান এই সম্পর্কে (পিস্‌তুতো ভাই, পিস্‌তুতো দেবর, পিস্‌তুতো শালা)। পিসশ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা। পিসশাশুড়ী, পিসাই শাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসী;

পুত্র—ছেলে, son. তৎপর্যায়:—পুত, পো (ঘোষের পো), পোলা, পুইলা, পোয়া, বেটা। **পুত্রা**-পূব—জামাতার ভাই (ঝিয়ারী দ্র)।

পুত্রবধু—(বউ দ্র)।

পুরী-পূব—খুকী। পোলাপুরী—ছোট ছেলেমেয়ে। পুরী—ভবন (রাজপুরী) নগরী (অলকাপুরী)। শ্রীক্ষেত্র। খাদ্যদ্রব্য (লুচিপুরী)।

পুরোহিত—যজমানের কল্যাণার্থ তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি করেন, priest. পুরুত-ক, পুরুইত / পুরুইত ঠাকুর-পূব, ঠাকুর মশায় (ঠাকুর দ্র)।

বউ, বৌ [সং বধূ]—পুত্রবধূ, daughter-in-law. নববধূ—বউড়া, বোয়ারী-কো, নদারী-মা (বউ দেখা)। কুলবধূ (মিত্র বউ)। পত্নী ('দরবারে হেরে ঘরে এসে বউ ঠেঙানো'-প্র)। বড় বউ—জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী। অনেক পরিবারে বৃদ্ধ গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রীকে 'বড় বউ' সম্বোধন করেন। উত্তরবঙ্গে

(জ. কো. দি. পু) সাধারণতঃ বউকে 'বহু' এবং ছেলের বউকে 'বেটার-বহু' বলা হয়। বউমা—পুত্রবধূকে স্নেহ সম্বোধন। বউভাত—পাকস্পর্শ, বিবাহের পর স্বামীগৃহে নববধূর প্রথম পাকস্পর্শ এবং সেই স্পৃষ্ট অন্ন জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বরের পাতে পরিবেশন-অনুষ্ঠান; বিবাহের পর বরের বাড়ীর প্রীতিভোজ। বউয়া—স্ত্রৈণ। বউ কাঁটকী—যে শাশুড়ী বউকে পীড়ন করে।

বউদিদি, বউদি, বৌদি—বড় ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাহাকে ছোট ভাইবোনদের সম্বোধন। অনেক রক্ষণশীল পরিবারে বৌ ঠাকুরাণী (বৌ ঠাকরুন, বৌ-ঠাকরান, বৌঠান সম্বোধনও শুনা যায়)। পর্যায়শব্দ :—ভাজ (ভাজ দ্র), ভদি-মা. পু, ভাবী-মুস, ভানী-মা।

বন্ধু—মিত্র, মিতা, সুহৃদ্, দোস্ত / দোস্ত-মুস। বন্ধুর স্ত্রী বা স্ত্রীবন্ধু—বন্ধানী-ঢা. ফ. ব. বন্ধাইন-ম। বন্ধুতা, বন্ধুত্ব—মিত্রতা, দোস্তী, ভাইয়াপ্ত-ম, ভাইয়াপ-ত্রি, ভাইয়াল।

বর—[হি দুলহা, ইং bridegroom]—বিবাহের পাত্র, যে সদ্য বিবাহ করিয়াছে বা বিবাহ করিতে যাইতেছে (বরকনে)। স্বামী (খেঁদীর বর এসেছে)। মিতবর-কো. রং—বরের মিত্র। 'মিত্রাভিষেক' অনুষ্ঠানে বধূর অভিষেক ক্রিয়ায় ইহার ডাক পড়ে। গাঙ্গেয় অঞ্চলে বরের সহগামী অল্পবয়স্ক কোনও বালককে (ভ্রাতৃস্থানীয়) 'মিতবর' বলা হয়। (আচার-অনুষ্ঠান দ্র)।

বরধনা-জ. কো—রাজবংশীদের মধ্যে 'বর্‌ধনা' শব্দটি দ্ব্যর্থক; ইহার একটি অর্থ ভাশুর, অপর অর্থ বড়শালা।

বাই-কো. জ. কা—দিদি, বড় জা এবং বড় ননদ অর্থে বহু প্রচলিত। বাই—বাইজী। স্ত্রীলোকের উপাধি (মীরাবাঈ)। বায়ুরোগ। বাতিক (শুচিবাই)। সখ, নেশা (টিকিট জমানোর বাই)।

বাপ—বাবা। পুত্র বা পুত্রস্থানীয়কে স্নেহসম্বোধন।

বাবা—পিতা। পিতাকে বা আদর করিয়া পুত্রকে সম্বোধন। শিব, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি অনেক রোগাপহারী দেবতাকেও বাবা বলা হয় (বাবার দোরে হত্যা দেওয়া, বাবা বৈদ্যনাথ)। সাধুসন্ন্যাসীরাও 'বাবা'র সম্মান পাইয়া থাকেন (সাধুবাবা, পাগল বাবা)। **বাবাজী**—বৈষ্ণবসাধু (সন্তদাস বাবাজী)। পুত্র বা পুত্রস্থানীয়দের সম্পর্কে স্নেহসূচক উক্তি (জামাতাবাবাজী)। বিবাহাদি-নিমন্ত্রণ চিঠিতে কখনো কখনো পাত্রের নামের পরে বা আগে **'বাবাজীবন'** লেখা হয় ('আমার পুত্র অমুক বাবাজীবনের সহিত...)।

বাবু—কাহারো নামের পর প্রযোজ্য সম্মানসূচক ব্যবহৃতি (কাকাবাবু, ডাক্তারবাবু, হরিবাবু)। ভদ্রলোক; ভদ্রলোককে সাধারণ লোকের সম্বোধন (এখন টাইম কত বাবু? এত সস্তায় পাবেন না বাবু)। চাকরবাকরের নিকট বাড়ীর কর্তা বা কর্তার ভাই, ছেলে প্রভৃতি (কর্তাবাবু, মেজবাবু, ছোটবাবু, খোকাবাবু)। বড়বাবু (অফিসের)—কেরানীদের প্রধান, head clerk. বাবু—বিলাসী, সৌখিন। বাবুগিরি, বাবুয়ানা, বাবুয়ানি—বিলাসিতা, বাবুসুলভ কার্য।

বাবুকালচার—এককালে কলিকাতার উচ্চকোটি সমাজের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে এই নামে অভিহিত করা হইত। বাঙ্গালী সমাজে এখনো ইহার রেওয়াজ রহিয়াছে।

বিধবা—পতিহীনা, বিধুয়া-মা, রাড়ি-পূব, আড়ি-জ. কো. রং. মা বেওয়া-মুস, widow.

বেটা—পুত্র (তোমার বেটাকে ডাক। 'বাপের বেটা')। পুরুষ, আদমী (বেটার মত কথা বলিস্)। অবজ্ঞাসূচক ডাক (পাজি বেটা-ক, কিরে বেডা-পূব)। বেটা ছেলে—পুরুষ মানুষ (তুমি বেটাছেলে নও? এত ভয় কিসের?)। অনেক সময় গালি অর্থে বেটাচ্ছেলে প্রয়োগ করা হয় (বেটাচ্ছেলে কোথাকার)। বেটার স্ত্রীলিঙ্গে—বেটী, বিটি। বহুবচনে—বেটাইন / বেডাইন-পূব।

বেহাই—বৈবাহিক, পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর (আপন শ্বশুর, জেঠ-, খুড়-, মাস-, পিস-, মামা-)। তৎপর্যায়ঃ—বেয়াই-ক, বিয়াই-পূব, বিয়ৈ-রং. জ. কো, বিহাই-মা. দি।

বেহান—বৈবাহিকা, পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী (আপন শাশুড়ী, জেঠ-, খুড়-, মাস-, পিস-, মামী-)। তৎপর্যায়ঃ—বেয়ান-ক, বিয়াইন, বেহাইন, বেহানী / বিয়নী-রং. কো. জ. মা।

বোন [হি বহিন, ইং sister]—ভগিনী, সহোদরা বা তত্তুল্যা। পর্যায় শব্দঃ—বোহিন-দি. মা. জ. কো, ভইন / বোইন-পূব. শ্রী, ভনী (কামরূপ)। বাংলায় প্রায়ই কনিষ্ঠা ভগিনীকে 'বোন' বলে এবং নাম ধরিয়া ডাকে; জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে দিদি, বোনদি, বাই, বুবু / বু বলা হয়। নারীর পক্ষে ভগিনীর পুত্র—বোনপো এবং ভগিনীর কন্যা—বোনঝি। পুরুষের পক্ষে—বোনপো ও বোনঝি যথাক্রমে ভাগিনা / ভাগনে ও ভাগনী।

বোনাই—ভগিনীপতি। তৎপর্যায়ঃ—বোহনাই / বোইনা / বোনু-জ. কো, বনো-ত্রি, ভিনসি-কো। বোইন জামাই-পূব / বোইন জাঁঅই-জ. কো (ছোট

বোনের স্বামী)। প্রায়ই বড়বোনের স্বামীকে দাদা, জামাইবাবু, ভাইসাব (ভাইসাহেব)-মুস এবং ছোট বোনের স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়।
ভগিনী—(বোন ও দিদি দ্র)। **ভগিনীপতি**—(বোনাই দ্র)।
ভাই—ভ্রাতা, সহোদর বা সোদরভাই, brother ; সৎভাই, step brother ; জেঠা খুড়া প্রভৃতির পুত্র সম্পর্কে ভাই (জেঠতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতুতো), cousin brother. বাংলায় সাধারণতঃ কনিষ্ঠভ্রাতা, বন্ধু, অনাত্মীয় সমবয়স্ক বা বয়ঃকনিষ্ঠ, নাতি প্রভৃতিকে ভাই সম্বোধন করা হয়। মেয়েরাও মেয়ে বন্ধুকে, অন্যছাত্রীকে প্রায়ই ভাই বলে। অনেক বক্তার নিকট স্বদেশবাসী শ্রোতৃমণ্ডলীও 'ভাইসব'। কোনো কোনো সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও ভাই ডাকিতে শুনা যায়। ভাই বেরাদার / ভাই বেরাদর - ভ্রাতা ও তত্তুল্য ব্যক্তিগণ, brethren.
ভাইঝি - ভ্রাতুষ্পুত্রী। তৎপর্যায়ঃ - ভাইবেটী, ভাইস্তী-ম, ভাতিজী-উব।
ভাইপো - ভ্রাতুষ্পুত্র। তৎপর্যায়ঃ - ভাইবেটা-ব. ফ, ভাইস্তা-ম, ভাজিঁতা-জ-কো, ভাতিজ্যা-পা। রাঢ় অঞ্চলে ঠকানো অর্থে 'ভাইপো সাজানো' কথাটি প্রায়ই শুনা যায়।
ভাইরাভাই, ভায়রাভাই - স্ত্রীর ভগিনীপতি, শ্যালিকার স্বামী। সাঁড়ুভাই-বাঁ, সারুভাই-কো। প্রায়ই বড় শালীর স্বামীকে দাদা এবং ছোট শালীর স্বামীকে নাম ধরিয়া ডাকা হয়। **ভাউই**—(ভাদ্রবধূ দ্র)।
ভাগিনা / ভাগনে / ভাইগনা—ভাগিনেয়। স্ত্রী. ভাগিনী / ভাগনী—(বোনঝি ও বোনপো দ্র)। **ভাইস্তা**—(ভাইপো দ্র)।
ভাজ [সং ভ্রাতৃজায়া]—ভ্রাতার স্ত্রী। তৎপর্যায়ঃ—ভাইজ-বাঁ.বী, ভাউজ-পূব, ভাউজী-দি. মা, ভোইজী-কো, ভোজী-পু। (বউদিদি দ্র)। ভাজের ভাই—ভালাত্ ভাই-চট্ট।
ভাতার—ভর্তা, স্বামী। শব্দটি প্রায়ই অবজ্ঞাচ্ছলে প্রযুক্ত হয় (মাগ-ভাতার)। ভাতারী, ভাতাত্তী-জ. কো—যাহার স্বামী বর্তমান, সধবা।
ভাতিজা—(ভাইপো দ্র)। ভাতিজী—(ভাইঝি দ্র)।
ভাদ্রবধূ / ভাদ্দরবউ—ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। তৎপর্যায়ঃ—ভাউই-বী, বুয়াসিন-রাঢ়, ভাউসানী-জ. কো, বৌয়াসিনী-ফ. ব।
ভাশুর—স্বামীর বড় ভাই। ভাউর-শ্রী. ত্রি, ভোশুর / বরধনা-জ. কো. রং, (ভটঠাকুর)। ভাউরুকর-শ্রী—ভাশুরপো। ভাশুরভাদ্রবধূ সম্পর্ক—দুইজনের

মধ্যে এরূপ মনোমালিন্য ঘটিয়াছে যে, একজন আর একজনের মুখ পর্যন্ত দেখে না। রক্ষণশীল সমাজে এককালে ভাশুরের সঙ্গে ভাদ্রবধূর সরাসরি কথা না বলা, ভাশুরের মুখ না দেখা, নাম না বলা,—ইহাই রীতি ছিল। বর্তমানে ইহার কড়াকড়ি হ্রাস পাইয়াছে, শিক্ষিত পরিবারে একেবারে উঠিয়াই গিয়াছে এবং ভাশুরকে দাদা ডাকার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

মা—মাতা, ইং mother. তৎপর্যায়ঃ—মাও ('মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল'—মৈগী), মাই (মাইয়া), মাওজান / আম্মা-মুস, আই / আইয়া-জ. কো (আই দ্র)। বাঙ্গালীর সমাজে মায়ের স্থান ও সম্মান সকলের উপরে। একটি বহু প্রচলিত ছড়াঃ 'মাসী বল পিসী বল মায়ের সমান নাই। চিড়া বল মুড়ি বল ভাতের সমান নাই।' আত্মীয়তাসূচক অনেক শব্দের সঙ্গে 'মা' যুক্ত হইয়া সেই সকল শব্দকে আরও হৃদ্য ও শুচিমণ্ডিত করিয়া তোলে। যেমন, কাকীমা, জেঠাইমা, মাসীমা, পিসীমা, মামীমা, ঠাকুরমা, দিদিমা, বউমা। বাঙ্গালী তাহার কন্যা, কন্যাস্থানীয় এবং অনাত্মীয়াকেও 'মা,' 'মাই' সম্বোধন করে। হাটে বাজারে পণ্যবিক্রেতা অপরিচিতা রমণীদেরও 'মা'এর সম্মান দেওয়া হয়। দিনাজপুর মালদহে তাহাদিগকে প্রায়ই 'হাঁ মাই' বলিয়া ডাকা হয়। শুধু সমাজেই নহে, বাঙ্গালীর ধর্মেও মাতৃ-দেবতারই প্রাধান্য, মাতৃপূজাই তাহার শ্রেষ্ঠ পূজা। দুর্গা, কালী, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী সকলেই তাহার 'মা'।

মাউই, মাঐ—(তাউই দ্র)। **মাউগ, মাগ**—(স্ত্রী দ্র)।

মাতামহ—(ঠাকুরদাদা দ্র)। সাধারণতঃ ঠাকুরদাদার সমনামগুলিই মাতামহের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়।

মাতামহী—মায়ের মা। (আই দ্র)।

মামা—মা-এর ভাই, মাতুল, ইং maternal uncle. মামু—মামা (মামাকে আদরসূচক সম্বোধন)। মামু কথাটি মুসলমান সমাজেই বেশী শুনা যায়। আত্মীয় হিসাবে মামার স্থান এবং সম্মান অতি উচ্চে। বিবাহাদি ব্যাপারে মামার বংশ, বংশ-মর্যাদা ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। অনেক সমাজে মামার অনুমতি ছাড়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইতে পারে না এবং মামাই শ্রেষ্ঠ সম্প্রদাতা বলিয়া গণ্য হয়। 'মামার সমান কুটুম নাই', 'ধানের মধ্যে থামা, কুটুমের মধ্যে মামা', 'মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নাই সেখানে', 'নাই মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল', 'মামার জয়েই জয়', 'মামার ভাতে আছি', 'মামাবাড়ির আব্দার' ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য এবং—

'তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই
মামা বাড়ি ভারি মজা
কিল চাপ্পড় নাই।'

ইত্যাদি ছড়া মামার সঙ্গে ভাগিনেয় ভাগিনেয়ীদের নিবিড় সম্পর্কের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য, বিরূপ মন্তব্যও আছে :—'মামা শালা যে সংসারে, সে সংসার যায় ছারেখারে।'

"কুঞ্জরে দেশ নাশায় গ্রাম নাশায় ঘোটকে
শ্যালকে গৃহ নাশায় সর্বনাশায় মাতুলে।"
—প্রচলিত ছড়া-পব

মামাতুতো, মামাতো, মামাত্ত [হি মামেরা]—মামার পুত্র বা কন্যা সম্পর্কে (—ভাই,—বোন)। মামাশ্বশুর এবং মামীশাশুড়ী—স্বামীর বা স্ত্রীর যথাক্রমে মামা এবং মামী।

মামী, মামি—মামার স্ত্রী, মাতুলানী। কিন্তু মাতৃস্থানীয়া হইলেও অনেক সমাজে ভাগিনারা অনেক সময় ঠাট্টার সুরে কথা বলে।

মাসী, মাসি—[সং মাতৃস্বসা]—মাতার ভগিনী। তৎপর্যায় :—মাসী / মাউসী-পূব. উব, মসী / মই-শ্রী, খালা-মুস। মাসতুতো, মাইসাত-ঢা. টা, মসাত / মসাত্ত-পূব।

মিতা / মিতে—মিত্র। এক বন্ধুর প্রতি আর এক বন্ধুর সম্বোধন। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিতালি না করিয়াও যদি দুই ব্যক্তির একই নাম হয়, তবে একজন আর একজনকে 'মিতা' বলিয়া সম্বোধন করে।

মিতিনী, মিতাইন-ম – মিতার স্ত্রী। মিতিন—স্ত্রী বন্ধু ; মেয়েদের পাতানো সখী।

মিঞা, মিঁয়া—মহাশয়, বাবু, মুসলমান ভদ্রলোককে সম্বোধন। বড় মিঞা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তত্তুল্য মুসলমান ভদ্রলোক।

মেয়ে—কন্যা, পুত্রী, ইং daughter. বালিকা, girl. বিবাহের পাত্রী (মেয়ে দেখা)। স্ত্রীলোক (মেয়ে মানুষ)। কোচবিহার অঞ্চলে বয়সে ছোট স্ত্রীলোককে 'মাই', খুকীকে 'মাইও' এবং রংপুর ও জলপাইগুড়িতে স্ত্রীকে 'মাইয়া' (wife) এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় 'মেয়্যা' ('অভাগার ঘরে আইস্তে অলক্ষণা মেয়্যা। শয়েকের পারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা॥'—রারচ) বলা হয়। পণ্যবিক্রেতা সাধারণ স্ত্রীলোককেও পশ্চিম বঙ্গের বহু অঞ্চলে 'মেসে' সম্বোধন করা হয়।

মেসো—মাসীর স্বামী। তৎপর্যায়ঃ—মাউসা-ফ. ব, মউসা-ম. ঢা, মউয়া-শ্রী, খালু-মুস।

শালা [সং শ্যালক, হি সালা, ইং brother-in-law]—পত্নীর ভ্রাতা। পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে স্ত্রীর বড় ভাইকে সম্বন্ধী (সুম্মুন্দী, সুমুন্দী, হুমুন্দী) এবং ছোট ভাইকে 'শালা' বলা হয়। কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে স্ত্রীর বড় ভাই —সইকাত / বরধনা এবং বাংলার অপর বহু অঞ্চলে 'বড় শালা', 'বড়-কুটুম', 'বড় গিঁরি'-মুস। শালার পত্নী—শালাজ।

শালী [সং শ্যালিকা, হি সালী, ইং sister-in-law]—পত্নীর ভগিনী। পূর্ব বঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলে স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে 'জেওয়াস' এবং উত্তর বঙ্গে (রাজবংশীদের মধ্যে) জেইঠানী / জেঠানী এবং কনিষ্ঠা ভগিনীকে 'শালী' বলা হয়। (জেওয়াস দ্র)। শালা শালী কথা দুইটি যেমন আনন্দজনক, তেমনই অসন্তোষ জনকও বটে। আত্মীয়তার বাহিরে কাহারো প্রতি শালাশালী উক্তি প্রায়ই গালিরূপে গণ্য হয়।

শাশুড়ী [সং শ্বশ্রূ, হি সাস্, ইং mother-in-law]—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতা। শাউড়ী, হাউরী, হউরী, হরী—শাশুড়ী শব্দের আঞ্চলিক রূপভেদ। শাশুড়ীকে বাংলার প্রায় সর্বত্রই 'মা' সম্বোধন করা হয়। দূর পল্লীগ্রামে প্রৌঢ়া বধূদের মুখে ঠাকুরাণী / ঠাকরুন / ঠাউকরাইন / ঠাইগরাইন / ঠাইরন সম্বোধনগুলিও শুনা যায়।

শিশু—অতি অল্প বয়সের বালক বা বালিকা, ইং child (কুদী ও কোদা দ্র)।

শ্বশুর—[হি সসুর, ইং father-in-law]—স্বামীর বা স্ত্রীর পিতা। শউর, শাউর, হাউর, হউর—শ্বশুরের বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিরূপ। শ্বশুরকে অনেক সমাজেই বর্তমানে 'বাবা' সম্বোধন করা হয়। রাজবংশীদের মধ্যে 'ঠাকুর' / 'বাপু' ডাকও প্রচলিত আছে।

সই—সখী, নারীর নারীবন্ধু। সহেলা / সইয়ালা / সয়ালা—এক নারীর সহিত অন্য নারীর আনুষ্ঠানিকভাবে সখিত্বস্থাপন। এককালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া রাঢ়ে, বিশেষ দিনে বিশেষ ঘটা করিয়া বহুজন একত্র হইয়া উৎসবের আকারে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। সহেলার ভিতর দিয়া দুইটি নারীর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বহু অঞ্চলে দেখা যায়, সই-এর মৃত্যুতে সই এবং তাহার সন্তানেরা অন্ততঃ চারদিন অশৌচ পালন করে। সয়া, সইয়া-ম —সই-এর স্বামী, বৈনারী-শ্রী।

সধবা—(এয়ো দ্র)। **সম্বন্ধী**—(শালা দ্র)।

স্ত্রী—পত্নী, ইং wife (স্বামী-স্ত্রী)। তৎপর্যায় :—মাগ / মাইগ / মাউগ (মাগ-ভাতার প্রায়ই অবজ্ঞায়), মগী-দি. মা, মাগী ('জন খাট্যা মুনসা মরে মাগী মাগে শাঁখা'—রারচ), পরিবার (তাহার পরিবার মারা গেছে), জরু / আওরত / কবিলা-মুস ('আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাকর'-মৈগী), মাইয়া / বহুস-জ. কো. রং, মেয়্যা-মে. বাঁ ('লঙ্কার বাণিজ্য আন্যা দেঁই ঘরে। মেয়্যা হল্যে উল্বই উড়ায় আঁখিঠারে'—রারচ।)

স্ত্রী—স্ত্রীলোক। স্ত্রীজাতি, মেয়েমানুষ জনানা, ইং woman (স্ত্রী-আচার; স্ত্রীপাঠ্য)।

স্বামী—পতি, ইং husband. সোয়ামী, হাই-শ্রী—স্বামীর উচ্চারণভেদ। তৎপর্যায় : খসম-মুস, ভাতার (প্রায়ই অবজ্ঞায়), মুনসা / মিনসা / মিনসে (প্রায়ই তাচ্ছিল্যে 'এত করে করি ঘর, তবু মিনসে বাসে পর')।

স্বামী—প্রভু (জীবনস্বামী)। মালিক (গৃহস্বামী)। সাধু সন্ন্যাসীর উপাধি (স্বামী বিবেকানন্দ)।

২ ব্যক্তিবাচক

সন্তানসন্ততির নামকরণে সাধারণ মানুষ প্রায়ই সংস্কারলব্ধ কতকগুলি প্রথা অনুসরণ করিয়া থাকে। সেই প্রথাগুলির মধ্যে একটি হইতেছে, দেবতার নামে নাম রাখা। ইহা দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহারা মনে করে। ভগবানের নামজপ সাধন-মার্গের একটি প্রধান সোপান। সন্তানকে দেবতার নামে ডাকার ভিতর দিয়া একদিকে যেমন পরোক্ষভাবে ভগবানের নামকীর্তন করা হয়, অপরদিকে তেমনই সন্তানকে দেবতার নামাশ্রিত বা পদাশ্রিত করিয়া রাখিলে তাহাকে বিপদে আপদে রক্ষার দায়িত্ব দেবতার উপরই বর্তে।

(১) **দেবতার নামেই মানুষের নাম সর্বাধিক** বলিয়া মনে হয়। এখানে বর্ণানুক্রমে কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল : অন্নদাশঙ্কর, কামাখ্যা, ইন্দ্র, ঈশান, উমা, উমাপদ, কালী, কালীকিঙ্কর, কালীকৃষ্ণ, কালীদাসী, কালীনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, গণেশ, গোপাল, গোপালকৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোবিন্দগোপাল, চণ্ডী, চণ্ডীচরণ, জগদম্বা, জয়দুর্গা, তারকদাস, তারাপদ, তারাশঙ্কর, দয়াময়ী, দুর্গাপদ, দুর্গাশঙ্কর, নিস্তারিণী, কঙ্কানন, পশুপতি, বৈদ্যনাথ, ভবানী, মনসাচরণ, মহামায়া, মহেন্দ্র, মহেশ, মাধব,

রামপদ, লক্ষ্মী, শিব, শিবকালী, শিবদাস, শিবহরি, ষষ্ঠীচরণ, ষষ্ঠীপদ, সরস্বতী, হরমাধব, হরশঙ্কর, হরি, হরিগোপাল, হরিচরণ, হরিদাস, হরিদাসী, হরিহর।

এই নামগুলি হইতে দেখা যায়, কোনও নামদাতা কোনও **দেবতার একটিমাত্র নামে** সন্তানের নাম রাখে (উমা), কেহ বা **একই দেবতার একাধিক নামের সমন্বয়** ঘটায় (গোপালকৃষ্ণ), আবার **কোনও কোনও নামকরণে শিবশক্তির, শিব বিষ্ণুর** বা **বিষ্ণু শক্তির** মিলন সাধিত হয় (তারাশঙ্কর, হরিহর, কালীনারায়ণ)।

(২) **শুধু দেবতার নামে নহে, তাঁহার ভক্তের চরণেও সন্তানকে আশ্রিত করিয়া রাখা হয়ঃ** অদ্বৈতচরণ, গোপীপদরেণু, গৌরচরণ, নিতাইচরণ।

আমাদের পাড়ায় একব্যক্তির নাম গান্ধীপদ মণ্ডল।

(৩) **মহাপুরুষ, দেশবরেণ্য, জ্ঞানী-গুণী** এবং **পুরাণ-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামে ঃ** অশোক, ঈশ্বরচন্দ্র, গৌরাঙ্গ, বিবেকানন্দ, যুধিষ্ঠির, রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র।

(৪) **দেশ বা প্রসিদ্ধ স্থানের নামে ঃ** অযোধ্যা, কৈলাস, দ্বারকানাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, নেপাল, বঙ্গচন্দ্র, বঙ্গবালা, বৃন্দাবন, ভূপাল।

(৬) **বেদ-পুরাণাদির নামে নামকরণ ঃ** গীতা, বেদবালা, ভাগবত (-মণ্ডল) মহাভারত (সাহা)।

(৬) **প্রকৃতিরাজ্যের সহজদৃষ্ট ফল-ফুল, নদী-তারা ইত্যাদির নামে ঃ** গঙ্গা, চামেলী, জ্যোৎস্না, ভানু, শশী।

(৭) **নবজাতকের জন্মক্ষণ, জন্মবার, জন্মকালীন ঘটনা ইত্যাদি অনুসারে নাম, বিশেষ করিয়া ডাকনাম ঃ** আকাল, আকালী—আকাল অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময় জন্ম হইলে সাধারণতঃ এইরূপ নাম রাখা হয়।

গাজলু—ঘোর বর্ষার সময় জন্ম হইলে…।

পূর্ণিমা, পূর্ণচন্দ্র—পূর্ণিমা তিথিতে জন্ম হইলে…।

বানু—জন্মের সময় দেশে বন্যা হইলে…।

বুধু—বুধবারে জন্ম হইলে…।

মংলা, মংলী—মঙ্গলবারে জন্ম হইলে…।

(৮) **কতকগুলি নামের উৎপত্তির মূলে আছে" নামদাতার বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা অন্ধসংস্কার।** মৃতবৎসা রমণী একটির পর একটি সন্তান হারাইয়া

মনে করিতেন যে,—সন্তান-ভাগ্য তাঁহার নাই। তাই তিনি শেষে কোনও সন্তান হওয়ামাত্রই তাহাকে ধাত্রী বা কোনও সন্তানবতীকে দান করিয়া দিয়া আবার কড়ি, ক্ষুদ ইত্যাদি দ্বারা কিনিয়া লইতেন। এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ক্ষুদিরাম, ক্ষুদী, বেচারাম, কেনারাম—এই সকল নামের উৎপত্তি হয়ত এককালে ঐভাবেই হইয়াছিল।

এককড়ি—ইহার মূল অর্থ, যে-সন্তানকে ঐরূপে এককড়ি দিয়া কেনা হইয়াছে।

তিনকড়ি—তিন কড়া মূল্যে কেনা। পাঁচকড়ি—পাঁচ কড়া দিয়া কেনা।

কেনারাম—যে সন্তানকে কেনা হইয়াছে। 'দস্যু কেনারামের পালা'য় দেখিতে পাই, খেলারাম মনসাকে পূজা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখে কেনারাম (দেবীর পূজায় কিনা তাই 'কেনারাম।'—মৈগী)। ক্ষুদিরাম—যাহাকে ক্ষুদ দিয়া কেনা হইয়াছে। দানধন—যে সন্তানকে দান করিয়া আবার মূল্য দিয়া পাওয়া গিয়াছে।

(৯) অমর, থাকপ্রসাদ, থাকমণি, মৃত্যুঞ্জয়, রাখহরি—এই **নামগুলির মধ্যে সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জননীদের (প্রায়ই মৃতবৎসাদের) একটা তীব্র আকুতি প্রকাশ পাইয়াছে।**

অমর—তুমি অমর হইয়া বাঁচিয়া থাক (নামের ভিতর দিয়া সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা)। মৃত্যুঞ্জয় নামটির তাৎপর্যও ঐরূপ।

থাকপ্রসাদ—পুত্রসন্তানের প্রতি প্রযোজ্য (তোমাকে দেবতার প্রসাদে পাইয়াছি, তুমি যাইও না, থাক)।

থাকমণি—কন্যা সন্তানের প্রতি প্রযোজ্য (হে মণি, তুমি থাক, যাইও না)।

রাখহরি—হে হরি, সন্তানকে রক্ষা কর।

(১০) সন্তান যতই কাম্য হউক, **অধিক কন্যা সন্তানের জনক-জননী হইতে কেহই বড় চান না।** কন্যাদায় বড় দায়। সেকালেও ইহা যেরূপ ছিল আজও প্রায় তেমনই আছে। তাই কোনও পরিবারে অধিক সংখ্যায় কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিতে থাকিলে, পিতামাতা হয়ত মনে প্রাণে প্রার্থনা করেন, আর না, আর দিও না মা কালী। আন্না (আর না), আন্নাকালী (আর দিও না মা কালী), ক্ষান্তি/ক্ষান্তমণি (জন্মে ক্ষান্ত হও), চায়না (আর চাই না)—কন্যাদের এইরূপ নামকরণের মূলে হয়ত ঐরূপ মনোভাবই বর্তমান।

ডাকনাম ঃ

সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুইটি নাম রাখা হয়,—একটি ডাকনাম, আর একটি যে নামে শিশু উত্তরকালে বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনে খ্যাত হইবে। কতকগুলি ডাকনাম মৌলিক, কতকগুলি লোকপ্রসিদ্ধ নামের বিকার।

কাঙ্গালী, খ্যাঁদা, গুয়ে, গোঙা, গোদা, গোবরা, গোবা, পঁচা, পাগলা, ফালা, বোঁচা, ভিখারী, ভোঁদা, মেথরা, হাবলা, হাবা, হ্যাঁদা,—এইসব ডাকনামের সঙ্গে নামধারীর আকৃতি-প্রকৃতির বা তাহার লোকপ্রসিদ্ধ নামের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই। অনেক পিতামাতা গৌরাঙ্গী কন্যারও 'কৃষ্ণা' নাম রাখেন। এইগুলির পশ্চাতে আছে স্নেহের আতিশয্য এবং যমকে, কু-দৃষ্টিসম্পন্ন অপদেবতাকে বিভ্রান্ত করিবার আদিম মনোভাব, নাম শুনিয়াই যাহাতে মৃত্যু-দেবতার অরুচি হয়, তিনি অতি তুচ্ছ নগণ্য জ্ঞানে জননীর বুকের ধনে হাত না বাড়ান।

বাংলা নামের বিকার ঃ

উদো (উদ্ধব), কেলে/কেলো (কালী-পুরুষ), কেষ্টা (কৃষ্ণ), ক্যাবলা (কেবলরাম), গণশা (গণেশ), গোপলা (গোপাল), নেপা/নেপলা (নেপাল), ফইট্যা/ফটকে (ফটিক), বাদলা (বাদল), মংলা (মঙ্গল), মদনা (মদন). মধ্যুয়া/মোধো (মধুসূদন), মাইনকা/মানকে (মানিক), মাখনা (মাখন), রামা (রাম), শামা (শ্যামা), শিবে (শিব), হরে (হরি)—**আ, এ এবং ও প্রত্যয়ান্ত এই ডাকনামগুলিতে যেন একটা অনাদরের বা খুব নিকট সম্পর্কের ভাব প্রকাশ পায়।**

কণি (কণা), কালু (কালী), ক্ষেমী (ক্ষমা), পাঁচু (পাঁচকড়ি), বরি (বরদা), ভুলু (ভোলানাথ), মাধু (মাধব), মানি (মানদা), মীরি (মীরা), যাদু (যাদব), লতি (লতা), শিবু (শিব), সরলি (সরলা), হরু (হরি), হারু (হারান)।—**ই এবং উ প্রত্যয়ান্ত এই ডাক নামগুলি অনেকটা স্নেহব্যঞ্জক।**

কানাই, জগাই, নিতাই, নিমাই, বলাই, মাধাই—**আই (আ+ই) প্রত্যয়ান্ত এই নামগুলিও স্নেহ বহন করে।**

নামের ভূষণ বা অলঙ্কার

বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে নামের মধ্যাংশটি বাদ দেওয়ার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষকে তাহাদের নামের কান্ত, কান্তি,

কিশোর, কুমার, চন্দ্র, চাঁদ, তারণ, তোষ, নাথ, প্রসন্ন, প্রসাদ, বরণ, ভঞ্জন, ভূষণ, মোহন, রমণ, হরণ প্রভৃতি অংশগুলিকে কদাচিৎ পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়। এইগুলিকে তাহারা নামের ভূষণ বা অলঙ্কাররূপেই যেন পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহারা শুধু 'যামিনী' হইতে চায় না ; তাহারা যামিনীনাথ, যামিনী-মোহন ; তাহারা শুধু 'সুরেন্দ্র' নহে, সুরেন্দ্রনাথ।
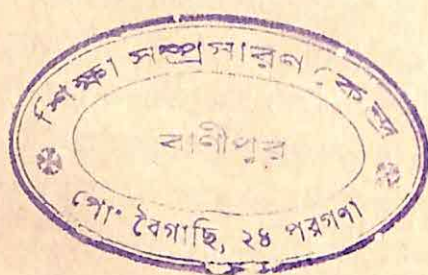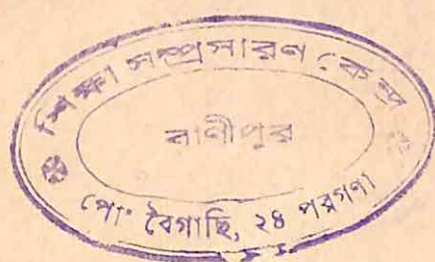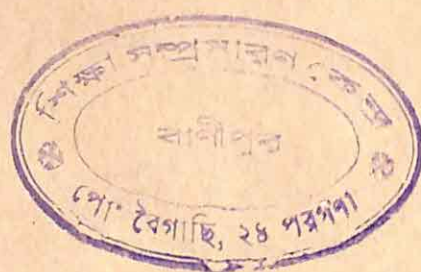
শ্রীকামিনীকুমার রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী-ছাত্র হিসাবেই নয়, মৌল গবেষণার শ্রমনিষ্ঠ আলোচকদের কথা প্রসঙ্গে যে সব কৃতী সাহিত্য-সেবকের কথা বিদগ্ধ পাঠকদের মনে জেগে ওঠে, তাঁদের মধ্যে তিনি একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ১৯২৯ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ব্রহ্মময়ী স্বর্ণপদক, স্যার আশুতোষ পদক, ও রমাই মিত্র পুরস্কার লাভ করেন। কর্মজীবনের শুরু সাংবাদিক হিসাবে। বঙ্গবাণী, নবশক্তি, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বিচিত্রা, প্রবাসী, বসুমতী, আনন্দবাজার, দেশ, যুগান্তর, কল্যাণী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর গবেষণার কৃতিত্ব ছড়িয়ে আছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন, ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটী প্রভৃতি সংস্থার সংগেও নানাভাবে জড়িত। ইতিপূর্বে "দীন শরতের বাউল গান" (অধুনা দুষ্প্রাপ্য) গ্রন্থ সম্পাদনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আরও কয়েকটি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ আছে।

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্
৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ries

FOLKLORE

should mine the rich lodes
torical—and prehistorical—
omentum in the academic
are endeavouring to examine
the light of scientific discoveries
Not only historians but anthro-
now recognise folklorist's call for an
h to all evidences of human develop-
ping with modern theories of electic
arily Indian Folklore from different
ancient sources for illustration, the con-
tri... oming book "Women in Indian Folklore"
touc... ach questions as the traditional Indian thought that provides for an honoured and secure position for women, although she is dependent and is in need of protection. From a modernistic angle the views expressed about women through folklore may appear to be self-contradictory, but this is not necessarily so which have been explained by the distinguished scholars of literature, language and dialects who have contributed in this great venture. It is edited by Sankar Sen Gupta who has added a big introductory essay which will undoubtedly speak to specialists and laymen alike about resolving the conflict in a search for fact with colourful examples from various oral traditional materials.

FOLKLORE MUSEUM

In order to draw the attention of the educators for their recognising folklore as an academic discipline, folklorists of India are busy to produce books on different aspects of folklore from the first hand knowledge which in some cases may seem far from the perfection to the eye of a critical reader. But of entering into the controversy of merit of these books we have decided to encourage workers by the publications of their books and essays. Thus at Society's initiative Indian Publications has already published books like "A Guide to Field Study", "Folklore Library , "A Bibliography of Indian Folklore and Related Subjects" etc. to enrich the stock of books and knowledge on folklorology in India that provides nucleus to the workers and scholars of folklore. The book is written by Dr. S. C. Mukherjee as efficiently as possible under the guidance of "Indian Folklore Society".